ইসলাম ও আত্মঘাতী মুসলমান

আবু জাফর

ইসলাম ও আত্মঘাতী মুসলমান

আবু জাফর

পালাবদল পাবলিকেশন্স লিঃ
১১৯/৪ ফকিরাপুল (৩য় তলা)
ঢাকা

www.pathagar.com

ইসলাম ও
আত্মঘাতী মুসলমান
Islam O
Atmoghati Musalman

স্বত্ব :
সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক
সংরক্ষিত

প্রকাশক :
আবদুস সালাম
পালাবদল পাবলিকেশন্স লিঃ
১১৯/৪ ফকিরাপুল (৩য় তলা)
ঢাকা

পরিবেশনা :
আহসান পাবলিকেশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার (দোতলা)
ঢাকা

মুদ্রণ :
প্রিন্টোগ্রাফিক
১১৯/৪ ফকিরাপুল
ঢাকা

প্রচ্ছদ :
গ্রাফিক প্লাস
৩৬, পুরানা পল্টন (৩য় তলা)
ঢাকা

প্রকাশকাল :
সেপ্টেম্বর, ২০০০

মূল্য :
বিনিময় : একশত পঞ্চাশ টাকা
Price : $ 8.00 £ 7.00

www.pathagar.com

হে আমার প্রতিপালক,
এই লেখার
শক্তিটুকু আপনিই দান করেছেন;
কিন্তু এ-দিয়ে কী-লাভ
যদি আপনার সন্তুষ্টি থেকে মাহরুম থাকি!
আপনার অনুগ্রহ ছাড়া
কেউ কখনো ভালো হয় নি।
হে আমার প্রতিপালক,
আপনি স্বীয় অনুগ্রহে
আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে
আপনার প্রীতিভাজন অনুগত বান্দাহদের
অন্তর্ভুক্ত করে নিন।
হে আমার প্রতিপালক,
আপনার মনোনীত যে-দ্বীন,
আপনার প্রিয়তম রাসুল (সাঃ)-এর যে-জীবনাদর্শ,
সেই শাশ্বত আলোকের পুণ্যধারায়
আপনি আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক
সকল কুহক ও অন্ধকার থেকে
পবিত্র করুন।

www.pathagar.com

লেখকের
অন্য দুটি ইসলামী বই

তুমি পথ প্রিয়তম নবী তুমিই পাথেয়
ইসলামের শত্রু মিত্র

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বইয়ের কথা : আমার কথা
ইসলামের পরিচয় তাৎপর্য ও অপরিহার্যতা ১৫
ইসলাম ও আত্মঘাতী মুসলমান ৩০
সুন্নাতি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ৪৩
তওহিদ, রেসালাত ও আখেরাত ৫১
রাসূল-প্রেম : একটি অপ্রিয় সমাচার ৬০
প্রতিকারহীন অনৈক্য ও আলেম-সমাজ ৬৮
পীরের লড়াই ৭৬
জিহাদ : ইসলামের একটি অপরিহার্য শর্ত ৮২
কাশ্মিরের জয়-পরাজয় ৯২
লাদিন, উসামা বিন লাদিন ৯৮
ইসলামের শত্রু মিত্র এবং ইরাক প্রসঙ্গ ১০৮
এক সংশপ্তক শার্দূলের কাহিনী ১১১
নারী স্বাধীনতা ও বিবেকভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবী সমাচার ১১৫
ইসলামী শিক্ষা-সংকোচন নীতি : ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির কুহেলিকা ১১৯
আমাদের শিক্ষা : আমাদের বদনসীব ১২৬
নজরুল ইসলাম : একটি দু:খ-সুখের উপাখ্যান ১৩০
আমাদের ভাষাপ্রেম : এক রহস্যময় দুঃস্বপ্ন ১৪০
লালন ও কতিপয় গুরুতর প্রসঙ্গ ১৪৮
লালন : কতিপয় গুরুতর প্রসঙ্গ এবং আরো কথা ১৫৯
রবীন্দ্রবিভ্রম ও একজন মৌলবাদীর অপ্রিয় কথা ১৭২

পরিশিষ্ট

ঋভু ও ঋষভের কাহিনী

এক : ঋভু ও ঋষভ ১৮০
দুই : বিধুর বুদ্ধিজীবী সমাচার ১৮৪
তিন : আত্মবিস্মৃতি ও আত্মহনন ১৮৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার কথা : বইয়ের কথা

বিসমিল্লাহ হিররাহমানির রাহিম। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। কেউ কেউ বিস্মিত হবেন, কিন্তু এটা বলা আবশ্যক যে, আমি নিজেকে একজন সদ্য-দীক্ষিত নও-মুসলিম হিসাবে বিবেচনা করি। করি এইজন্য যে, কাফের কোন সুনির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নাম নয়; আল্লাহপাকের হুকুম ও রাসূল (সাঃ)এর আদর্শকে অস্বীকার করার নামই কুফ্‌রি। আমি যদিও কখনো মৌখিকভাবে অস্বীকার করি-নি, কিন্তু সুদীর্ঘ সময় আমার আমল ও কার্যকলাপ সবই ছিল নিরঙ্কুশ কুফ্‌রির অন্ধকারে নিমজ্জিত; আমি আচ্ছন্ন ছিলাম ভয়াবহ ধরনের কুজ্ঝটিকা দ্বারা। আমি আবু জেহেলদের মত প্রচণ্ড উল্লাস নিয়ে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন রণে অবতীর্ণ হই-নি বটে, কিন্তু আবু জেহেলদের চিন্তা ও জীবনপ্রণালীর সঙ্গে আমার খুব-একটা বড় রকমের পার্থক্য ছিল না। অতএব জন্মগতভাবে আমি যদিও মুসলমান, কিন্তু যেহেতু একমাত্র খাত্‌না-গ্রহণ ছাড়া মুসলমানিত্বের সকল দাবী ও শর্তই আমি প্রায় বেপরোয়া ঘোটকের মত বহুদিন একাদিক্রমে উপেক্ষা করেছি, কঠিন যন্ত্রণা ও অপরাধবোধ নিয়ে আজ বলতেই হয়, আমি ছিলাম প্রকৃতই এক মূর্তিমান কাফের। এমন বিশুদ্ধ কাফের যে, তখন নামাজ রোজা ইত্যাদি কোন কিছুই আমার কাছে আদৌ কোন বিবেচনার বস্তু ছিল

www.pathagar.com

না। দুঃখ হয়, হাসিও পায়, আমার তখন আরাধ্য-দেবতা ছিল রবীন্দ্রনাথ; আমি তখন লালন ফকিরের রিরংসাতাড়িত কুহকভরা কুৎসিত যৌনদর্শনকে ভাবতাম অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিকতা। আমার মুগ্ধতা তখন সারাক্ষণ আবর্তিত হতো হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুচিত্রা সেন লতা মুঙ্গেশকরকে নিয়ে। একেই বলে বদনসীব! আজ খুব তীব্রভাবে অনুভব করি আমার হারানো অপচয়িত দিনগুলির কথা; অনুভব করি, আমার নিজের প্রতি নিজের সীমাহীন অবিচার-অত্যাচারের কথা। ভয় হয়, খুবই ভয় হয়; কারণ আল্লাহপাক অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'সেদিন প্রত্যেকেই তার জাগতিক কৃতকর্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হবে, এবং তাদের উপর এতটুকু জুলুম করা হবে না' (সুরা আল এমরান)। 'কণামাত্র জুলুম করা হবে না', অর্থাৎ আল্লাহপাক রাগান্বিত হয়ে উষ্মাবশত কাউকে জাহান্নামে প্রেরণ করবেন, এমন নয়; শেষ ফল যা-হবে তা আমাদের পার্থিব ক্রিয়াকলাপেরই অবধারিত উপসংহার। বরং আল্লাহপাক উষ্মাবশত জাহান্নামে প্রেরণ করলে সেটাই হতো আমার জন্য অপেক্ষাকৃত উত্তম; কারণ ক্রোধের উপশম ঘটলে জাহান্নাম থেকে বহির্গমন ও পরিত্রাণের একটি পথ হতো। কিন্তু সেই সম্ভাবনা আল্লাহপাক যেহেতু পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছেন, একমাত্র আল্লাহর অপার অনুকম্পা ব্যতীত আমার আর দ্বিতীয় কোন আশা-ভরসার অবলম্বন নেই।

পার্থিব এই দিনগুলি অতি দ্রুতগতিতে ফুরিয়ে আসছে; হতে পারে আজকের এই দিনটিই আমার এই-জীবনের সর্বশেষ দিন। আমার মা যখন ইন্তেকাল করলেন, আমি শুধু বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তিনি কথা বলতে বলতে চিরদিনের মত চলে গেলেন। আমার শিক্ষক ডক্টর হেনা, যাঁকে দেখে আমার সর্বদায়ই মনে হতো, তিনি কমপক্ষে শতবর্ষ পূর্ণ করবেন। সেই উজ্জ্বল টগবগে মানুষটিও '৮৯ সালের এক শারদীয় অপরাহ্নে কাউকে কিছু না-বলে মাত্র ৫২ বছর বয়সে নিঃশব্দে চলে গেলেন। কবে যাবো, কীভাবে যাবো জানি না, কিন্তু আমিও যাবো। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজীউন', আমরা আল্লাহর নিকট থেকে এসেছি, আল্লাহর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। যারা এ-বিষয়টি ভুলে আছে, তারা ভালো আছে; যারা মনে করে মৃত্যুর পরে আদৌ কিছু নেই, শুধুই এক অস্তিত্বহীন অনন্ত শূন্যতা, আপাতত তারাও ভালো আছে। কিন্তু আমি যেহেতু আখেরাত ও জান্নাত-জাহান্নামকে পূর্বের মত ভুলে থাকতে পারি না, আমার চতুর্দিক শুধু হাহাকারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমার শ্রুতিপটে এখন বার বার শুধু নিস্বনিত হয়, 'ওয়া ইয়াকুলুল কাফিরু ইয়া লাইতানী কুনতু তুরাবা', কাফেররা যেদিন আর্তনাদ করে উঠবে, হায় আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম (সূরা নাবা)।

যাই হোক, সকল ফয়সালা আল্লাহর হাতে। আর রাসূল (সাঃ)তো পরিষ্কার বলেই দিয়েছেন, জান্নাত আমাদের ইবাদতের বিনিময়ে লভ্য নয়। নয় এইজন্য যে, জান্নাত এমন এক অভাবনীয় বিরাট সাফল্য, লক্ষ কোটি বৎসর খেয়ে না-খেয়ে ইবাদত করলেও

www.pathagar.com

যে-জান্নাতের এতটুকু যোগ্য হয়ে ওঠা যায় না। জান্নাত লাভের ব্যাপারটি পুরোপুরিই আল্লাহপাকের অনুগ্রহ। আমাদের কর্ম ও চিন্তা, আমাদের বিশ্বাস ও বেদনা, আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ও চেষ্টা যদি আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহলাভের উপায় ও উপকরণ হতে পারে, তাহলেই আমরা সার্থক, তাহলেই আমাদের এই জীবন সার্থক। অন্যথায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সর্বনাশ, শুধুই এক অফুরন্ত সমূহ সর্বনাশ। এই সর্বনাশ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই, আমার আয়ুষ্কাল যখন প্রায় অস্তাচলে উপনীত, আমি ফিরে এলাম আল্লাহপাকের কাছে, রাসুল (সাঃ)এর কাছে, আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীনের ছায়াতলে। অবশ্য ফিরে আসা সহজ ছিল না, কারণ মন চাইলেই আসা যায় না; নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহপাকেরই বিশেষ অনুগ্রহ। 'ওয়ামা তাশাউনা ইল্লা আইয়াশাঁউ আল্লাহু রাব্বুল আলামীন', আল্লাহপাকের অনুমতি ছাড়া কারো মতি হয় না (সূরা তাকবীর)।

যাই হোক, আল্লাহপাকের বিশেষ অনুগ্রহের কারণে ফিরে এলাম বটে, কিন্তু ভয় দূর হচ্ছে না। কারণ, একমাত্র আল্লাহর পথে আল্লাহর দ্বীনের জন্য শাহাদাত বরণ করেছেন, এমন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্যই পারলৌকিক সাফল্যের নিশ্চিত ও অবধারিত কোন গ্যারান্টি নেই। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে আল্লাহপাক তাঁর অনুগ্রহের অগ্রিম সুসংবাদ জ্ঞাপন করেছেন। এ-ছাড়া, যে-কোন ইবাদতেরই ফলাফল অনিশ্চিত; কারো ক্ষেত্রেই কোন অগ্রিম নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহপাক অবশ্য বলেছেন, 'ইন্নালিল মুত্তাকিনা মাফাজান', মুত্তাকী অর্থাৎ আল্লাহভীরুদের জন্যই সাফল্য (সূরা নাবা); কিন্তু কে কতটা মুত্তাকী, তার প্রমাণ বড় কঠিন। অনেকে মনে করেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি আন্তরিক মুহাব্বতের মধ্যেই রয়েছে সাফল্য। কিন্তু এখানেও সমস্যা, কারণ এই মুহাব্বত শুধু মৌখিক ঘোষণা ও আনুষ্ঠানিক কিছু ইবাদতের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। আল্লাহপাক 'আহকামুল হাকিমীন'; তাঁর নিখুঁত ইনসাফ দ্বারা নির্ধারিত মহাবিচারদিবসে কার জন্য কী-যে ফয়সালা অপেক্ষা করছে, তা কারো পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। অতএব আমার মত সদ্যদীক্ষিত এক মুসলমান, যার জীবনের সর্বাধিক ফলপ্রসূ সিংহভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে ইবলিসের বশংবদরূপে, তার পক্ষে নিরুদ্বেগে দিনযাপন করা কি সম্ভব! এবং এইজন্যই আমি চেয়েছি, সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সীমিত অবশিষ্ট দিনগুলি, মানবজাতির জন্য আল্লাহপাকের যে-শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত ইসলাম, সেই ইসলামকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে সামনে রেখে অতিবাহিত করি। বর্তমান গ্রন্থটি, আমার আগের দুটি বইয়ের মত, সেই ইচ্ছারই একটি আরেক দৃশ্যমান রূপ।

উল্লেখ করা আবশ্যক, আমার এ-বইটি একেবারে আনকোরা নতুন কিছু নয়; ইতোপূর্বে 'দৈনিক ইনকিলাব' 'পাক্ষিক পালাবদল' 'মাসিক মদীনা' 'পৃথিবী' এবং 'দারুস সালাম'-

www.pathagar.com

এ প্রকাশিত আমার প্রবন্ধসমূহের সংকলন। মুসলমান ও ইসলামের নানা দিক ও সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধগুলি রচিত; বিশেষ করে মুসলমান-যে আজ নিজেই নিজের আততায়ী, এবং তার-যে আত্মসংশোধনে মনোযোগী হওয়া আশু-কর্তব্য, এই কথাটাই এই বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। অবশ্য এখানে কী-আছে না-আছে, কতটা সাফল্যের সঙ্গে আমি আমার বক্তব্য তুলে ধরতে পারলাম না-পারলাম, সেটা একান্তভাবেই পাঠকের বিচার্য বিষয়। আমার শুধু একটিই কথা, এই সামান্য কাজের কারণে আমি যদি আল্লাহপাকের ক্ষমা ও অনুগ্রহের নিকটবর্তী হতে পারি, তাহলেই আমার এই নশ্বর পার্থিব জীবন সার্থক ও ধন্য ও ধনাঢ্য, পৃথিবীর যে-কোন নোবেল-বিজয়ী লেখকের চেয়েও আমি সহস্রগুণ সুখী ও সৌভাগ্যবান। আর যদি সেই সৌভাগ্য থেকে মাহরুম থাকি, তাহলে সবই পণ্ডশ্রম।

সর্বমোট ছোট-বড় তেইশটি প্রবন্ধের সংকলন এ-বই। আগেই উল্লেখ করেছি, কয়েকটি সম্মানিত পত্রিকায় প্রবন্ধগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব বলা বাহুল্য যে, সেই সকল পত্রিকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমি অপরিসীমরূপে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে, 'দৈনিক ইনকিলাব'-এর নির্বাহী সম্পাদক মওলানা রূহুল আমীন খানের প্রতি কী-ভাষায়-যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো, সেটা অনেক ভেবেও স্থির করতে অক্ষম। তিনি শুধু আমার লেখা প্রকাশই করেন-নি, আমাকে আরো-লেখার জন্য দারুণভাবে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিতও করেছেন। 'পাক্ষিক পালাবদল'এর সম্পাদক আলহাজ্ব আবদুস সালাম আমার অতীব প্রীতিভাজন। তিনি তাঁর পত্রিকায় নিয়মিত শুধু আমার লেখা প্রকাশ করেই থেমে যান-নি, এই বইটি প্রকৃতপক্ষে তাঁরই নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা ও তাগিদ ও ভালোবাসার ফসল। স্বীকার করা কর্তব্য, তাঁর নিরন্তর উৎসাহ ও প্রবল চাপ না-থাকলে আমার মত সর্ববিষয়ে মন্থর ও আলস্যপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে এই বই এত শীঘ্র প্রস্তুত করে তোলা অবশ্যই অসম্ভব হতো। আবদুস সালামের সকল শ্রম ও কেশ ও আর্থিক ত্যাগ আল্লাহপাক গ্রহণ করুন, এই দোয়া করি। সর্বজনাব খোন্দকার রইসউদ্দিন আহমদ, কাজী আবদুল্লাহ হারুন, মীর্জা শরফুদ্দিন, অধ্যাপক তোহুর আহমদ হিলালী, ইসলামিক সেন্টারের প্রশাসনিক কর্মকর্তা অনুজপ্রতিম গোলাম কিবরিয়া, স্নেহভাজন হাফেজ মোস্তফা কামালসহ আমার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুবান্ধবের সপ্রীতি সহযোগিতা আমাকে-যে নিরন্তর প্রাণিত করেছে ও করে, এই কথাও গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে ইসলামের সঙ্গে জড়িয়ে রাখুন, আল্লাহপাকের কাছে প্রীতিভাজন বান্দাহরূপে তাঁরা গৃহীত হোন, এই প্রার্থনা জানাই।

উল্লেখ্যযোগ্য যে, আমার আগের দু'টি বই আল্লাহপাকের রহমতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে; এবং এতে আমি আর্থিকভাবে একটু লাভবানও হয়েছি। এটা সত্য যে, আমি আর্থিক লাভ-ক্ষতিকে অবহেলা করতে চাই; কিন্তু মানবিক দুর্বলতাহেতু

www.pathagar.com

চেয়েও পারি না। আর এটাই-তো বাস্তবতা, অর্থকে অবজ্ঞা করতে হলেও অন্তত কিছু অর্থ থাকা প্রয়োজন। অবশ্য আল্লাহর বিশেষ রহমত যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহবশত মোটামুটি সচ্ছলতার মধ্যে আমাকে জীবনযাপনের সুযোগ দান করেছেন। ধারণা করি, এই অবস্থা ইনশাআল্লাহ আমৃত্যু অব্যাহত থাকবে। অতএব আর্থিক লাভালাভের প্রশ্নটি খুবই গৌণ। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমার পূর্ব-প্রকাশিত বই দু'টির মধ্য দিয়ে আল্লাহপাক অনেক ঈমানদার পাঠকের সঙ্গে আমার যোগ স্থাপন করে দিয়েছেন। সার্বিক বিবেচনায় এটা একটা অপরিমেয় সৌভাগ্য। কারণ, আমার নিজের মধ্যে বিস্তর ঈমানী দুর্বলতা ও শৈথিল্য বিরাজ করা সত্ত্বেও, ইসলামের জন্য উৎসর্গীত অনেক আল্লাহওয়ালা মানুষ যে আমাকে তাঁদের অকৃত্রিম প্রীতিদানে বাধিত করেন, এটা অভাবনীয়। বস্তুত, ভাবাই যায় না, হজরত মওলানা মুহিউদ্দীন খান, হজরত মওলানা দেলওয়ার হোসেন সাঈদী, অধ্যক্ষ হজরত মওলানা কামালুদ্দিন জাফরি, বিশিষ্ট মুফাস্‌সির মওলানা আবুল কালাম আযাদ, বিশিষ্ট কবি ও ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা রূহুল আমীন খান প্রমুখ আন্তর্জাতিক ইসলামী-ব্যক্তিত্ব যখন আমার মত একজন নগণ্য নও-মুসলিমকে গভীর ভালোবাসায় গ্রহণ করেন, আমি এই ভালোবাসার কোন যুক্তিই খুঁজে পাই না। সত্যই আল্লাহর অভিপ্রায় ও রহমত বড় বিস্ময়কর!

লেখা কাজটি যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে খুবই ব্যক্তিগত ও গোপন ও নিঃশব্দ, কিন্তু লেখা শেষ হবার পর, বিশেষ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় অনুধাবন করা যায়, কত মানুষের কত সখ্য ও সহযোগিতা, কত প্রীতি, কত হৃদয়ের কত অবারিত অনুরাগ ও ঔদার্য নীরবে নীরবে জড়িয়ে যায় বইয়ের পাতায় পাতায়। আল্লাহপাকের অফুরন্ত করুণা যে, আমার সুহৃদ-শুভানুধ্যায়ীদের এই অমূল্য সখ্য ও সহমর্মিতা আমি লাভ করেছি একেবারে বিনাক্লেশে। আল্লাহপাক তাঁদের সবাইকে ঐহিক ও পারত্রিক কামিয়াবি দান করুন। আমার প্রথম বই 'তুমি পথ প্রিয়তম নবী তুমিই পাথেয়' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল সচিব মোহাম্মদ আসাফউদ্দৌলাহ্‌র সৌজন্যে। এটা একটা তথ্য। কিন্তু এতদসঙ্গে এই তথ্যটিও প্রকাশ করা জরুরি যে, শুধু আমার মুখ চেয়ে নয়, এটা ছিল ইসলামের প্রতি মোহাম্মদ আসাফউদ্দৌলাহ্‌র অকুণ্ঠ মুহাব্বতেরই একটি দৃষ্টান্ত। এই তৃতীয় বইটি প্রকাশের মুহূর্তে আমার প্রতি তাঁর অব্যাহত আন্তরিকতা ও স্নেহের কথা স্মরণ করি। খুবই সুখের বিষয়, বহু অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এই মানুষটি এখন সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র আলকোরআনের মুহম্মদ আসাদ-কৃত ইংরেজী অনুবাদের বাংলা তরজমা নিয়ে নিবিষ্ট। নিঃসন্দেহে এই বাংলা অনুবাদ একটি অনুপম কাজ হবে। পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জগতে এই মানুষটিকে আল্লাহপাক তাঁর সন্তুষ্টির ছায়ায় রেখে সার্বিক নিরাপত্তা দান করুন, এই দোয়া করি। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সদস্য-সচিব জনাব মীর কাশেম আলী আমাকে আমার আগের দু'টি বইয়ের ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা করেছেন, যে-সহায়তা এই বইটিকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে আছে। ইসলামের জন্য

www.pathagar.com

উৎসর্গীতপ্রাণ এই মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতাসহ এই শুভকামনা জানাই যে, আল্লাহপাক ইসলামের খেদমতে জনাব কাশেমের শক্তি ও সাহসকে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিন। আমাদের এক ভাই জনাব এ. কে. মোহাম্মদ আলী, এক সময় রেডিও বাংলাদেশ-এর ডিরেক্টর ছিলেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত, আমাকে অনেক দুষ্প্রাপ্য ইংরাজী বই পাঠিয়ে সাহায্য করেছেন। অকপটে উল্লেখ করি, তাঁর প্রেরিত ও প্রদত্ত বইগুলি থেকে আমি প্রভূত উপকার লাভ করেছি। ভাই মোহাম্মদ আলীকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বইটি হাতে পেলে যাঁরা সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হতেন, আমার আব্বা-আম্মা, তাঁরা দু'জনেই আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করেছেন। জানি না, আল্লাহপাকের কাছে তাঁরা কীভাবে গৃহীত হয়েছেন। প্রার্থনা করি, 'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়াআনি সগীরা'- সকল পাপ ত্রুটি অপরাধকে মার্জনা করে দিয়ে আল্লাহপাক আমার আব্বা-আম্মাকে জান্নাতে নসীব করুন।

ভূমিকা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। অধিক আর কিছু বলার নেই, বলা সমীচীনও নয়। বইটিকে সামনে রেখে আল্লাহপাকের কাছে আর একটি আরজু পেশ করি : হে আমার প্রতিপালক, এই সামান্য কাজটুকু গ্রহণ করে আপনি আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে পরিপূর্ণ হেদায়েত নসীব করুন, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাদের প্রবৃত্তিকে আপনার ভয় দ্বারা পরিচালনা করুন; আমাদের প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করুন; আমাদের কল্‌বকে আপনার দ্বীনের উপর কায়েম থাকার অবিচল দৃঢ়তা দান করুন। আল্লাহ্ হাফিজ। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লাহ্ বিল্লাহিল আলীইল আজীম।

১০৯ এস. বি. রোড
কুষ্টিয়া
আগষ্ট ২৩,২০০০

আবু জাফর

পুনশ্চ:

উল্লেখ করি, বইয়ের পরিশিষ্টে এবারও কিছু লেখা যুক্ত করতে হলো। কোন জাতির অধঃপাত ও দুর্ভাগ্যের একটা বড় কারণ হলো বুদ্ধিজীবীদের বিবেকভ্রষ্টতা। বাংলাদেশ মর্মান্তিকভাবে আজ এই দুর্ভাগ্যের শিকার। সবাই নয়, কিন্তু এমন বহু খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী আছেন, যাঁরা 'গণতন্ত্র' 'প্রগতি' 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' 'মুক্তিযুদ্ধ' 'নারীমুক্তি' ইত্যাদি অনেক 'দামী দামী' কথা বলেন, কিন্তু জ্ঞানত কি অজ্ঞতাবশত তাঁরা কখনোই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে চান-না; দাঁড়াতে সম্ভবত ভয়ও পান। তাঁদের একমাত্র প্রতিপক্ষ ইসলাম; আক্রমণের লক্ষ্যস্থলও ইসলাম। এমনকি ইসলাম তাঁদের কাছে এতটাই বিবমিষার কারণ যে, কট্টর বিধর্মীরাও যে-কথা উচ্চারণ করতে ভয় পায়, ইসলাম সম্পর্কে সেই সব কটূক্তি তাঁদের প্রিয় উচ্চারণ। এবং অতিশয় কৌতুককর যে, এমনকি

www.pathagar.com

[তের]

শোয়েব আখতারকে একজন ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন মারাত্মক ফাস্ট-বোলার বলে উল্লেখ করলেও এই উদার ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের বিরোধীজনকে 'রাজাকার' 'মৌলবাদী' পাকিস্তানপন্থী' বলে আক্রমণ করতে ভালোবাসেন; এবং এতে তাঁরা বিপুল রোমাঞ্চও অনুভব করেন। অবশ্য এককভাবে তাঁদেরকে দায়ী করা অনুচিত। দেহের কোন অংশে প্রদাহ সৃষ্টি হলে, রোগাক্রান্ত অংশ শুধু নয়, রোগ-প্রতিরোধে অক্ষম ও অমনোযোগী পুরো দেহটাই এজন্য দায়ী। অনেকটা এইরকমই। আমাদের কিছু আত্মভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবী মুসলমান হয়েও ইসলাম ও মুসলমানিত্বকে যতভাবে সম্ভব অপমান করার চেষ্টা করছে, এক্ষেত্রে আমাদের পুরো সমাজ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীও কম দায়ী নয়। যাই হোক, এ-বিষয়ে 'ঋভু ও ঋষভের কাহিনী' শীর্ষক একটি আলোচনা পরিশিষ্টে যুক্ত হয়েছে। মূল বইটির যা-প্রতিপাদ্য, পাঠক লক্ষ করবেন, তা-থেকে পরিশিষ্টে গৃহীত অংশটুকুর অবস্থান খুব-একটা দূরবর্তী নয়।

আবু জাফর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামের পরিচয় তাৎপর্য ও অপরিহার্যতা

'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি, গাত্রোত্থান করুন। পবিত্রতা অবলম্বনকরত কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন এবং মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন আপনার প্রতিপালকের' (সূরা মুদ্দাস্‌সির)। বস্ত্রাচ্ছাদিত মোহাম্মদ (সাঃ) শয্যাত্যাগ করলেন। এবং তারপর আল্লাহপাকের নির্দেশানুযায়ী সাফা পাহাড়ের পাদদেশে মক্কাবাসীকে সমবেত হতে আহ্বান জানালেন। সবাই জমায়েত হলো। সমবেত সবাইকে উদ্দেশ্য করে রাসূল (সাঃ) বললেন, আমি যদি বলি, এই পাহাড়ের পশ্চাদ্দিকে একদল শত্রু তোমাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করবে বলে অপেক্ষা করছে, তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে? সবাই একবাক্যে বলে উঠলো: তুমি আল আমীন, তোমাকে অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তখন রাসূল (সাঃ) যা-বললেন, তার মর্মার্থ হলো, সকল মানুষ এক নিদারুণ ভীতি ও সর্বনাশের মধ্যে অবস্থান করছে। এই আপাত-মনোরম পার্থিব জীবনের অন্যপারে অপেক্ষা করছে এক ভয়াবহ ব্যর্থতা ও অন্ধকার ও পরাভব। দুশমন এখানে এই পৃথিবীতে সেই সর্বনাশের দিকেই মানুষকে প্রলুব্ধ করছে। এ-থেকে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনকরত, একমাত্র সর্বনিয়ন্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করাই সমূহ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

কিন্তু মানববংশের জন্য এই শ্রেষ্ঠতম পয়গাম সেদিন উপেক্ষিত হলো; এবং আল্লাহর হাবীব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) সেদিন আপ্যায়িত হলেন আপন পিতৃব্য আবু লাহাব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রাঘাতে। এইভাবেই শুরু। কিন্তু নিগ্রহ লাঞ্ছনা, সর্বাত্মক দুশমনী, প্রাণঘাতী অসূয়া ও বৈরিতা সবকিছু কীভাবে পরাভূত হলো, কীভাবে মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হলো সমগ্র আরব, কীভাবে ক্রমশ পুরো জাযিরাতুল আরব প্লাবিত হলো ইসলামের নূরে ও মহিমায়, সেই ইতিহাস কারো অজানা নয়।

কিন্তু আধুনিক পৃথিবীর কলহ-কোলাহলে একটি বিষয় আজ প্রায়শ আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় যে, কাফের মুশরিক মুরতাদ মুনাফিকদের বিশ্বব্যাপী সহস্র বৈরিতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ইসলামের অগ্রযাত্রা আজও কিছুমাত্র শ্লথ কি মন্থর হয় নি। তার প্রসার ও বিস্তার পূর্বের মতই অব্যাহত, অপ্রতিহত। রিডর্স ডাইজেস্ট ইয়ার বুক'৮৩ একটি নির্ভুল পরিসংখ্যান পেশ করেছিল; যেখানে দেখতে পাই, গত অর্ধশতাব্দীর হিসাব মোতাবেক অন্য যে-কোন ধর্মাবলম্বীর তুলনায় মুসলমানের ক্রমবৃদ্ধির হার খুবই চমকপ্রদ। পঞ্চাশ বছর সময়কালে যেখানে খ্রীস্টান বেড়েছে, রোমান ক্যাথলিক প্রটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি সব নিয়ে ১৩৮ শতাংশ, হিন্দু ১১৭ শতাংশ, বৌদ্ধ ৬৩ শতাংশ, সেখানে মুসলমান বেড়েছে ২৩৫ শতাংশ। অথচ এই ক্রমবৃদ্ধির পশ্চাতে অন্যদের

www.pathagar.com

তুলনায় মুসলমানের অর্থ ও পরিশ্রম খুবই নগণ্য। এ-থেকে খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়, ইসলাম যথার্থই আল্লাহপ্রদত্ত এমন এক শাশ্বত প্রাণশক্তির আধার, এমন এক অক্ষয় নূর, যা ধীরে ধীরে একদিন গোটা পৃথিবীকেই অধিকার করে নেবে। অবশ্যই নেবে, কাফের মুশরিকদের শত বাধা ও বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস সত্বেও এটা হবে। হবে এইজন্য যে, ইসলাম মানববংশের জন্য আল্লাহপাক-প্রদত্ত নির্ভুল চিকিৎসার একটি অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। পৃথিবী দীর্ঘদিন এই ব্যবস্থাপত্রের প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না। ইসলামকে মূঢ়তাবশত শত্রুজ্ঞান করলেও, রোগযন্ত্রণার কারণেই পৃথিবীকে আশ্রয় নিতে হবে ইসলামের ছায়াতলে।

কিছু মুনাফিক ও কিছু ইসলামবিদ্বেষী অমুসলিম পণ্ডিতজন যা-ই বলুক ও যা-ই ভাবুক, ইসলাম কী, এই কথাটি জানলেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ইসলাম পৃথিবীবক্ষে পরাভব মেনে নেবার জন্য অবতীর্ণ হয় নি। আল্লাহপাক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, এই ধর্ম তাঁর একান্ত মনোনীত; এবং এই কথাও ঘোষণা করেছেন যে, কাফের মুশরিকদের হৃদয়ে যতই রক্তক্ষরণ হোক, তারা নিভিয়ে দিতে যত চেষ্টাই করুক, এই মহিমান্বিত দীপশিখা ক্রমাগত এক অনিঃশেষ শুক্লপক্ষের চাঁদের মত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে।

অনেকে বলেন, ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। এই কথায় দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই; কারণ ইসলাম নিঃসন্দেহে সর্বমানবিক সুবিচার ও শান্তির অব্যর্থ গ্যারান্টি। কিন্তু এই সংজ্ঞার মধ্যে ইসলামের মৌল দাবী ও অভিজ্ঞান পরিপূর্ণরূপে ভাষা পায় না। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম হলো রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের ভিত্তিতে আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত ও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। এইজন্যই যত বড় পণ্ডিতই হোক, যত মেধাবী পার্লামেন্টের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তই হোক, যদি-তা আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসুল (সাঃ) পেশকৃত সংবিধানের এতটুকু পরিপন্থি হয়, তবে সেই সিদ্ধান্ত যে-কোন মুসলমানের কাছে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান ও পরিহারযোগ্য। অতএব ইসলাম মানে মানবজীবনের সার্বক্ষণিক ও সর্বতোমুখী সমাধানের একটি অলঙ্ঘনীয় রূপরেখা। এবং ইসলামে প্রবেশ করার অর্থ, জীবনের সকল ফয়সালাকে আল্লাহপ্রেরিত এই সাংবিধানিক রূপরেখার ভিত্তিতে অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করা। আল্লাহপাক এই কারণেই বলেন, তোমরা পূর্ণরূপে মুসলমান না-হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। অর্থাৎ জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রে কোন একটি সময়েও যেন ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোন অন্য কারো বিধান স্থিতিলাভ না-করে। অতএব কোন মুসলমানের আদৌ এই সুযোগ নেই যে, সে কোন কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে মেনে নেবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অস্বীকার করবে। যদি এ-রকম হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে সেটা হবে মুনাফেকীর দৃষ্টান্ত। কারণ, একক অখণ্ড সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকারী আল্লাহপাকের বিধানকে আপন সুবিধামত গ্রহণ-বর্জনের যে-তরীকা, সেটা কুফরি-তো বটেই, চূড়ান্ত মুনাফেকীও বটে।

www.pathagar.com

ইসলাম যা তার অনুসারীদের কাছে চায় ও দাবি করে, তা বাউলদের ফকিরিতন্ত্রের মত কোন অধরা বস্তু নয়, ইসলামের দাবি খুবই সহজ ও বাস্তব ও প্রাসঙ্গিক; ইসলাম চায় আল্লাহর কাছে, একমাত্র আল্লাহরই কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণ যার যতটা নিখাদ ও নিঃশর্ত, তার মুসলমানিত্বও ততটা খাঁটি ও নিখাদ। পৃথিবীতে কোন মানুষই খুব বেশিদিন বাস করে না; তার প্রকৃত আবাসস্থল হলো অনন্তদিনের জান্নাত অথবা অনন্তদিনের অগ্নিগর্ভ জাহান্নাম। অতএব কোন মানুষ যদি পৃথিবীর মধ্যে হারিয়ে যায়, সে মানুষই হতে পারে না, ঈমানদার মুসলমান হওয়ার-তো প্রশ্নই ওঠে না। আল্লামা ইকবাল বড় সুন্দর করে বলেন, 'কাফের কি ইহ্ পহ্চান কি আফাক্ মে গুম হায়; মুমিন কি ইহ্ পহ্চান কি গুম উসমে হায় আফাক'। বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়- কাফেরের পরিচয়, সে পৃথিবীর মধ্যে হারিয়ে যায়; আর মুমেনের পরিচয় হলো, তার মধ্যে পৃথিবীই হারিয়ে যায়। অতএব মুসলমানের কাছে পৃথিবী শুধু এই অর্থে গুরুত্বপূর্ণ যে, এখান থেকেই তাকে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করতে হবে, এখান থেকেই অর্জন করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। কিন্তু খুবই দুঃখের কথা, মুসলমান শুধু এই বিষয়টি বিস্মৃত হয় নি, নানা কুফরি-প্রভাবে বিষয়টি বুঝতেও ভুল করছে। পুনরায় উল্লেখ করি, ইসলামের সকল কথার সারমর্ম হলো, আল্লাহর কাছে নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পণ। কিন্তু এই সমর্পণ গঞ্জিকামুগ্ধ বায়ুগ্রস্ত বাউলদের মত কোন তুরীয়লোকে হারিয়ে যাওয়ার মত নয়, অথবা খ্রীস্টান রাহিব ও নান্দের মত সকল পার্থিবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে-থাকা নয়, অথবা পৌরাণিক ঋষিদের মত বিবিক্ত বিচ্ছিন্ন অরণ্যবাস গ্রহণও নয়। এই আত্মসমর্পনের অর্থ হলো, ইবলিসের পদলেহী যে-খেয়ালখুশির পৃথিবী, তার বিপরীতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)এর প্রদর্শিত পথে একটি সুশীল ও সুষম পৃথিবী গড়ে তোলার সাধনায় সর্বস্ব নিয়ে আত্মনিয়োগ করা। এবং এই কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বলেই, মুসলমান পৃথিবীবক্ষে আল্লাহর প্রতিনিধি, খলীফাতুল আরদ্। এবং বলা বাহুল্য, এইজন্যই কুরআনুল কারীমে বার বার এত জিহাদ ও সহিষ্ণুতার তাগিদ। পৃথিবীর পক্ষে এটা অনুধাবন করা কষ্টকর নয় এবং মুসলমানের-তো নয়-ই যে, ইসলামে এই সহিষ্ণুতার অর্থ নিরুপায় কোন বিধবার ধৈর্যাবলম্বন নয়, এবং জিহাদের অর্থও নয় প্রাচীন রোমীয় গ্লাডিয়েটরদের মত জীবন হাতে নিয়ে শক্তি ও সাহস প্রদর্শনের জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতরণ অথবা হালাকু খানের মত পৈশাচিক আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ওঠা। মুসলমানের কাছে জিহাদ ও ধৈর্যের অর্থ হলো, আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সর্বদা দৃঢ়পদ ও অবিচলিত থাকা। এবং এইজন্যই রাসুল (সাঃ) বলেন, হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর পথে দৃঢ়পদে এক ঘন্টা যুদ্ধ করা, কদরের রাত্রে হজ্‌রে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে রাতভর ইবাদত করার থেকে বহুগুণে উত্তম'। অর্থাৎ আল্লাহর জমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার যে-বৈপ্লবিক ভূমিকা ও কর্মধারা, সেটাই ইসলাম, সেটাই ইসলামের মূল পয়গাম। ইসলাম এক্ষেত্রে নিরাপস।

www.pathagar.com

প্রশ্ন আসে, তাহলে ভিন্নধর্মাবলম্বীর সঙ্গে মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কি অসম্ভব? না, অসম্ভব-তো নয়-ই, বরং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইসলামের একটি অলংঘনীয় ঘোষিত শর্ত। ইসলাম-যে নিরাপস, সেই কথার অর্থ ও তাৎপর্য কী, তা পরে আলোচিত হবে। সহাবস্থান প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে-কোন রকম জোর-জবরদস্তি ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর অধিকার এমন নিশ্ছিদ্র-নিরাপত্তার মধ্যে সুরক্ষিত যে, রাসুল (সাঃ) বলেন, কারো দ্বারা কোন অমুসলিম সামান্যতম জুলুম ও অত্যাচারের শিকার হলে, সেই অমুসলিম নাগরিকের পক্ষে তিনি নিজে বাদী হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে মামলা দায়ের করবেন। অতএব ইসলামী শাসনের আওতায় কোন অমুসলিম নাগরিকের হক ও ধর্মকর্মের অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা, কিছুই কিছুমাত্র বিনষ্ট হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সম্ভাবনা-তো নেই-ই, বরং তাদের সকল ন্যায্য অধিকার হেফাজত করা ইসলামী রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য সাংবিধানিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করাও ইসলাম। কতখানি সতর্কভাবে ও ইনসাফের সঙ্গে এই দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়, একটি উদাহরণ থেকে তা সম্যক অনুধাবন করা সম্ভব। খলীফা হজরত উমার ফারুক (রাঃ) যেদিন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে জেরুজালেমের শাসনভার গ্রহণ করলেন, সেদিন একজন পাদরি তাঁকে তাদের গীর্জায় দু'রাকাত নামাজ আদায়ের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। অনুরোধ রক্ষার্থে হজরত উমার (রাঃ) গীর্জার পার্শ্ববর্তী একটি স্থানে নামাজ পড়ার পর পাদরিকে বললেন, আমি গীর্জার মধ্যেই নামাজ পড়তে পারতাম, পড়লাম-না শুধু এই কারণে যে, পরবর্তীকালে এই অসিলায় মুসলমানেরা গীর্জাটিকে মসজিদ বানিয়ে ফেলতে পারে। এই হলো ভিন্নধর্মাবলম্বীদের সাথে ইসলামী শাসনব্যবস্থার নৈতিক ও প্রশাসনিক সম্পর্ক। অতএব সহাবস্থানে কোন বাধা নেই। কারণ, ইসলাম সেই বাধা ও সমস্যাকে শুধু অস্বীকার করে না, বাধাকে মূলোৎপাটিত করে এবং বাধা-সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাগ্রহণের নির্দেশ দেয়। তবে এক্ষেত্রে কিছু অবশ্যমান্য শর্ত বর্তমান, এবং সেইখানেই ইসলাম নিরাপস।

অমুসলিম নাগরিক সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ভোগ করবে সত্য, তার সকল অধিকার অতিশয় পবিত্রজ্ঞানে সুরক্ষিত থাকবে এটাও সত্য। কিন্তু গোপনে হোক, প্রকাশ্যে হোক, ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামের বিরুদ্ধে যে-কোন রকম তৎপরতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ 'প্রগতি' 'উদারতা' 'মুক্তবুদ্ধি' 'মানবাধিকার' 'নারী স্বাধীনতা' এইসব মিথ্যা ও কুহকের অবতারণা করে ইসলামের ক্ষতি ও সর্বনাশ-সাধনের চেষ্টা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় একটি গর্হিত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ-ব্যাপারে ইসলাম পরমাণু-পরিমাণ শৈথিল্যও অনুমোদন করে না। দ্বিতীয়ত, অমুসলিম নাগরিককেও ইসলামী দণ্ডবিধির আওতায় বসবাস করতে হবে। উদাহরণত, ব্যভিচারের যে-শাস্তি তা মুসলিম অমুসলিম সকল নাগরিকের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। বেদ কি বাইবেলের দোহাই দিয়ে অথবা কোন কূটতর্কের আশ্রয় নিয়ে এই শাস্তি এড়ানো যাবে না; এবং এই কথাও বলা যাবে না,

www.pathagar.com

পশ্চিমারা যেমন বলে, উভয়ের সম্মতিক্রমে যাই ঘটুক, তা সবই নির্দোষ। অবশ্য কিছু উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী এই দুটি বিষয়কে ইসলামের অত্যন্ত 'গোঁড়া ও অনুদার ও অপরিশীলিত' জবরদস্তি বলে আখ্যায়িত করে। পৃথিবীর অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী যেহেতু আপন স্বার্থরক্ষায় কুশলি মতলববাজও বটে; তাদের যে-কণ্ঠস্বর তা যেহেতু তাদের প্রভুদেরই রেকর্ডকৃত বিশ্বস্ত প্রতিধ্বনি, এই সকল বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য খুব-একটা ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। এটা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত, সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ইসলামের যা-বক্তব্য ও বিধান, তা কোনটাই সাধারণ বুদ্ধি ও ইনসাফের এতটুকু পরিপন্থি নয়। অতএব ইসলামের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে কোন অমুসলিম নাগরিক নিরর্থক হীনমন্যতাবোধে নিজেকে ছোট মনে করবে, অস্বস্তি ও কুণ্ঠাবোধ করবে, তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য হেতু নেই। কারণ, তার সার্বিক মর্যাদা ও অধিকার পূর্ণমাত্রায় সুরক্ষিত। অবশ্য ইসলাম যদিও আল্লাহপাকের একমাত্র মনোনীত দ্বীন, তবু তার পক্ষে অন্য যে-কোন ধর্মের সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করা সম্ভব ও অবশ্যকর্তব্য এই হেতু যে, আল্লাহপাক নিজে জবরদস্তিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এবং করেছেন এইজন্য যে, স্বতন্ত্রভাবে তিনি বলেই দিয়েছেন, 'কোন্‌টা হেদায়েত এবং কোন্‌টা গোমরাহি' (সূরা বাকারা)। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়াতলে পূর্ণ গোমরাহি নিয়ে কাফের মুশরিক পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাও সম্পূর্ণ নিরাপদ।

এতদসঙ্গে এই প্রশ্নও ওঠে, উঠতে পারে, ইসলাম কি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী? না, ইসলাম এই ধরনের বিশ্বাসকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করে। কেউ কেউ যদিও ভুলক্রমে কিংবা বৈষয়িক মতলবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরতে চান, কিন্তু ইসলামে এর কোন সমর্থন নেই। এটা শুধু ভুল নয়, ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অমার্জনীয় অপরাধ। ইসলাম হলো আল্লাহ-প্রদত্ত একটি অখণ্ড নূর; নূর অর্থাৎ আলো কি কখনো অন্ধকারের সখা হতে পারে? যদি কেউ বিশ্বাস করে, কোন ধর্মই মিথ্যা নয়; যদি বিশ্বাস করে, ইসলামও ভালো, আবার রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনও কম ভালো নয়; ইসলামের ইবাদত-পদ্ধতি যেমন ভালো, বাউলদের দেহতাত্ত্বিক ভজনাও তেমনি একটি উৎকৃষ্ট সাধনশৈলী; তাহলে ওই ব্যক্তির মধ্যে ঈমান ও মুসলমানিত্ব বলে কোন পদার্থই আর অবশিষ্ট থাকে না। শুধু থাকে-না নয়, সে একজন বিশ্বাসভ্রষ্ট, রীতিমত শাস্তিযোগ্য মুরতাদে পরিণত হয়। অতএব যে-যাই বলুক, এই কথা মনে রাখা জরুরি যে, সত্য কখনো নানা বর্ণের হয় না। সত্য একটাই, সঠিক আলোকোজ্জ্বল পথও একটাই; এবং সেটা ইসলাম। আর ইসলাম যেহেতু একেবারে পূর্ণাঙ্গ ও সুসম্পূর্ণ জীবনবিধান, এখানে যোগ-বিয়োগ পরিবর্ধন-পরিমার্জনের কোন অবকাশ নেই। এবং কেউ যাতে এই দুঃসাহস ও মূঢ়তাকে এমনকি কল্পলোকেও প্রশ্রয় দিতে না-পারে, সেজন্য আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়তম রাসূল (সাঃ)কে লক্ষ করে বলেছেন, 'আমাদের উপর কোন কথা বানিয়ে বলতো, আমি তার দক্ষিণহস্ত পাকড়াও করতাম, তারপর তার

www.pathagar.com

গ্রীবাস্থিত ধমনী কর্তন করে দিতাম' (সুরা হাক্কাহ্)। এ-থেকে সামান্য বুদ্ধিশুদ্ধিও যার আছে, সে নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারে, ইসলাম কত কঠিনভাবে অপরিবর্তনীয়। অথচ আজ এক শ্রেণীর মুসলমান, অনেকটা আকবর বাদশার মত, ইসলামকে একটি সুস্বাদু ককটেলে পরিণত করতে চায়। পার্থক্য শুধু এইটুকু, আকবর বলতেন 'দীন ইলাহী', এরা বলে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। আকবর এই চেষ্টা করেছিলেন নানা ধরনের কিছু মতলবী ধর্মগুরুর কুপ্ররোচনায় অমরত্ব-লাভের নেশায়; আর একালে এই কাজে যারা ব্রতী ও অগ্রণী, তারা লাভ করতে চায় পশ্চিমা-প্রভুদের কৃপাদৃষ্টি ও তৎসন্নিহিত কিছু বৈষয়িক সুবিধা। নেপথ্যে কারণ যাই-ই থাক, এই জাতীয় বালখিল্যতা-যে ইসলামের চোখে খুবই গর্হিত একটি বস্তু, রাসুল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের জীবনব্যাপী নিরন্তর সংগ্রামই তার প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞান।

অতএব 'লা ইকরাহা ফিদ্বীন' অথবা 'লাকুম দি নুকুম অলিয়াদ্বীন' এই ধরনের বাক্য বা বাক্যাংশ উদ্ধৃত করে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার দলিল পেশ করে, তারা আসলে আল্লাহপাকের এই সকল কথার যে-মূল ব্যঞ্জনা, সেটাকে আড়াল করতে চায়। তাদের বক্তব্য উদ্দেশ্যমূলক ও পাপবিদ্ধ। এবং এই পাপবিদ্ধ অকথা-কুকথা কোনরূপ বিবেচনার-তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং ইসলামের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক এই ধরনের ব্যাখ্যায় এমনকি কর্ণপাত করাও যে-কোন মুসলমানের জন্য নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ।

ইসলাম কি পুরোহিততন্ত্র সমর্থন করে? অনেকের ধারণা, করে। কিন্তু ইসলাম কারো ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এতটুকু নির্ভরশীলও নয়। ইসলামের একমাত্র নির্ভর যে-আলকোরআন ও আলহাদীস, সেখানে কোথাও পীর পুরোহিত পাদরিতন্ত্রের প্রতি এতটুকু সমর্থন নেই। ইসলামে নিশ্চয়ই বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে; এবং সে-সকল বিষয় শিক্ষার জন্য ইল্‌ম ও আমলের অধিকারী উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে যাবার তাগিদও আছে। কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে মধ্যস্থতাকারী মধ্যস্বত্বভোগীর কোন স্থান ইসলামে নেই। 'গুরুভক্তি' 'গুপ্তবিদ্যা' এ-সব হিন্দুধর্মের অপরিহার্য অনুষঙ্গ; ইসলাম এই ধরনের আত্মবিনাশী অলীক দুর্বলতা থেকে মানুষকে পুরোপুরি মুক্ত রাখতে চায়। কারণ এই ধরনের বিশ্বাস মানুষের সুউচ্চ মানবিক মহত্বকেই শুধু খর্ব করে না, সরলপ্রাণ মানুষকে শোষণ করার একটি অস্ত্র হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এবং এইভাবেই ধর্মের নামে ধর্মব্যবসা জমে ওঠে। অথচ এই ধরনের কুহক যাতে আদৌ তৈরী হতে না-পারে, সেজন্য আল্লাহপাক বলেন, তিনি আমাদের গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী, আমরা ডাকলে তিনি সাড়া দেন, আমরা স্মরণ করলে তিনিও স্মরণ করেন। অতএব বাউলপন্থীদের 'সাঁই', হিন্দুদের পুরোহিত বা ধর্মগুরু, খ্রীস্টানদের বিভ্রান্তিকর Doctrine of Atonement-এর বাহানায় পাপ ও অনুতাপের স্বীকারোক্তি-গ্রাহক পাদরি, ইসলামে এই জাতীয় কেউ নেই এবং কেউ হতেও পারে না। এমনকি রাসূল (সাঃ)ও কখনো বলেন-নি যে, তিনি আখেরাতে

www.pathagar.com

কারো কোন উপকার করতে পারবেন। কারণ, আখেরাতের সেই ভয়াবহ আদালতে সব মানুষকে তার আপনাপন পার্থিব কৃতকর্ম নিয়ে হাজির হতে হবে; দেখা যাবে চূড়ান্ত আমলনামা প্রস্তুত হয়েই আছে, এবং তা যথাহস্তে ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। এবং সেই কর্মলিপি এত নিখুঁত ও নির্ভুল যে, সেখানে অণু-পরিমাণ ভালো এবং অণু-পরিমাণ মন্দ সবই স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে (সুরা জিলজাল)। অর্থাৎ যা-হবে তা কর্মফলের ভিত্তিতেই হবে; যে প্রাপ্য নির্ধারিত হবে, তা আল্লাহপাকের নির্ভুল ইনসাফ এবং তৎসঙ্গে তাঁর সীমাহীন ক্ষমা ও অনুগ্রহের দ্বারাই নির্ধারিত হবে। আল্লাহপাক 'আহকামুল হাকিমীন', আল্লাহপাক 'রাহমানুর রাহীম'; তিনি শ্রেষ্ঠতম বিচারক এবং তিনিই মানুষের প্রতি সর্বাধিক দরদী। কাজেই তাঁর শাহী-দরবারে কোন্ যুক্তি ও কী-অধিকারে কেউ কোন সুপারিশ পেশ করতে পারে? অতএব আমরা আমাদের চিত্তদৌর্বল্যবশত পীর-মুরশিদের দামান্ আঁকড়ে ধরে বৈতরণী অক্লেশে অতিক্রম করার কথা ভাবলে ভাবতে পারি, কিন্তু ইসলাম এই জাতীয় অযৌক্তিক খেয়া-পারাপারের কথা মিথ্যা-তামাশা বলে প্রত্যাখ্যান করে। যে-সকল পীর তাদের মুরীদকে এই ধরনের অলীক আশার বাণী শোনায় যে, কবরে ও হাশরের মহাসংকটে সে পাশে থাকবে ও মুরীদদের সাহায্যার্থে যা-করার করবে, সে নিঃসন্দেহে ভণ্ড ও প্রবঞ্চক। ইসলামে মসজিদ আছে, মসজিদে ইমামতি করবার জন্য ইমামও আছেন; মাদরাসা আছে, সেখানে ইসলামী শিক্ষাদানের জন্য উস্তাদও আছেন; ইসলামী রাষ্ট্র আছে, ইসলামের বিধি অনুযায়ী সেই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য খলীফাও থাকবেন; কিন্তু কারো পাপের ভার অন্য কেউ বহন করবেন, কারো প্রার্থনা আল্লাহর কাছে অন্য কেউ পেশ করবেন ও মঞ্জুর করিয়ে নেবেন, এই ধরনের কোন ব্যবস্থা ইসলামে নেই। এটা মানুষের স্বকপোলকল্পিত একটি অসার ধারণা। এই রকম বাজে ধারণায় বিশ্বাসস্থাপন রীতিমত তওহিদের পরিপন্থি, বহুলাংশে অংশীবাদেরই সম-অর্থবোধক। অতএব এটা পরিষ্কার যে, ইসলামে কোনভাবেই কোন পীরবাদ পুরোহিতবাদ বলে কিছু নেই।

ইসলামে বৈরাগ্যবাদ বলেও কিছু নেই। অনেক ধর্মে ব্যক্তি-জীবনকে নিরর্থক কৃচ্ছতা ও বঞ্চনার হাতে সঁপে দিয়ে এক ধরনের আত্মিক মুক্তি ও সাফল্যের কথা বলা হয়। কিন্তু বস্তুত এটা জীবন থেকে পলায়নপরতা; জীবনকে ফাঁকি দিয়ে জীবনের সাফল্য সন্ধানের এক ব্যর্থ অনুশীলন। ইসলাম এই ধরনের অবাস্তব অসংগত ও নাটকীয় ভাবাবেগকে সম্পূর্ণরূপে বর্জনের নির্দেশ দেয়। ইসলাম এমন একটি দ্বীন, যা জীবনের সম্পূর্ণতাকে পুরোপুরি অঙ্গীকার করে; এবং এই দ্বীনের মূল সাংবিধানিক রূপরেখা প্রণীত হয়েছে আল্লাহপাকের পথনির্দেশ ও রাসুল (সাঃ)এর আদেশ নির্দেশ ও ব্যবহারিক জীবনাদর্শ দ্বারা। বলাই বাহুল্য, এখানে অর্থাৎ কুরআনুল কারীম ও পবিত্র হাদীস সমূহে কোথাও জীবনকে পাশ কাটিয়ে জীবনকে জয় করার কথা নেই। বরং যা-আছে তা হলো,

www.pathagar.com

জীবনের সকল দাবীকে পূর্ণ দায়িত্বশীলতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে গ্রহণ ও পালন করার নির্দেশ। আহারে-বিহারে সংযম-রক্ষা ইসলামের একটি সৌন্দর্য; কিন্তু এই সৌন্দর্য-প্রতিষ্ঠার অর্থ এই নয় যে, জীবনের স্বাভাবিক দাবী ও চাহিদাগুলোকে হত্যা করতে হবে। এই ধরনের আত্মহত্যা-সদৃশ আত্মবঞ্চনা অন্য অনেক ধর্মে যত গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচনা করা হোক, ইসলামে এক পয়সা মূল্য নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ ইসলামের মুখ্য দাবীই হলো, পৃথিবীবক্ষে আল্লাহর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবিচল থাকা, ফিত্না সমূলে উৎপাটিত না-হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখা। কিন্তু এই কাজ-কি বৈরাগ্যপিপাসু সংসারবিমুখ দরবেশের দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব? না, সম্ভব নয়; এবং যেহেতু সম্ভব নয়, ইসলামের মৌল দাবীর সঙ্গে এই বৈরাগ্যের কোন সংগতিও নেই, সম্পর্কও নেই। কারো অজানা নয়, জামাতবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করার মধ্যে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াবের কথা রাসুল (সাঃ) উল্লেখ করেছেন; এবং যারা বিনা ওজরে জামাত পরিহার করে একাকী নামাজ পড়ে, তাদের ব্যাপারে তিনি প্রচণ্ড উষ্মা ও ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু জামাতের এত মর্যাদা কেন? মর্যাদা এইজন্য যে, ইসলামে ইবাদত মানে সর্বদায়ই নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মধ্যে আরাধনা নয়, একতাবদ্ধ থাকাটাও আল্লাহপাকের কাছে একটি মনঃপূত ইবাদত। এবং মানুষের সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে ওতপ্রোত মিলন ও সমন্বয়ও ইসলামের একটি অপরিহার্য শর্ত। এ-নাহলে ইবলিসের মোকাবিলায় আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার যে-নিরবচ্ছিন্ন রণ, সেই রণে ইবলিস অতি সহজেই ওয়াকওভার পেয়ে যায়। অতএব বৈরাগ্য নয়, সার্বক্ষণিক জিহাদ ও জিহাদী তামান্নাই হলো ইসলামের প্রকৃত অভিজ্ঞান।

পৃথিবীতে ইসলাম কী-ধরনের শাসনব্যবস্থা দেখতে চায়? মানব-অধ্যুষিত এই বিশ্বে ইসলাম চায় একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। এবং এই ধরনের আলো ও কল্যাণময় পৃথিবী নির্মাণের অব্যর্থ ডিজাইন বা নীলনক্সাই হলো ইসলাম। কিন্তু মানবজীবনের একটি প্রায়-অনতিক্রম্য ট্রাজেডী হলো, সত্যের চেয়ে মানুষ তার আপন স্বভাবদোষ ও স্বকৃত স্বসৃষ্ট প্রমাদসমূহকেই প্রিয়জ্ঞানে অধিক প্রিয় ভাবতে ভালোবাসে। অবশ্য প্রকৃত অর্থে এই ভ্রান্তিবিলাস ইবলিসেরই কুপ্ররোচনা। ইবলিসের এই প্ররোচনামুক্ত একটি সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী নির্মাণই ইসলামী শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য। এবং এই লক্ষ্য সামনে রেখেই একজন মুসলমানকে কাজ করে যেতে হয়। এটা ফরজ, রীতিমত ফরজে-আইন। কারণ, সকল তাগুতি-অপশক্তির মোকাবিলায় পৃথিবীকে যদি আল্লাহর পথনির্দেশ ও রাসুল (সাঃ)এর জীবনাদর্শের আলোকে সাজিয়ে তোলা না-যায়, সেই সংগ্রামী তামান্না যদি মুসলমানকে নিরন্তর কর্মিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ী করে না-রাখে, তাহলে তাকে খলীফাতুল আর্দ বলার কোন যুক্তিই থাকে না। আর এক্ষেত্রে মুসলমানের পক্ষে নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষ অমনোযোগী হয়ে বসে থাকার কোন যুক্তি নেই। অন্য ধর্মাবলম্বীরা নিরপেক্ষ থাকতে পারে, থাকতে অনেকটা বাধ্যও বটে; কারণ ইসলাম ছাড়া

www.pathagar.com

পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোন ধর্ম নেই, যেখানে সমস্যাসংকুল পৃথিবী-পরিচালনার কোন রূপরেখা আছে। ওগুলি নামেই ধর্ম, কিন্তু কার্যত সেখানে মানুষের কোন সমস্যার কোন সুরাহা নেই, কোন ফয়সালা নেই। বুঝবার সুবিধার্থে উল্লেখ করতে পারি, যত বিপুলসংখ্যক মানুষেরই নিত্যপাঠ্যবস্তু হোক, বেদ কি ত্রিপিটক কি বাইবেলের সুসমাচার অথবা গ্রন্থসাহেব, এইসব কোনকিছু দিয়ে কি পৃথিবীর কোন একটি সমস্যারও ফয়সালা দেয়া সম্ভব? আসলে যে-কোন ধর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এটা বুঝা যায় যে, তার মধ্যে ভালো-মন্দ অনেক কিছু আছে, কিন্তু রাষ্ট্রশাসনের কোন সাংবিধানিক শক্তি নেই। যা-আছে তা এত অপ্রতুল ও নানাহাতে বদ্‌লে যাবার কারণে এতই প্রমাদবহুল, যা-দিয়ে পৃথিবী-তো দূরের কথা, একটি পাবলিক-টয়লেটও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অতএব এই ধর্মাবলম্বীরা যদি আপনাপন ধর্মের রিক্ততা ও অসারতা ও অসহায়ত্বের কারণে ঘোরতরভাবে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে, সেটা যুগপৎ স্বাভাবিক ও সংগত। কিন্তু ইসলামে যেহেতু কোনরূপ অসম্পূর্ণতা নেই, মুরগির ফার্ম থেকে জাতিসংঘের সদর দফতর পর্যন্ত সর্বত্রই ইসলাম যেহেতু কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে চোখ বন্ধ করে মুহূর্তমধ্যে মানবজীবনের যে-কোন সমস্যার সর্বোত্তম ফয়সালা দান করতে সক্ষম, মুসলমান কোন্ দুঃখে ধর্মনিরপেক্ষ হতে যাবে! তবু দুঃখের যে, কিছু মুসলমান আজ এই ইবলিসি-পণ্য বাজারজাত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। আসলে পৃথিবী ইসলাম দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হোক, ইবলিস এটা চায় না; স্বাভাবিকভাবে ইবলিসের অনুচরেরাও চায় না। অবশ্য চাইতে পারেও না; কারণ, মানুষের দুঃখ দুর্ভোগ অকল্যাণ ও নিরাপত্তাহীনতাই হলো এই অনুচরদের জীবিকা ও অস্তিত্ব। এইজন্য চুরি দস্যুতা শোষণ অবিচার ইত্যাদি কোনকিছু নিয়েই তাদের কোন দুর্ভাবনা নেই; তাদের একমাত্র দুর্ভাবনা হলো ইসলাম। এইজন্যই ধর্মনিরপেক্ষ ধরনের নানা কুৎসিত বাহানায় ইসলামকে প্রতিরোধ করতে তারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু ইসলাম যেহেতু আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, ইসলামের নূর কখনো নির্বাপিত হবে না; স্বেচ্ছাজাহান্নামীদের কূটকৌশলও কখনো সফল হবে না। যা-হবে তা হলো, ইসলামের বিপরীত মেরুতে অবস্থানরত অন্ধকার জগতের এই বাসিন্দারা ইতিহাসে মানবতার নিকৃষ্টতম দুশমন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

এটা একটা প্রশ্ন যে, পৃথিবীর সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক কী-রূপ? বলাই বাহুল্য, সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইসলাম পৃথিবীকে গভীরভাবে ভালোবাসে। অবশ্য এই ভালোবাসা, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' ধরনের সফেন রাবীন্দ্রিক উচ্ছ্বাস নয়, শালিক বা শঙ্খচিল হয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণের জীবনানন্দীয় আকুলতাও নয় অথবা দা-ভিঞ্চির অত্যুষ্ণ মোনালিসা-প্রীতিও নয়। এই ভালোবাসা জননীর অকৃত্রিম সন্তান বাৎসল্যের মত; বলা উচিত, তার চেয়েও সহস্রগুণ খাঁটি ও ঘন ও গভীর। মুসলমানের কাছে পৃথিবী খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই তাৎপর্যবহ। এবং সেটা এইজন্য নয় যে, এখানে ডায়ানা-মনিকারা

www.pathagar.com

সহজলভ্য, এখানে ডলার ছিটিয়ে জীবনটাকে আনন্দের মন্দাকিনীতে যথেচ্ছ ভাসিয়ে দেয়া যায়। ইসলাম জীবন ও পৃথিবীকে এইভাবে দেখে না; দেখা গুরুতর অপরাধও বটে। ইসলাম একটি প্রকৃষ্ট জীবনদর্শন; যে-দর্শনের মূল কথা হলো, জীবন এখানেই শেষ নয়। মানুষের জীবন এক অনন্ত আখেরাতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। তার পার্থিব জীবন মাতৃ-উদরে গর্ভবাসের মত; সে অচিরেই ভূমিষ্ঠ হবে মৃত্যু-পরবর্তী অন্য এক অনন্ত জীবনে, যেখানে তার সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপিত হবে এই পার্থিব ক্রিয়াকর্মের ভিত্তিতে। অতএব মুসলমানের কাছে পৃথিবী একটি কর্ষণক্ষেত্র। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য নিয়ে, রাসুল (সাঃ)এর জীবনাদর্শকে সামনে রেখে একজন মুসলমানের কাজ হলো, এই জাগতিক সময়কালের পূর্ণ সদ্ব্যবহার। বৈধ উপভোগে ইসলামে কোন বাধা নেই। কিন্তু যেহেতু মিশকের গন্ধযুক্ত তাসনীমের সৌরভ-মেশানো সীলমোহরকৃত মদিরায় আকণ্ঠ আনন্দে অসংখ্য পদ্মরাগমণিসদৃশ নারীর সংসর্গসুখের এক অফুরন্ত সময়ের প্রতিশ্রুতি আল্লাহপাক স্বয়ং ঘোষণা করেছেন, (দ্রষ্টব্য : সূরা আর রাহমান, সূরা নাবা, সূরা মুতাফফিফিন) আল্লাহর দাসত্ব শিরোধার্য করে পৃথিবীর দিনগুলি আখেরাতকে সামনে রেখে বৈধতার মধ্যে যাপন করাই লাভজনক। পৃথিবীকে নিয়ে পাগল হয়ে-ওঠার কোন যুক্তিই নেই। মূলত, পৃথিবী কোন উপভোগের জায়গাই নয়, পৃথিবী একটি পরীক্ষাগৃহ। প্রকৃত দুর্ভোগ বা উপভোগের জন্য আল্লাহপাক প্রস্তুত রেখেছেন অনন্ত আখেরাতের অনন্তদিনের জাহান্নাম ও জান্নাত। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ইসলামে নির্ধারিত হয় মানুষ ও পৃথিবীর যথোচিত সম্পর্ক।

অতএব আখেরাতের জবাবদিহিতা যেহেতু ইসলামী আকীদার একটি মৌল শর্ত, মুসলমানকে ভাবতেই হয়, পৃথিবীতে কী তার কাজ? এবং কী সেই দায়িত্ব যা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে যথাসাধ্য পালন না-করলে পারলৌকিক সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব হবে। মুসলমানের কাজ হলো, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও পার্থিব সকল বিষয়ে আল্লাহপাকের নির্দেশকে জারি করা ও জারি রাখা। কোন অবস্থাতেই কোন ক্ষেত্রে ইবলিস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা যেন ন্যূনতম বিজয়ও লাভ করতে না-পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যথাসাধ্য প্রতিরোধ রচনা করা। কাজটা সহজ নয়; কারণ ইবলিস কখনো বিনা বাধায় ইসলামকে ওয়াক-ওভার দেবার পাত্র নয়। অতএব সকল সেক্টরেই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ ইবলিসকে উৎখাত করে আল্লাহর বিধানকে যদি বিজয়ী করে তুলতে হয়, তাহলে মুসলমানকে জিহাদে অবতীর্ণ হতেই হবে। এইজন্যই ইসলামের সকল ইবাদতের শীর্ষে জিহাদের স্থান; 'জান্নাত তরবারির ছায়াতলে' (আল হাদীস)। কিন্তু মুসলমান আজ এই সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকেই সর্বাধিক গৌণ বিষয়ে পরিণত করে নিয়েছে। কাফের-মুশরিকদের মোকাবিলাকে মুসলমান আজ শুধু ভয় করে না, রীতিমত অনাবশ্যকও জ্ঞান করে। মনে হয় যেন, আল্লাহপাক নিতান্ত রসিকতাচ্ছলে কুরআনুল কারীমের শত শত

www.pathagar.com

জায়গায় জিহাদের অপরিহার্যতার কথা ঘোষণা করেছেন; এবং রাসূল (সাঃ)ও ইসলামের কারণে নয়, নেহায়েতই ব্যক্তিগত বীরত্ব প্রদর্শন ও ভূমিদখলের জন্য ওহোদের ময়দানে রক্তাপ্লুত হয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ)। যাই হোক, রাসূল (সাঃ) ও তাঁর অকুতোভয় সাহাবীদের উত্তরাধিকার নিয়ে এই বিষয়টিকে আজ সর্বাধিক প্রাধান্য না-দিয়ে উপায় নেই যে, ইসলামের বিজয় ও মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে মুসলমানের জন্য জিহাদ অপরিহার্য। মনে রাখা জরুরি, 'হে মুসলিম জাতি, তোমরা কখনোই জিহাদ পরিত্যাগ করো না; যে-জাতি জিহাদ পরিহার করে, আল্লাহ সে-জাতিকে অপদস্থ অপমানিত না-করে ছাড়েন না' (হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাঃ)। এবং রাসুল (সাঃ) আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, যে-ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করলো-না, বুকের অভ্যন্তরে সেই তামান্নাও রাখলো না, মুনাফেকীর উপর তার মৃত্যু। অতএব ইসলামের তরক্কীর প্রশ্নে, জয় পরাজয়ের প্রশ্নে, নানা কায়দা-কৌশলে জিহাদ এড়িয়ে থাকার অর্থ ইসলাম ও মুসলমানিত্ব থেকেই পুরোপুরি খারিজ হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন হতে পারে, ইসলামে দোয়া দরুদের মূল্য কতখানি, কার্যকারিতা কতখানি? মুসলমানের একমাত্র উপাস্য হলেন আল্লাহ, অভিভাবক এবং প্রতিপালকও আল্লাহ। অতএব এই সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে মুসলমান তার হৃদয়নিংড়ানো আবেগ ও বিশ্বাস নিয়ে যা-কিছু প্রার্থনা পেশ করবে, এটাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহপাক এই ধরনের আর্তিকে একটি পছন্দনীয় ইবাদত বলে গণ্যও করেন। এবং আল্লাহপাক-তো এইকথা সুস্পষ্টরূপে জানিয়েও দিয়েছেন যে, বান্দাহ তাঁকে স্মরণ করলে তিনি নির্বিকার থাকেন না; তিনিও স্মরণ করেন, সাড়া দেন। অর্থাৎ বান্দাহর কোন আরজু সম্পর্কেই তিনি গাফেল নন। অতএব ইসলামে দোয়া-দরুদ একেবারে নেই, একথা বলা অসমীচীন ও তথ্যগতভাবে ভুল। তবে এই প্রসঙ্গে এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলাম কোন দোয়া-মোনাজাতের ধর্ম নয়, ইসলাম উপহার দিয়েছে একটি সঠিক ও নির্ভুল বিজ্ঞানসম্মত কর্মপ্রণালী। সকল সমস্যা ও সংকট আলকোরআন ও রাসুল (সাঃ)এর সুন্নাহ যেভাবে মোকাবিলা করার আদেশ দেয়, সেই ভাবে মোকাবিলা করতে হবে। যথানিয়মে সংকটের মোকাবিলা না-করে দোয়া-দরুদের আড়ালে দাঁড়িয়ে সংকট উত্তরণের কথা ইসলাম বলে না। যে-কোন কাজের ফলাফল নিঃসন্দেহে আল্লাহপাকের হাতে; কিন্তু ভীরু ও সংগ্রামবিমুখ ও নিশ্চেষ্ট মানুষের কাছে না আল্লাহর কোন সাহায্য আসে, না আল্লাহপাক অকর্মণ্য এইসব মানুষের কাকুতি-মিনতির কোন মূল্য দেন। স্মরণ করতে পারি, বদর প্রান্তরে ইসলামের প্রথম সর্বাত্মক সশস্ত্র জিহাদ; অথচ প্রাণঘাতী অসংখ্য রণসজ্জিত দুশমনের মোকাবিলায় প্রায়-নিরস্ত্র অতি নগণ্য সংখ্যক মুজাহিদ। কী অভাবনীয় অসম যুদ্ধ! কিন্তু আল্লাহর নবী একবারও বলেন-নি, 'এসো, আমরা সবাই মাঠে সমবেত হয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি, কেঁদে কেঁদে বুক

www.pathagar.com

ভাসাই'। তিনি সবাইকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছেন, তিনি নিজেই সিপাহসালার। সবাইকে আল্লাহর পথে চূড়ান্ত কোরবানীর জন্য দাঁড় করিয়ে দিলেন। গগনবিদারী তওহিদের আওয়াজ তুলে সাহাবীরা অমিতবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধে; যুদ্ধ শুরু হবার পর রাসুল (সাঃ) আল্লাহর কাছে যা-বলবার বললেন। ইসলামের এটাই শিক্ষা এবং এটাই দাবী যে, নিজের যা-করণীয় তা প্রথমে করতে হবে, তারপর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা। মক্কী জীবনে রাসুল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের ওপর কাফেরদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ছিল নিত্যঘটনা। সাহাবীরা অনেকেই অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলল্লাহ, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন'। রাসূল (সাঃ) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, পূর্ববর্তী অনেক নবী ও তাঁদের উম্মতদের উপর এমন নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছে, যা লোমহর্ষক, অবর্ণনীয়। অর্থাৎ সত্য-প্রতিষ্ঠার যে-কঠিন দায়িত্ব মুসলমানের উপর অর্পিত, সেই দায়িত্ব-সম্পাদনে তাকে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় অনেক কোরবানী, সম্পদ ও রক্তের অনেক নজরানা পেশ করতে হবে, তারপর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা। এটাই আল্লাহর কথা এবং আল্লাহর রাসূলের কথা; অতএব ইসলামেরও কথা।

অনেকের ধারণা, নানা জটিল বিষয় নিয়ে ইসলাম ধর্ম-হিসাবে অনেকটাই দুরূহ। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। বস্তুত ইসলামকে না-বুঝবার আদৌ কোন হেতু নেই, ইসলামকে দুরূহ বলারও কোন যুক্তি নেই। কারণ ইসলামের দাবীও বেশি কিছু নয়, বক্তব্যও কিছুমাত্র কঠিন নয়। ইসলামের প্রাথমিক দাবী হলো - আল্লাহ এবং রাসূল (সাঃ)এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, এবং আল্লাহর কাছে নিশ্চিত প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নে অকুণ্ঠ সংশয়হীনতা। এবং অন্তরে যদি এই দাবীকৃত বিশ্বাস দৃঢ়মূল থাকে, তাহলে শত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও নামাজ-পড়া রোজা-রাখাও কঠিন নয়, জিহাদের ময়দানে হাসিমুখে প্রাণ উৎসর্গ করাও কঠিন নয়। কঠিন তখনই যখন এই বিশ্বাস শিথিল অথবা অনুপস্থিত। এইজন্যই আল্লাহপাক প্রথমেই ঘোষণা করেছেন: আল কোরআন যে-নির্ভুল পথনির্দেশনা দান করে, তা-থেকে অদৃশ্যে বিশ্বাসীরাই কেবল উপকৃত হবার যোগ্য। এবং আল্লাহপাক এই কথাও বলেন যে-তোমরা সালাত এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন করো, যদিও কাজটা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কঠিন তাদের কাছে নয়, যারা বিশ্বাস করে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হতে হবে, অবশ্যই ফিরে যেতে হবে তাঁর কাছে (সূরা বাকারা)। অর্থাৎ ইসলামের দাবীর কাছে পূর্ণ-আত্মসমর্পণকে যারা কঠিন বিবেচনা করে, প্রকৃতপক্ষে তাদের বিশ্বাসই অত্যন্ত দুর্বল ও ভঙ্গুর। আর ইসলাম-যে আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটির মত আদৌ জটিল কিছু বলে না, ইসলামের সব কথাই-যে একেবারে জলের মত সহজ, তার একটি বড় প্রমাণ হলো, রাসূল (সাঃ)এর সময়ে আরবে বিদ্বান-বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা আদৌ বেশি ছিল না। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, মরুচারী বেদুইন ও নিরক্ষর ক্রীতদাস থেকে সমাজের শীর্ষবাসী নেতা পর্যন্ত সবাই ইসলামকে অক্লেশে অনুধাবন করতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয়েছে। আদৌ কারো কোন অসুবিধা হয় নি। সত্য যে, অনেকের ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব হয়েছে, অনেকে আমৃত্যু ইসলামের দুশমনই থেকে গেছে; কিন্তু তার কারণ এই নয় যে, তারা ইসলামকে বুঝতে অক্ষম ছিল। প্রকৃত কারণ হলো, সংস্কারবশত হোক বা অন্ধ অহমিকাবশত হোক, তারা রাসুল (সাঃ)কে মেনে নিতে পারে নি। আজও দেখি, ইসলামের বিপরীত মেরুতে দণ্ডায়মান যারা ইসলামের দুশমন, তাদের দুশমনির কারণ এই নয় যে, তারা ইসলামকে বোঝে না। বোঝে, এবং ভালো করেই বোঝে। কিন্তু ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও কার্যকারিতাকে অভ্রান্ত জেনেও এক ধরনের মূঢ়-অসূয়াবশত, সেই নির্ভুল শ্রেষ্ঠত্বকে তারা মেনে নিতে কষ্ট পায়; তাদের মিথ্যা শ্লাঘা ও অহমিকা সত্যকে সত্য বলতে বাধা দান করে। এইজন্যই ইসলাম চিরদিনই সমাজের দরিদ্র নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মানুষের কাছে প্রথম অভিনন্দিত হয়েছে। কারণ সত্যাসত্য গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্নে মানুষ যে-সকল কারণে সঠিক ভূমিকা-রক্ষায় ভীতি ও দুর্বলতার শিকার হয়, অসমর্থ হয় আত্মজয়ে, দরিদ্রজনেরা সেদিক থেকে খুবই ভাগ্যবান। তাদের বিশেষ পিছুটান থাকে না; কায়েমী কোন স্বার্থের কারণে সর্বশক্তি দিয়ে মিথ্যাকে আঁকড়ে থাকার কোন প্রয়োজনও তাদের পড়ে না। তাদের যেহেতু হারাবার কোন ভয় নেই, তারা সত্যকে চিনতেও পারে, সহজে গ্রহণও করতে পারে; সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মত সভাসদদের মুখ চেয়ে সত্যকে চিনেও না-চেনার অভিনয় করার মত দুর্ভাগ্য থেকে এই দরিদ্রজনেরা একেবারেই নিরাপদ। আসলে ইসলাম কঠিনও নয়, দুর্বোধ্যও নয়। সকল কাঠিন্য ও দুর্বোধ্যতার মূল কারণ হলো, মানুষের লালিত আত্মম্ভরিতা, পার্থিব লিপ্সা, কায়েমী স্বার্থ ও বদ্ধমূল সংস্কার। জীবনের এইসব তুচ্ছ ও ক্ষতিকর উপকরণগুলি ভেঙ্গেচুরে সত্যের আকর্ষণে যে-মানুষ খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে, তারই খোশ নসীব।

অনেকে এই প্রশ্ন তোলেন যে, ইসলাম ছাড়া কি পৃথিবী চলে না? চলে, কিন্তু চলাটাই একমাত্র কথা নয়। অসুস্থ মানুষও বেঁচে থাকে, বদ্ধ উন্মাদও থাকে; ধর্ষক দস্যুতস্কর মদ্যপ খুনী লম্পট তারাও বেঁচে থাকে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, থাকে সমাজে সংসারে এমনকি নিজের কাছেও এক দুর্বহ গ্লানি ও অভিশাপের প্রতিমূর্তি হয়ে। তার দীর্ঘজীবন দীর্ঘ পরিতাপ ও অভিশাপেরই নামান্তর। ইসলাম থেকে বঞ্চিত যে-পৃথিবী, সেই পৃথিবীও টিকে থাকে ঠিক এইরকমই দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত কি উন্মাদ কি নেশাগ্রস্ত বা নৈতিকভাবে দেউলিয়া-মানুষের মত; টিকে থাকে শয়তানের পৃথিবী হয়ে। ইসলামের কথা, এই ধরনের পৃথিবী মানুষের পৃথিবী নয়। ইবলিসের ক্রীতদাসরূপী এই পৃথিবীকে সুস্থ বাসযোগ্য ও নৈতিক মানে উন্নত একটি ভালোবাসার পৃথিবীতে রূপান্তরিত করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। অবশ্য সন্দেহ নেই, একটি সুষম কল্যাণময় পৃথিবীর জন্য যে-তৃষ্ণা ও স্বপ্ন, তা সকল কালের সকল মানুষেরই হৃদয়ের কথা। কিন্তু সমস্যা হলো, অধিকাংশ মানুষ জানে-না যে, দ্বিতীয় কোন পথ নেই, ইসলামই একমাত্র পথ, যে-পথে

www.pathagar.com

মানুষের কাঙ্ক্ষিত প্রতীক্ষিত একটি সুস্থ বাসযোগ্য পৃথিবী নির্মাণ করা সম্ভব। আর ইসলামের প্রতি নি:শর্তভাবে এই বিশ্বাস স্থাপন করার নামই মুসলমানিত্ব। ইসলামই-যে সুস্থ পৃথিবী নির্মাণের একমাত্র উপায়, এই বিশ্বাস যার মধ্যে নেই, তার মধ্যে মুসলমানিত্বও নেই। আর এতে বিশ্বাস স্থাপন না-করার তো কোন হেতু নেই। ইসলাম-তো কোন মানুষের আবিষ্কার নয়; এই অব্যর্থ পথ ও পথনির্দেশ দান করেছেন আল্লাহপাক নিজে। এবং আল্লাহপাকের নিকট থেকে আগত হেদায়েতের এই রূপরেখা মানুষের সামনে নির্ভুলভাবে পেশ করেছেন সর্বোত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী, নিখিল বিশ্বের পরম আশীর্বাদ, আল্লাহর প্রিয়তম হাবীব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। অতএব আল্লাহপাকের অশেষ অনুগ্রহস্বরূপ প্রেরিত নূর ও নেয়ামতে পরিপূর্ণ এই দ্বীন ও হেদায়েত-যে নিরঙ্কুশভাবে অব্যর্থ ও ত্রুটিমুক্ত, এতে চিন্তা-ভাবনার কী আছে? এখন মানুষের ইচ্ছা, সে যদি ইসলামকে গ্রহণ করতে চায় করতে পারে; আর যদি ইবলিসকে সখা ও প্রভু মেনে নিয়ে ইসলাম থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকাই উচিত জ্ঞান করে, তাতেও কোন বাধা নেই। পৃথিবী যেহেতু একটি পরীক্ষাক্ষেত্র, সব মানুষেরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা প্রাপ্য। জন্ম থেকে আমৃত্যু ব্যবহৃত এই সময় ও স্বাধীনতার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে পারলৌকিক অনন্তদিনের লাভ-ক্ষতি। বলা অনেকটা অনাবশ্যক, তবু উল্লেখ করি, ইসলামে কাফির অংশীবাদী মুশরিক ও মুনাফিকদের কোন জায়গা নেই। মুসলিম জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করার পরও যারা এই 'মহৎ গুণে' গুণান্বিত, তাদেরও নেই। অবশ্য পরিপূর্ণ হিসাবনিকাশ এখানে নয়, তারা তাদের যথোচিত ফলাফল দেখতে পাবে আখেরাতে; যেদিন তারা আর্তনাদ করে বলে উঠবে, 'হায় আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম' (সূরা নাবা)।

আল্লাহপাক বলেছেন, ইসলাম হলো মানুষের স্বভাবধর্ম। এই কথাটির তাৎপর্য আমরা দুই ভাবে ও দুই দিক থেকে অনুধাবন করতে পারি। এক. ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা অভিনব কোন আকস্মিকভাবে আরোপিত জীবনব্যবস্থা নয়। ইসলাম মানুষের স্বভাবের মধ্যেই বিরাজমান, মানুষের স্বভাবগত প্রেরণা ও প্রবণতার সঙ্গেই পুরোপুরি সংলগ্ন। অর্থাৎ মানুষের নিজস্ব স্বভাব ও প্রকৃতিসম্মত যে-আশা ও অভিপ্রায় ও চাহিদা, বিবেক ও হৃদয় ও মস্তিষ্কের যে-আর্তি ও আকুতি, তার সঙ্গে ইসলামের কোন বিরোধ নেই। এইজন্যই ইসলাম মানুষকে তার কর্মে ও চিন্তায় ইবলিসের অনুগামী হতে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেয় সত্য, কিন্তু সেই প্রতিরোধব্যূহ রচনা করা হয় ফেরেশতা বানাবার জন্য নয়, মানুষকে তার অন্তর্গত শক্তি ও প্রবণতার সম্যক বিকাশ সাধনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ অর্থাৎ ইনসান-ই-কামিল হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে। এবং এইজন্যই সমগ্র মানববংশের সম্মুখে যিনি একমাত্র অনুসরণযোগ্য নমুনা (Model), সেই হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ছিলেন সর্বোত্তম স্বভাব ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত একজন

www.pathagar.com

মানুষ। দ্বিতীয়ত, ইসলাম সর্বকালের সকল মানুষের পথ চলার জন্য একটি নির্ভুল পথরেখা, যা আল্লাহপ্রদত্ত প্রাকৃতিক বিধানের মতই শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়। কেউ অন্ধকার গুহাজগতের বাসিন্দা হয়ে সূর্যের আলো থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে পারে, কিন্তু সদা-দীপ্যমান সূর্যের এতে কিছু আসে-যায় না। সূর্য আগেও যেমন ছিল, এখনো তাই; সূর্য চিরদিনই সূর্য। নদী আকাশ ও অরণ্য, বায়ু মাটি মেঘ ও মহাসাগর এ-সব যেমন একইভাবে একই নিয়মে আবহমান কাল থেকে সকল মানুষের কাছে আল্লাহর অনুগ্রহ পৌঁছে দিচ্ছে, কারো কোন কাজে সংশোধনী আনার প্রয়োজন নেই, মানুষের সেই সাধ্যও নেই; ইসলাম ঠিক এদেরই মত আল্লাহপাকের খাস-রহমতের আধার একটি শাশ্বত নেয়ামত। এইজন্যই জার্মান মহাকবি গ্যেটে বলেছিলেন, 'ইসলাম যাকে বলে, আমরা সবাই সেই ইসলামের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েই বেঁচে আছি'। এবং কার্লাইলও গ্যেটের এই বিশ্বাস ও বক্তব্যের সূত্র ধরে বলেছেন, 'অবশ্যই; কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের জীবন ইসলামের মধ্যেই নিমজ্জিত, ইসলামের মধ্যেই পরিক্রমারত। এবং এই মানবঅধ্যুষিত ধরাপৃষ্ঠে স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ ও প্রকাশিত যে-জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, এখনো পর্যন্ত ইসলামই তার সর্বোচ্চ শীর্ষদেশ'।

মাসিক পৃথিবী : মার্চ, এপ্রিল ও মে, ২০০০

www.pathagar.com

ইসলাম ও আত্মঘাতী মুসলমান

এক

১৯৩০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে আল্লামা ইকবাল তাঁর সভাপতির অভিভাষণে একটি অত্যন্ত জরুরি কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, মুসলমান ইসলামকে রক্ষা করে-নি, বিপদে-সংকটে ইসলামই মুসলমানকে রক্ষা করেছে। কথাটা শত-শতাংশ নির্ভুল ও যথাযথ। এবং এটা শুধু একটা মন্তব্যমাত্র নয়, বিগত প্রায় দেড় হাজার বছরের অকাট্য দালীলিক প্রমাণসমূহও এই কথাই বলে। একেবারে প্রথম কালের কথাই স্মরণ করি, ইসলামের সংস্পর্শে না-এলে মরুচারী আরব্য বেদুইনদের কে চিনতো? কেউ চিনতো না। এইজন্যই আমীরুল মুমিনীন হজরত উমার ফারুক (রাঃ) যখন একেবারেই দীনবেশে জেরুজালেমের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য ক্রীতদাসকে উটে চড়িয়ে নিজে রশি হাতে উপস্থিত হলেন, অনেক মুসলমান সেদিন এই দৃশ্য অবলোকন করে দারুণভাবে বিচলিত, হতচকিত। দূরে অপেক্ষমান খ্রীস্টানদের চোখে খলীফার এই ছিন্নমলিন বেশ কী-যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, এই ভেবে মুসলমানরা খুবই উৎকণ্ঠিত। এবং এই উৎকণ্ঠার কথা ভয়ে ভয়ে তারা খলীফার কাছে প্রকাশও করে ফেললেন। মুসলমানদের এই প্রতিক্রিয়ায় অনেকটা ভর্ৎসনার সুরে খলীফা বললেন, কোন রাজসিক পোষাক ও বৈভব ও অপরাজেয় পরাক্রম মুসলমানকে সম্মান দান করে-নি; এই সম্মান আমরা পেয়েছি রাসুল (সাঃ)এর শিক্ষানুযায়ী ইসলামের প্রতি আনুগত্যের কারণে, আল্লাহর প্রতি অটুট ঈমান ও আস্থার কারণে। খুবই সত্য কথা। কিন্তু সীমাহীন দুঃখের কথা, দিন যত অতিবাহিত হয়েছে, মুসলমান তার শক্তি ও শৌর্যের এই মূল প্রাণকেন্দ্র থেকে তত বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ-রকম যদি না-ঘটতো, কোন সন্দেহ নেই, মুসলমান রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত নেতৃত্বের আসনেই সমাসীন থাকতো; কাফের মুশরিকদের সাহসই হতো না, মুসলমানের চোখের দিকে চোখ তুলে তাকায়। কিন্তু মুসলমানের বড় বদনসীব, এমন অব্যর্থ ও শাশ্বত শক্তিকে মূল্য না-দিয়ে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)এর পথনির্দেশকে অবহেলা করে, সে এখন পশ্চিমা বিধর্মী-প্রভুদের অনুগ্রহপ্রার্থী, করুণ ক্রীড়নক। এমন করুণ আত্মবিস্মৃতি, এমন উন্মাদোচিত আত্মঘাতের দৃষ্টান্ত অন্য কোন জাতির ইতিহাসে নেই।

ইতিহাসের নানা পর্যায়ে মুসলমান বহু অকথ্য জিল্লতীর শিকার হয়েছে; এবং এখনো বহু জমীন ও জনপদে মুসলমান নিগ্রহ লাঞ্ছনা, অপমান বেইজ্জতি ও দুর্বহ গ্লানির দ্বারা এমনভাবে আক্রান্ত, যা বর্ণনাতীত ও অভাবনীয়। ভাবাই যায় না, যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর তৌহিদী-সৈনিক, যারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাহমাতুল্লিল-আলামীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)এর প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী, আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের

www.pathagar.com

পতাকাবাহী হিসাবে যাদের পরিচয়, তারাই আজ সর্বাধিক বেইজ্জতির শিকার, তাদেরই ললাটে আজ নিদারুণ পরাভবের কলঙ্কচিহ্ন। দুর্ভাগ্যই বটে! কিন্তু এই দুর্ভাগ্য অহেতুক নয়। কেউ কেউ অবশ্য, শত্রুর বিক্রম ও সংঘবদ্ধ আক্রমণকে এই দুর্ভাগ্যের কারণ হিসাবে বর্ণনা করতে পারেন; বিশেষ করে সমগ্র মুসলিম-উম্মাহর বিরুদ্ধে আধুনিক-অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত একতাবদ্ধ যে-প্রবল প্রতিপক্ষ, তার মোকাবিলায় মুসলমান আজ-যে খুবই অসহায়, এই দৃশ্যপট বাহ্যত মুসলমানের সকল জিল্লতির যে-একটি সর্বজনগ্রাহ্য হেতু, এটা অস্বীকার করাও কঠিন। কিন্তু না, এটা আদৌ সত্য নয়; বরং এই যুক্তিটি হলো, আত্মপরিচয়-বিস্মৃত দাস্যমনোভাবাপন্ন মুসলমানের এক আত্মঘাতী কুযুক্তি।

মুসলমান আজ যে-কঠিন সংকটের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত; শক্তি ও সম্ভ্রম ও পৌরুষবর্জিত যে-এক মনুষ্যরূপী মেষ বা মার্জারে পরিণত, তার একমাত্র কারণ, ইসলামের-যে মূল দাবী ও শর্ত, তা-থেকে পুরোপুরি পশ্চাদপসরণ। তার মধ্যে প্রকৃত অর্থে আজ না কোরআন আছে, না হাদীস ও সুন্নাহর কোন শিক্ষা আছে। বরং যা-আছে তার সারাংশ হলো, কোরআন-হাদীসের মূল মর্মবাণীকে কতটা চাতুর্যের সঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া যায়, তারই প্রচেষ্টা। এবং উল্লেখ করা আবশ্যক, এই প্রচেষ্টা একমাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক। এবং এটাও যুগপৎ বিস্ময় ও পরিতাপের কথা, যে-কোরআন ও সুন্নাহ সমগ্র মানববংশের জন্য পার্থিব ও পারলৌকিক সাফল্যের অব্যর্থ চাবিকাঠি, তার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার লাভ করা সত্ত্বেও, সেই দুটি বস্তুই আজ মুসলমানের কাছে একেবারে অর্থহীন এক তামাশার উপকরণে পরিণত। এ-বিষয়ে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন, কেউ কেউ হয়ত কষ্টও পাবেন, কিন্তু এটাই বাস্তব।

মুসলমান বস্তুত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি শ্রেণী আছে যারা নামেই মুসলমান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেঈমান। তারা না আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, না রাসুল (সাঃ)এর প্রতি। তারা কোরআন বিশ্বাস করে না, হাদীস বিশ্বাস করে না, আখেরাত জান্নাত জাহান্নাম কিছুই বিশ্বাস করে না। তারা-যে মুসলমান, এটা বুঝা যায় তাদের জীবদ্দশায় একবার এবং মৃত্যুর পরে একবার। জীবদ্দশায় বিবাহ অনুষ্ঠানে তারা এখনো পুরোহিত কি পাদ্‌রিকে ডাকবার মত সাহসী হয়ে উঠতে পারে নি; এই সময়ে তারা কোন-না-কোন মৌলভি-মওলানার কাছেই আত্মসমর্পণ করে। আর একবার তারা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাদের প্রাণহীন দেহটিকে জানাযা ও দাফন-কাফনের মধ্য দিয়ে মুসলমান হতে বাধ্য করে। অনেক রকম পূর্বঘোষণার কথা শুনা যায়, কিন্তু তারা কেউ এই অসিয়ত করে যায় না যে, তাদের মৃতদেহ যেন কবরস্থ না-করে শ্মশানে মুখাগ্নি করে জ্বালিয়ে দেয়া হয়, অথবা অগ্নি-উপাসকদের মত বাড়ির ছাদ বা কোন উচ্চস্থানে মৃতদেহটি রাখা হয়, যাতে চিল-শকুনেরা যথাযথ সৎকার করতে পারে। বর্তমান নিবন্ধে এই ধরনের মুসলমান নিয়ে

www.pathagar.com

কোন কথা নেই, থাকার কথাও নয়। কারণ বিবাহ এবং জানাযার সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই এদের মুসলমানিত্বের অভিজ্ঞান সীমাবদ্ধ। পুরো জীবনটাই এদের সাবা-উবাইয়ের মুনাফিকী জীবন; আমৃত্যু আবু জেহেলের চেয়েও অধিক মূর্খতার অন্ধকারে এদের বসবাস। এদের কথাবার্তা শুনলেই পরিষ্কার বুঝা যায়, আল্লাহপাক নিতান্ত সখ করে জাহান্নাম সৃষ্টি করেন-নি, অত্যন্ত জরুরি বলেই করেছেন। এদের গন্তব্য হিসাবে জাহান্নাম এতই অবধারিত যে, কোরআনপাকে এদের জন্য দোয়া করাও নিষেধ বলে এরশাদ হয়েছে (সুরা তওবা)। বর্তমান নিবন্ধকার বুঝতেই পারে না, আলেম-উলামারা কী কারণে এদের জানাযার নামাজ পড়ান। জানাযার নামাজ-তো আসলে দোয়ারই নামাজ। আল্লাহর নিষেধ অগ্রাহ্য করে, ইসলামের কোন স্বঘোষিত প্রকাশ্য দুশমনের জানাযায় শরীক হওয়া নিশ্চয়ই অত্যন্ত অসমীচীন। দ্বিতীয় আর এক ধরনের যে-মুসলমান, তারা নানারকম স্বভাবদোষ ও নানারকম বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হলেও তারা কেউ ইসলামের শত্রু নয়; তাদের মুসলমানিত্ব নিয়েও গুরুতর কোন সন্দেহ নেই। অনেক ভুল ত্রুটি অপরাধ, অনেক ধরনের শিরক বিদআত গোমরাহি নাফরমানি ইত্যাদির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা আছে, কিন্তু আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন সন্দেহ কি অনাস্থা নেই; তাদের মধ্যে কোন ইসলাম-বিরোধী বিক্রিয়াও সৃষ্টি হয় না। তারা কেউ এমন নয় যে, রবীন্দ্রনাথ কি লালন ফকিরকে আল্লাহর সমতুল্য ভাবতে চান অথবা রাসুল (সাঃ)কে সেন্টপল বা গান্ধী বিবেকানন্দের মতই একজন মোটামুটি মনীষীরূপে স্বীকার করেন মাত্র। এবং এমনও নয় যে, কোরআন-হাদীসের অকাট্যতা সম্পর্কে তাদের কোন সংশয় আছে। উল্লেখ করি, এই ধরনের মুসলমান নিয়েই বর্তমান আলোচনা। মুসলমান হয়েও, যে-কোন কারণেই হোক, আমাদের অনেকেরই মুসলমানিত্ব-যে খুবই হাল্‌কা ধরনের একটি লেবাস মাত্র, ইসলামের প্রকৃত দাবীর মুখে আমাদের ভূমিকা-যে খুবই গৌণ, এবং কখনো কখনো ঈমান ও আকীদাবিরোধীও বটে, এইসব কথাই বর্তমান নিবন্ধের উপজীব্য।

সমূহ দুঃখের কথা, আমরা ভুলে যাই এবং ভুলে থাকতেই ভালোবাসি যে, ইসলাম একটি পথনির্দেশ। এবং এই পথনির্দেশ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া কী, কী তার প্রকৃত রূপ, মোহাম্মদ (সাঃ) যে তারই নির্ভুল ও শাশ্বত নমুনা - এই কথাটিও আমরা স্মরণে রাখি না। অথচ রাসুল (সাঃ)এর জীবনাদর্শকে সম্যক গুরুত্ব না-দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিও লভ্য নয়, ইসলামের নিকটবর্তী হওয়াও সম্ভব নয়। আমাদের বড় দুর্ভাগ্য, আমরা আজ এই ব্যাধিতে এমনভাবে আক্রান্ত যে, রাসুল (সাঃ)এর প্রায় সব নির্দেশই আমাদের কাছে অত্যন্ত লঘু ও তাৎপর্যহীন। এবং শেষপর্যন্ত, আমাদের বিবেচনাবোধ এমন এক হাস্যকর পর্যায়ে উপনীত যে, মোহাম্মদ (সাঃ)কে আমরা একজন আরবীয় অহিংস 'গৌতম বুদ্ধে' পরিণত করে ফেলেছি (নাউজুবিল্লাহ)। তিনি-যে সত্য ও ন্যায়-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এক সার্বক্ষণিক অকুতোভয় সিপাহসালার, তিনি-যে জিহাদের নবী, জীবনের প্রতিটি পথে ও

www.pathagar.com

পদক্ষেপে তিনি-যে এক নির্ভুল সতর্ককারী, সকল প্রয়োজনে তিনিই-যে আলোকবর্তিকা, তাঁর আদর্শই একমাত্র আদর্শ - এই সহজ কথাগুলি বিস্মৃত হয়ে আমরা আমাদের রাসুল (সাঃ)কে নিষ্ক্রিয় ধরনের ইবাদত-বন্দেগীর একজন মুর্শিদরূপে তৈরী করে নিয়েছি। এইজন্যই এইরকম মুত্তাকী নিষ্ঠাবান মুসলমানের সংখ্যা অসংখ্য, যাঁরা মেসওয়াক বা সুন্নাতি-লেবাস ইত্যাদি বিষয়ে খুবই সতর্ক, কিন্তু ইসলামের তরক্কী ও মর্যাদার প্রশ্নে যে-কোনরূপ সংগ্রাম ও কোরবানীর কথা উঠলে তাঁরা ভীত হয়ে পড়েন, তাঁদের মুখমণ্ডল একেবারে রক্তশূন্য হয়ে ওঠে। এবং শেষপর্যন্ত তাঁরা এই মনোরম সিদ্ধান্তে অটল ও অবিচল থাকাই ইসলামের 'প্রকৃত খেদমত' হিসাবে গ্রহণ করেন যে, তলোয়ার নয়, উদারতাই হলো ইসলামের আসল প্রাণবস্তু; এবং কোন-রকমের কোন কোরবানী নয়, রক্ত সম্পদের নজরানা নয়, ইসলামের জন্য তসবিহপাঠ ও দোয়া-মোনাজাতে লিপ্ত থাকাই আমাদের প্রকৃত কর্তব্য। কর্তব্যই বটে! বস্তুত, এই ধরনের কর্তব্যপরায়ণ দোয়া-দরুদনির্ভর নিষ্ক্রিয় মুসলমানের সংখ্যা যত বাড়বে, মুসলিম-মিল্লাতের দুর্ভোগও তত বাড়বে। আমাদের এই ধরনের নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত তাকওয়ার মূল্যমান আখেরাতে কীভাবে নির্ধারিত হবে আল্লাহপাক জানেন, তবে ইহকালীন জীবনে-যে কাফের-মুশরিকদের করুণাপ্রার্থী হয়ে বলির পাঁঠার মত চিরদিন কাঁপতে কাঁপতে দিন গুজরান করতে হবে, এ-নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আসলে মুসলিম মিল্লাতকে যদি মাথা-উঁচু করে দাঁড়াতে হয়, পুনরুদ্ধার করতে হয় হৃতগৌরব, কোরবানীর কোন বিকল্প সন্ধান করা বৃথা। আর ইসলামেরও শিক্ষা অকাট্যভাবে এটাই। মক্কায় মুষ্টিমেয় মুসলমান যখন অকথ্য নিগ্রহ-নির্যাতনের শিকার, অতিষ্ঠ হয়ে একদা রাসুল (সাঃ)কে তাঁরা বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন'। তিনি বললেন, 'এর আগে এমন অনেক নবী এসেছেন যাঁদের আপাদমস্তক করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, যাঁদের বহু উম্মতের প্রাণ সংহার করা হয়েছে পৈশাচিকভাবে লোহার চিরুনি দিয়ে শরীর থেকে মাংস বিচ্ছিন্ন করে করে'। অথচ তৌহিদের মুবাল্লিগরা আজ কোন কোরবানীর জন্যই কিছুমাত্র রাজী নয়। এবং অবস্থা এমন যে, কোরবানীর কোন তাৎপর্য তারা অনুধাবনই করে না। তাদের বিশ্বাস, জ্বিলহজ্ব মাসের দশম দিবসে ক্রয়কৃত একটি বলদ কি বকরি জবেহ করলেই কোরবানীর চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখানো হলো। মূলত এটা হলো কোরবানীর একটি প্রতীকী রূপ। প্রকৃত কোরবানী হলো, আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন ও সম্পদ হাসিমুখে উৎসর্গ করা। রাসুল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের জীবনদৃষ্টে বুঝা যায়, আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গের এই তীব্র তামান্না যাঁকে অধীর করে রাখে, তিনিই মুমেন, তিনিই মুসলমান। মেসওয়াক ব্যবহার কি অতিরিক্ত তসবিহ-তাহলিল ও দোয়া মোনাজাত হলো সুন্নাত অথবা নফল; কিন্তু দ্বীনের সুরক্ষার প্রশ্নে জিহাদের ময়দানে অবিচল দাঁড়িয়ে থাকা ফরজ। শুকরের মাংস ভক্ষন কি মদ্যপান হারাম বটে, কিন্তু জিহাদের ময়দান থেকে

www.pathagar.com

পালিয়ে আসা আরো গুরুতরভাবে হারাম। মুসলমান আজ এমন এক আত্মঘাতী অপরিণামদর্শী অবোধ বালকে পরিণত যে, তাকে এই কথা বুঝানো খুব কষ্টকর যে, নিদ্রাহীন বন্দেগীর নাম ইসলাম নয়, ইসলাম কোন মারেফাতী-গুপ্তবিদ্যার নাম নয়, ইসলাম হলো পুরো জীবন ও পুরো-পৃথিবীর জন্য একটি সার্বক্ষণিক সংবিধান। কথাটা এমনকি মুশরিকরাও বোঝে, কিন্তু কী-বদনসীব, মুসলমান বোঝে না। শুধু বোঝে-না নয়, অন্য কেউ না-বুঝুক, এটাই আজ বহু মুসলমানের ঐকান্তিক অভিপ্রায়। আল্লাহপাক মুসলিম-উম্মাহকে এই গাফলত ও গোমরাহি ও আত্মহনন থেকে হেফাজত করুন।

দুই

একবার একটি নাতিবৃহৎ ধর্মীয় মাহফিলে শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকবার সুযোগ হয়েছিল। প্রধান-অপ্রধান সকল আলোচকই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই বক্তব্য উপস্থাপন করলেন যে, মুসলমান আজ বাতেনী ইলম থেকে দূরে সরে পড়ার কারণেই নিজেকেও চিনতে পারছে না, ইসলামকেও চিনতে পারছে না। ফলত, এই বাতেনী ইল্‌মের অভাবহেতুই বিশ্বব্যাপী সমগ্র মুসলিম উম্মাহ আজ নানা সমস্যা ও দুর্দশার শিকার। প্রধান বক্তা গভীর আস্থার সঙ্গে বললেন, 'বাতেনী ইল্‌ম ছাড়া জ্ঞানের পরিপূর্ণতা আসে না; ইলমে মারিফাত হাসিল না-হলে সেই মানুষটির অন্তর্জগৎ অন্ধকারই থেকে যায়।' এবং এ-নিয়ে কোনরূপ দ্বিধা কি দ্বিমতের-যে অবকাশ নেই, বাতেনী-ইল্‌মের শক্তি ও রহস্য ও অপরিহার্যতা-যে অবশ্যই স্বীকার্য, সেই কথাটিও তিনি, হজরত মুসা (আঃ) ও খিজির (আঃ)এর ঘটনা এবং মদীনার মসজিদে খোত্‌বাপ্রদানরত অবস্থায় দুইশত মাইল দূরবর্তী কোন এক যুদ্ধের নির্দেশনা দেবার ঘটনার সবিস্তার উল্লেখসহ বুঝিয়ে দিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সেদিন সকলের কথাই শুনেছি ও অনুধাবনের চেষ্টা করেছি।

আমার ধর্মীয় জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তবু অনেক দিক চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম, আলোচকদের তথ্যসমূহ যদিও নির্ভুল, কিন্তু ব্যাখ্যা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহপাক বলেন, 'আল্লামাল ইনসানা মাআলাম ইয়ালাম' মানুষকে তিনি জ্ঞান দান করেছেন, যা সে জানতো না (সুরা আলাক)। অর্থাৎ মানুষ কেবল সেইটুকুই জানে, আল্লাহপাক স্বীয় অনুগ্রহে যেটুকু দান করেছেন। অতএব আল্লাহপাক-প্রদত্ত জ্ঞানের বাইরে যে-এক অপার অনন্ত জ্ঞানের মহাসমুদ্র বিরাজমান, এ-নিয়ে তর্ক-সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কাজেই হজরত খিজির (আঃ) কি উমার ফারুক (রাঃ) বা আরো অন্য কারো মধ্যে কী গোপন ইল্‌ম ছিল না-ছিল, তা-নিয়ে পেরেশানির কিছু নেই। আর এটাই-তো আসল কথা যে, খিজির (আঃ)এর তুলনায় মুসা (আঃ)এর জ্ঞান কম ছিল কি বেশি ছিল, সেটা পরিমাপ কি পর্যালোচনা করার চেয়ে এটা মনে রাখা জরুরি ও যুক্তিযুক্ত যে, মুসা (আঃ) ছিলেন একজন নবী। তাঁর কাজ ছিল তাঁর কওমের কাছে আল্লাহর

www.pathagar.com

পয়গাম পৌঁছে দেয়া; তাঁর কাজ ছিল তাঁর সময়ে ও সমাজে আল্লাহর নির্ধারিত বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই কাজ ফেলে তিনি যদি খিজির (আঃ)এর পেছনে পেছনে গোপন ইল্‌ম অর্জনের নেশায় ঘুরে বেড়াতেন, সেটা কি সঠিক হতো? নিশ্চয়ই হতো না। কারণ, সেটা আল্লাহপাকের আদেশ ও অভিপ্রায়ের অনুকূল নয়। কারণ খিজির (আঃ)কে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে, সেটা হতো তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের যে-গুরুভার, তা-থেকে বিমুখ হয়ে থাকা। মুসলমানেরও আজ এই কথাটি মনে রাখা সর্বাধিক জরুরি যে, তার কাজ গোপন বিদ্যার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকা নয়, তার প্রকৃত কাজ হলো ইবলিসের মোকাবিলায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া, পৃথিবীতে আল্লাহর অখণ্ড প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করা। তার কাজ হলো রাসুল (সাঃ)এর আনীত ইসলামের বৈপ্লবিক পয়গামকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া। আর এই কাজের জন্য যে-জ্ঞান ও শক্তির প্রয়োজন, তা আলকোরআন এবং রাসুল (সাঃ)এর জীবনাদর্শের মধ্যেই অক্ষতভাবে বর্তমান। অতএব আরো অতিরিক্ত জ্ঞানের জন্য যাঁরা হকিকত-তরীকত ও মুরাকেবা-মুশাহিদা নিয়ে অধিক ব্যস্ত, সন্দেহ হয়, তাঁরা সম্ভবত মূল কর্তব্যকর্ম থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্য কোন নিরাপদ অবস্থানে তাঁবু খাটিয়েছেন।

যাই হোক, সারা পৃথিবী যখন ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ-ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মত ছুটে আসছে, তখন মুসলমানের মধ্যে এই ধরনের মারেফাতি জীবনবোধ শুধু আত্মঘাতী নয়, একটি গর্হিত অপরাধও বটে। হজরত উমার ফারুক (রাঃ)এর কথাটি স্মরণ করি, তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে অনেক দূরের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত সেনাপতি সারিয়া (রাঃ)কে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন, এই ঘটনা সত্য। এবং এই রকমের অনেক কারামত উমার (রাঃ)তো বটেই, অন্য বহু সাহাবী ও তৎপরবর্তী বহু অলি-আউলিয়ার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এর কোনটাই কারো অর্জিত স্থায়ী জ্ঞান নয়; তাঁদের নিজস্ব ইচ্ছাধীনও নয়। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহপাকের ইচ্ছা ও অনুগ্রহ। অতএব এটাকে কোন পীরের পদসেবা ও সবকের মধ্যে হাসিল করার মত একটি অদৃশ্য বিদ্যারূপে পরিগণিত করা বোধ হয় সঠিক ইসলামী-আকীদা নয়। এবং বোধহয় একটু জোর দিয়েই বলা যায়, এই ধরনের মারেফাতি ইল্‌ম বা অদৃশ্য-বিদ্যার কুহক নিয়ে সময় ও শ্রমক্ষয় ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ-তো নয়ই, বরং অনেকটাই পরিপন্থি। কারণ রাসুল (সাঃ) নিজে বলেছেন যে, তাঁর কাছে কোন গায়েবের খবর নেই; তিনি কেবল সেইটুকু জানেন, যেটুকু আল্লাহপাক তাঁকে অবহিত করেন। যদি এইরকমই না-হতো, তাহলে বীরে মাউনা বা রাজীর ঘটনার মত কাফেরদের প্রতারণাপূর্ণ নৃশংস কাণ্ডগুলি ঘটতে পারতো না। এবং রাসুল (সাঃ) যদি অদৃশ্যের খবরই রাখতেন, তাহলে উম্মুল মুমেনীন জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) সম্পর্কে মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদকে তিনি সহজেই সনাক্ত করতে সক্ষম হতেন। তাঁকে আল্লাহপাকের তরফ থেকে আগত অহির জন্য প্রায় এক মাসের মত দীর্ঘ সময় ব্যাকুলচিত্তে প্রতীক্ষায়

www.pathagar.com

থাকতে হতো না। এবং তিনি-যে একবার লাবীদ নামক এক দুরাচার কর্তৃক যাদুগ্রস্ত হয়ে কিছুদিন কষ্টভোগ করেছিলেন, আল্লাহপাকের তরফ থেকে জ্ঞাত না-করা পর্যন্ত বিষয়টি তাঁর অজ্ঞাতই ছিল। এমনকি অতিপ্রসিদ্ধ চন্দ্রবিভক্তির ঘটনাটিও তাঁর নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নয়, একান্তই আল্লাহপাকের ইচ্ছা ও অনুগ্রহ। এবং সমগ্র জীবন ধরে তিনি বার বার এই কথাই ব্যক্ত করেছেন ও বুঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষের কোন ক্ষমতা নেই, সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। অলৌকিকতা বাতেনী-ইল্‌ম তাসাউফি-রহস্য - এইসব কুহকের মধ্যে না-গিয়ে মুসলমানের কাজ হলো আল্লাহর নির্ধারিত পথে ও প্রক্রিয়ায় নিরন্তর কাজ করে যাওয়া, পৃথিবীপৃষ্ঠে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিঃশেষে কোরবানী করবার তামান্নায় সর্বদা সংকল্পবদ্ধ থাকা, সবটুকু শৌর্য ও সাহস ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দৃঢ়পদে আল্লাহর দ্বীনকে সুরক্ষিত রাখা। এবং এটাই ইসলামের দাবী, এটাই মুসলমানের কাজ।

মূল কথা হলো, আল্লাহতায়ালাই একমাত্র আলিমুল গায়িব। আল্লাহপাক যেটুকু যাকে অবহিত করেন, কেবলমাত্র সেইটুকুই সে দেখতে পায়। অদৃশ্য রহস্যজগতে কারো কোন প্রবেশাধিকার নেই; অতএব সেই অদৃশ্য-বিদ্যা আয়ত্ব করবার কোন বিশেষ প্রক্রিয়াও নেই। এরপরও যদি কিছু বলতে হয়, সেটা হলো, কেউ যদি মনে-প্রাণে পুরোপুরি আল্লাহপাকের হয়ে যান, আল্লাহও তাঁর এই মুমেন বান্দাহ্‌র অত্যন্ত আপন ও নিকটবর্তী হয়ে যান; এই বান্দাহ্‌র সমগ্র অন্তর আল্লাহর নূরে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইসলামে মারেফাত বলে যদি সত্যই কিছু থাকে, সে এই মারেফাত। ভুল হলে আল্লাহপাক মার্জনা করুন, আমি এইরকমই বুঝি। আর এ-বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই যে, পৃথিবীপৃষ্ঠে ইসলামের যে-বৈপ্লবিক পয়গাম, সেই প্রেক্ষিতে একজন মুসলমানের, একজন মুমেনের শ্রেষ্ঠতম মারেফাত হলো কালেমা তওহিদ। এই তওহিদী চেতনা ও বিশ্বাসের উপর যিনি অটল ও অবিচলরূপে দণ্ডায়মান, তার কি দ্বিতীয় কোন মারেফাতের প্রয়োজন হয়? কথাটা আমার নয়, রাসুল (সাঃ)এর নিজের। হাদীস বোখারি শরীফে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, বিশিষ্ট সাহাবী হজরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ)কে রাসুল (সাঃ) একদা বলেছিলেন, 'যে-ব্যক্তি আন্তরিকভাবে কালিমা-ই-তওহিদ পাঠ করে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন'। সত্যই মুসলমানের বড় বদনসীব, সে আজ সত্যই বড় কঠিন এক আত্মঘাতী আততায়ীতে পরিণত! সত্যই কী-সমূহ সর্বনাশের কথা, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সাঃ)এর পথনির্দেশ এক রকম, আর সব কথা জানার পরেও মুসলমান বুঝলো আরেক রকম।

মুসলমানের অক্ষয় ও সার্বক্ষণিক সম্পদ হলো আল কোরআন এবং আল হাদীস। এই দু'টিই হলো মুসলমানের শাশ্বত উত্তরাধিকার, হেদায়েতের অনির্বাণ আলোকবর্তিকা। অথচ কত বড় দুর্মতি ও কী-দুর্ভাগ্য, মুসলমানের কাছে আজ কোনটারই কোন গুরুত্ব নেই। নামাজ পড়ার জন্য দু'একটি সুরা হয়ত মুখস্থ আছে, কিন্তু

www.pathagar.com

সাধারণ শিক্ষিত-সুশিক্ষিত অসংখ্য মুসলমান না-কখনো কোরআন শরীফ পাঠ করেছে, না হাদীস শরীফ। নসীব এত খারাপ যে, প্রাণের মধ্যে এ-নিয়ে কোন কৌতূহলও জাগে না। আমি অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, তাঁরা সসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন যে, সময়াভাব অথবা আলস্যবশত তাঁদের পক্ষে পড়া হয়ে ওঠে নি। আমি জানতে চেয়েছি, 'পৃথিবীর বহু গ্রন্থ গভীর অধ্যবসায়ে অধ্যয়ন করা হলো, বহু গ্রন্থ নিয়ে অতিবাহিত হলো বহু নিদ্রাহীন রাত্রি, কিন্তু কী-এমন বাধা, যে-কারণে কোরআন-হাদীসের প্রতি ন্যূনতম আকর্ষণও অনুভূত হলো না? এটা একটা বিরাট ধরনের স্বসৃষ্ট অভিশাপ নয় কি?' তাঁরা লজ্জা পেয়েছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসার কোন জবাব মেলে নি। আসলে কোন জবাব হয়ও না। একজন মুসলমান প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে গভীর আগ্রহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পড়লেন, মার্কস মাওসেতুং পড়লেন, কত-কীই পড়লেন, শুধু রাসুল (সাঃ)এর জীবনী ও আলকোরআন পাঠেরই কোন সময় হলো না। এর চেয়ে গুরুতর দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে! বিশ্বাস অবিশ্বাস ঈমান-আকীদার প্রশ্ন যদি স্থগিতও রাখি, তাহলেও-তো এটা মানতেই হবে যে, আলকোরআন, পৃথিবীতে এই একটিমাত্র অবিকৃত বিশুদ্ধতম গ্রন্থ, যা স্বয়ং আল্লাহপাকের নিজস্ব রচনা বলে দাবী করা হয়; অমুসলিম বহু ধুরন্ধর তার্কিক পণ্ডিত ও মনীষী যে-গ্রন্থে একটি ক্ষুদ্রতম সরিষাপ্রতিম ভুলও আবিষ্কার করতে পারেনি; যে-গ্রন্থের প্রথম বাক্যেই বলা হয়েছে, 'এটা এমন পুস্তক যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই', যে-গ্রন্থ এমন বিস্ময়কর, যার অনুরূপ একটি গ্রন্থ-তো দূরের কথা, একটি ক্ষুদ্র পংক্তি-রচনাও সমগ্র মানববংশের সম্মিলিত মেধা ও পরিশ্রম দিয়েও সম্ভব নয়; যে-গ্রন্থ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বকালে সর্বযুগে হুবহু কণ্ঠস্থ করে রেখেছে, যার ধারাবাহিকতা রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে; এমন একটি গ্রন্থ যার দিকনির্দেশনা নিয়ে হাজার বছর ধরে অর্ধেক বিশ্ব শাসিত-পরিচালিত হয়েছে। অথচ কী-বিস্ময়কর, এই রকমের একটি অতুলনীয় অভাবনীয় মহাপবিত্র গ্রন্থের প্রতি আমাদের এমনকি কৌতূহলও জাগে না! এতদসঙ্গে এই কথাটিও গভীর পরিতাপসহ উল্লেখযোগ্য যে, রাসুল (সাঃ)এর জীবন ও জীবনাদর্শের দিকেও আমরা একই রকম অমনস্ক। রবীন্দ্রনাথ কোন্ সালে বিবাহ করেছিলেন, বাইরন সত্যই খুঁড়িয়ে হাঁটতেন কিনা অথবা শেক্সপিয়র সত্যসত্যই আস্তাবল-রক্ষক ছিলেন, নাকি থিয়েটার হাউসে ফাইফরমাশ খাটতেন - এইসব না-জানলে আমরা লজ্জা পাই। কিন্তু রাসুল (সাঃ) কত বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, কত খ্রীস্টাব্দে হিজরত করেন, তাঁর মাদানী-জীবন কত বছরের-এইসব জানা না-জানা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার একজন খুবই উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সহপাঠী বন্ধুর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, 'আপনি কি জানেন, কোন্ খলীফার সময়ে মুসলমানদের হাতে পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে?' আমার বিদগ্ধ বন্ধুটি সহাস্যে বললেন, 'ও-সব মোল্লা-মৌলবিদের আলোচ্য বস্তু'। সত্যই কী ভয়াবহ দুর্গতি আমাদের! পৃথিবীবক্ষে যিনি সর্বমানবিক কল্যাণের আলোকবর্তিকা হাতে রহমতস্বরূপ প্রেরিত

www.pathagar.com

হয়েছেন, যাঁকে অমুসলিমরাও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বলে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে, যে-সাহাবীদের অকুণ্ঠ ত্যাগ ও শৌর্য-সাহসের কারণে ইতিহাসের গতিধারা পরিবর্তিত হয়েছে, যাঁদের জীবনকথা এখনো মুশরিক-মুনাফিকদের হৃৎস্পন্দনকে অস্বাভাবিক দ্রুত করে তোলে, আমাদের বিবেচনায় সেই অকুতোভয় মহানায়কেরা আজ শুধু 'মোল্লা মৌলবিদেরই আলোচ্য বস্তু'! কী জঘন্য এই অধঃপাত! নিজের ইতিহাস কত মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ, অথচ মুসলমান আজ রাধাকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্যের খোলামকুচি নিয়ে আনন্দে আত্মহারা। কী বিশ্বপ্লাবী সর্বজয়ী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে আমাদের জন্ম, অথচ সবকিছু স্বেচ্ছায় বিস্মৃত হয়ে আমরা আজ ধীবর-বৃটনদের ইতিহাস নিয়ে দিশাহারা। সত্যই আমরা মুসলমানই বটে! আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন, আপন ভালোমন্দ মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে একেবারে অবোধ, এই আমাদের মত আত্মঘাত-আত্মহননে লিপ্ত মুসলমানদের অসংশোধনীয় মুর্খতার প্রেক্ষিতে আলকোরআনের একটি বাক্য স্মরণযোগ্য: 'আসলে চোখ-তো অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়' (সুরা হজ্ব)। অতএব এই মৃত কাল্‌ব মৃত হৃদয়ের অধিকারী মুসলমান যদি সারা পৃথিবীর আজ করুণার পাত্রে পরিণত হয়, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ এই ধরনের মুসলমানের জন্য আল্লাহপাকের কোন হেফাজতের ওয়াদা নেই।

তিন

কিছুদিন থেকে একশ্রেণীর আপাদমস্তক ঈমানদারের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা দৃশ্যত খুবই মুত্তাকী বটে, কিন্তু কি-এক দুর্বোধ্য কারণে তাঁরা কোরআন-হাদীসের সংস্পর্শে আসতে চান না। তাঁদের একটি সুনির্দিষ্ট কিতাব আছে; এই কিতাবের বাইরে তারা অন্য আর কিছু পাঠযোগ্য আছে, তা খুবই সতর্কতার সঙ্গে অস্বীকার করেন। এই কিতাবটিতে কোরআনের কথা আছে, কিছু সহীহ হাদীসের কথাও আছে, কিন্তু বহুসংখ্যক যয়ীফ ও মনগড়া মওজু হাদিসও আছে। আর পুরো কিতাবটি এমনভাবে প্রণীত যে, ইসলামের মূল যে-মর্মবাণী - জীবন ও সকল সম্পদের বিনিময়ে হলেও পৃথিবীতে আল্লাহর প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখা - সেই জিহাদী ও বৈপ্লবিক তামান্না যাতে পুরোপুরি ঘুমিয়ে যায়। পৃথিবীর কলহ-কোলাহল থেকে গা-বাঁচিয়ে চলার নাম-যে ইসলাম নয়, এই বিশ্বে আল্লাহর একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে-অনিরুদ্ধ অঙ্গীকার, ইসলাম-যে সেই অঙ্গীকারেরই অপর নাম, এই অতি-মুত্তাকীরা সেই জরুরি কথাটি ভুলিয়ে দিতে চান। এই নবোদ্ভূত প্রবল আন্দোলনটি কেন ও কী-উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে জানি না; এবং এর মধ্য দিয়ে আখেরাতের পাথেয় সত্যই কতটা সংগৃহীত হয়, সেটাও বর্তমান-লেখকের অনুধাবন-ক্ষমতার বাইরে। শুধু এইটুকু বুঝতে পারি, সকল মুসলমান যদি কোরআন-হাদীসের সাথে সম্পর্কচ্যুত এই ধরনের নির্বিষ ও নিরীহ 'তৃণভোজী' প্রাণীতে পরিণত হয়, তাহলে সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত জলেস্থলে অন্তরীক্ষে কুচক্রী শয়তানী-

www.pathagar.com

শক্তির ওয়াক-ওভার পেতে বিশেষ আর কোন বাধা থাকে না। এই আন্দোলনের শীর্ষবাসী মুরুব্বিজনেরা হয়ত আসল রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, কিন্তু নিম্নস্থ অসংখ্য অনুরাগী অনুসারীরা পুরোপুরি অজ্ঞাতসারেই এক আত্মঘাতী কুহকের শিকার। ভাবাই যায় না, কল্পনা করতেও কষ্ট হয়, উমার ফারুক, খালিদ তারিক মুসান্না, মুহম্মদ বিন কাসিম সালাহদীন আইয়ুবী প্রমুখ অসংখ্য জগজ্জয়ী মুজাহিদ মহানায়কের অধঃস্তন এই উত্তরপুরুষ আজ এমন এক ভীরু ও ক্লীব ও প্রতিবাদহীন মেষশাবকে পরিণত হলো, যাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হলো, কাফের মুশরিকদের পদমর্দন করে হলেও কোনভাবে টিকে থাকা।

আমার এই বক্তব্যে যাঁরা সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁরা যে-কোনভাবে পরীক্ষা করুন, মুসলমানের হৃৎপিণ্ডে ন্যূনতম সাহস ও আত্মবিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও আজ অবশিষ্ট আছে কিনা। মুসলমান-রাজা বাদশাহ মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীদের কাছে গিয়ে দেখুন, তাঁদের কাছে আল্লাহর কথা ও 'মহামতি' ক্লিনটনের কথা যদি একই সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়, ফলাফল কী দাঁড়ায়? দেখা যাবে, সবাই সভয়ে ও সাগ্রহে ক্লিনটনকেই গ্রহণ করছেন। অবস্থা এমন যে, জাগতিক যে-কোন শক্তির সন্তুষ্টিবিধানে মুসলমান আজ আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে কোনরূপ গ্রাহ্যই করছে না। আল্লাহ শুধু নামেই আছেন; আমাদের বিশ্বাসে ক্লিনটনেরাই আসলে সর্বশক্তিমান প্রতিপালকরূপে বর্তমান। আফসোস, এই মুসলমানও মুসলমান! বস্তুত, আমরাও দেখছি এবং আল্লাহও দেখছেন, ইসলামের মত সর্বজয়ী সর্বপ্লাবী নূর ও নেয়ামত আজ এমনই এক অন্ধ অক্ষম আত্মবিস্মৃত মুসলমানের হাতে পড়েছে, যাদের আপাদমস্তক ঘন অন্ধকারময় বহুবর্ণ অমার্জনীয় শিরকে আচ্ছন্ন। এই ধরনের সর্বাঙ্গে শিরক-পরিহিত-বান্দাহর সকল ইবাদত যদি আল্লাহপাক সরোষে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেন, সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। এবং সম্ভবত, তাই-ই করেছেন। অন্যথায় বিশ্ববিস্তৃত মুসলিম উম্মাহকে আজ এমন অকথ্য অভাবনীয় জিল্লতীর মধ্যে নিশ্চয়ই নিক্ষিপ্ত হতে হতো না।

সন্দেহ নেই, মুসলমান খুব মন দিয়েই আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্ম পালন করছে। বাহ্যত এটা ভালোই। কিন্তু জ্ঞানত বা অজ্ঞতাবশত, মুসলমান আজ তার মৌল দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। রাসুল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের (রাঃ) জীবনাদর্শ থেকে এটা খুব সহজবোধ্য যে, ধরাপৃষ্ঠে মুসলিম মিল্লাতের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো, আল্লাহর জমীনে আল্লাহর নির্ধারিত বিধানকে একমাত্র সাংবিধানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। এ-থেকে কিঞ্চিত্তম পার্শ্বপরিবর্তনেরও সুযোগ নেই। আনুষঙ্গিক আরো বহু করণীয় আছে, কিন্তু এটাই ইসলামের সার কথা। এ-থেকে বিচ্যুত হয়ে যত যা-ই করা হোক, আল্লাহর কাছে তা বোধহয় খুব-একটা গ্রাহ্য হবে না। মুসলমানের অবস্থা আজ সেই তরুণ শিক্ষার্থীর মত, যে তার পিতামাতার সকল আদেশ-উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন

www.pathagar.com

করছে। প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ, যথাসময়ে আহারগ্রহণ, পিতামাতাকে নিয়মিত চিঠি লেখা, বেশি বেশি সিনেমা না-দেখা, অসৎ-সংসর্গ বর্জন, শিক্ষকদের মান্য করা, কোন অযথা কলহ-কোন্দলে জড়িয়ে না-পড়া - সবদিক থেকে এক আদর্শ তরুণ। বিদায় নেবার প্রাক্কালে পিতা-মাতা তাকে যে-সকল উপদেশ দিয়েছিলেন, দূরে এসে তার একটিও সে বিস্মৃত হয় নি। শুধু একটিমাত্র বিষয়ে পিতৃ-মাতৃভক্ত এই তরুণ একেবারে অমনস্ক, তা হলো সে লেখাপড়া করে না, ক্লাসে যায় না। পিতামাতার কাছে এই সন্তানের কোন কাজেরই কি আদৌ কোন মূল্য থাকে? পিতামাতার সকল আদেশ নিখুঁতভাবে মান্য করা সত্বেও, এই সন্তান কি কর্তব্যভ্রষ্ট অবাধ্যদের দলভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না? মুসলমানের অবস্থা আজ হুবহু এই তরুণের মতই। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের সব কথাই গুরুত্বের সঙ্গে মান্য করছে; শুধু প্রধানতম যে-কাজ, তাগুতি শক্তির পরাক্রম রুখে দিয়ে পৃথিবীটাকে আল্লাহর অধীনে নিয়ে আসা, সেই জরুরি কাজের কথাটাই মুসলমান আজ ভুলে আছে। আর এই বিস্মৃতি যাতে আরো ঘন হয়ে মুসলমানের কল্‌ব ও মস্তিষ্ককে সর্বদায়ই দিকভ্রষ্ট করে রাখে, সেই কাজটাই অব্যাহত রেখেছে বহু পীর দরবেশ, বহু মুবাল্লিগ ও রহস্যময় বাতেনী-সিলসিলার বহু সুফী বুজর্গ। সত্যই আফসোস, মুসলমানের কী ইতিহাস, আর আজ ধর্মের নামে কী তার আত্মঘাতী পরিণতি!

দুঃখের শেষ নেই, কথারও শেষ নেই। যে-ইসলাম মুসলমানকে জগজ্জয়ী সম্মানে একদা অভিষিক্ত করেছিল, সেই ইসলামকে নিয়েই আজ তৈরী হয়েছে বহুবিধ ভ্রান্তির প্রহেলিকা। এ-থেকে মুক্তি পাওয়া বড় কঠিন। কারণ রোগী যদি রোগকেই সুস্থতা বলে জ্ঞান করে, তাকে চিকিৎসা করা অসম্ভব। হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)এর রেওয়ায়েত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, 'শয়তান বলে, পাপে লিপ্ত করিয়ে আমি মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছি; আর মানুষও তওবা করতে করতে আমার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে আমি তাদেরকে স্বকীয় খেয়াল-খুশি দ্বারা সৃষ্ট এমন কিছু ক্রিয়াকর্মের মধ্যে জড়িয়ে দিয়েছি যে, সেগুলি তারা পুণ্য মনে করেই করে এবং তওবা করার কোন প্রয়োজন বোধ করে না'। ইবলিসের এই চতুর কৌশলটি সত্যই অমোঘ ও অনতিক্রম্য। পাপকে চেনা যায়, সেই পাপকর্মের জন্য অনুতাপের অশ্রুজলে আল্লাহর কাছে মাফও চাওয়া যায়, মাফ পাওয়াও যায়; কিন্তু পুণ্যজ্ঞানে আমাদের যে-পাপ, তার-তো কোন প্রতিষেধক নেই। আমরা আজ এই নিরাময়হীন দুর্মতিরই অনিবার্য শিকার। আমাদের পৃষ্ঠদেশে সওয়ার হয়ে ইবলিস সত্যই এমন আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে যে, ইসলামের মর্মার্থ বিস্মৃত হয়ে আমরা আজ পুণ্যজ্ঞানে ইসলামের বক্ষে নিরন্তর ছুরিকাঘাত করে চলেছি। এতে অবশ্য ইসলামের কোন ক্ষতি নেই, শুধু

www.pathagar.com

আত্মঘাতে রক্তাক্ত হচ্ছে মুসলিম মিল্লাত। আজ সমগ্র বিশ্বই যখন, শত্রু কি সুহৃদ যে-রূপেই হোক, ইসলামের নির্ভুল ব্যবস্থাপত্রকে অশেষ গুরুত্বসহ পর্যবেক্ষণ করছে, মুসলমান তখন পরিণত হলো গৈরিকবসনা সর্বধর্মপ্রেমী বাউল কি বৈষ্ণবে। সে এখনো গীর্জায় রবিবাসরীয় প্রার্থনাসভায় পাপমুক্তির জন্য যোগদান করছে-না সত্য; লোকভয় ও চক্ষুলজ্জার কারণে কালীঘাটে গিয়ে পূজার নৈবেদ্য অর্পণ করছে-না, এ-কথাও সত্য; কিন্তু যা-করছে তা আরো গর্হিত, আরো ভয়াবহ। আল্লাহর একক অখণ্ড সার্বভৌমত্বের নকীব যে-মুসলমান, যে-কোন ধরনের অংশীবাদকে উৎখাত করে পৃথিবীকে অবিমিশ্র তওহিদের পতাকাতলে নিয়ে আসাই যার একমাত্র কাজ, আল্লাহর সন্তুষ্টিই যার একমাত্র লক্ষ্য; বড় আফসোস, সেই মুসলমান আজ কোন্ হ্যামেলিনের ধর্মনিরপেক্ষতা ও কুশলি-অংশীবাদের বাঁশি শুনে মূষিকদের মতই দলে দলে পরমানন্দে পার্থিব ধ্বংস ও পারলৌকিক জাহান্নামের দিকে ছুটে চলেছে। এ-এক প্রচণ্ড আত্মহনন; মুসলমান আজ জেনেশুনেই বিচিত্র রকমের শিরক ও মোনাফেকীর পেয়ালা তুলে নিয়েছে মুখে। তথাকথিত ক্ষমতা সম্মান ও প্রতিপত্তির লোভে-প্রলোভনে অধিকাংশ মুসলমান-যে একদিন এই অবস্থার শিকার হবে, আল্লাহপাক তা জানতেন। এবং এইজন্যই তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে এরশাদ করেছেন, 'বলুন, ইয়া আল্লাহ, আপনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছা ছিনিয়ে নেন; যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত। আপনারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ; নিশ্চয়ই আপনি সর্বময় ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী' (সুরা আল এমরান)। বিস্ময়করই বটে, এমন সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও মুসলমান আজ ক্ষমতা প্রতিপত্তি মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রশ্নে খোদাদ্রোহী মুশরিক মুনাফিকদের দুয়ারে দুয়ারে করুণা ও আনুকূল্য ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। আল্লাহপাকের ক্ষমা তাঁর ক্রোধের তুলনায় অনেক বড় (আল হাদীস); না-হলে বিশ্বব্যাপী এই মুসলিম মিল্লাতের ললাটে আরো কী-যে চরম লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ নেমে আসতো, তা অভাবনীয়। সত্যই-যে অভাবনীয়, আল্লাহপাক সুরা নূর-এ সে-বিষয়ে এরশাদ করেছেন, 'তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা যদি না-থাকতো, তিনি যদি তওবাগ্রহণকারী সর্বোচ্চ প্রজ্ঞা ও মহত্বের অধিকারী না-হতেন, কত কীই-না হয়ে যেত'। এখনো সময় একেবারে শেষ হয়ে যায় নি; এই 'কত-কী' হয়ে যাওয়ার হাত থেকে মুসলমানকে যদি রক্ষা পেতে হয়, তাহলে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহের উপর ভরসা রেখে তাকে আত্মসংশোধনে ব্রতী হতে হবে; কোরআন ও হাদীসের প্রকৃত মর্মানুযায়ী নিজেকে প্রকৃত মুসলমানে পরিণত করতে হবে। এমন মুসলমান, যাদেরকে দেখে বহুকাল পূর্বে হিরাক্লিয়াসের গুপ্তচর যা-বলেছিল, একালের বিশ্বও যেন সেই একই কথা বলতে বাধ্য হয় যে, 'মুসলমান হলো নিশিথে দরবেশ, দিবাভাগে অশ্বারোহী'। অন্যথায় যে-যতই বলুক, একবিংশ শতাব্দী হবে ইসলামের

www.pathagar.com

শতাব্দী, আসলে সেটা হবে অলীক ও অলস দিবাস্বপ্ন। বরং যা হতে পারে, তাহলো স্পেনের পুনরাবৃত্তি। কারণ, আল্লাহপাক মুসলমানের কাছ থেকে মাঠে-ময়দানে দোয়ার মাহফিল দেখতে চান না; তিনি চান কোরবানী, তিনি চান রক্ত ও সম্পদের নজরানা। আল্লাহপাক দেখতে চান ফিত্না-কন্টকিত এই পৃথিবীতে সকল মিথ্যা জুলুম ও বে-ইনসাফীর বিরুদ্ধে মুসলমানের মরণপণ সাহসী ভূমিকা। আল্লাহপাক বলেন,'তোমাদের কী-হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে না? তোমরা কি শুনতে পাও-না দুর্বল নারী পুরুষ ও বালকদের ফরিয়াদ, যারা বলছে, ইয়া আল্লাহ, এই জালিমদের হাত থেকে তুমি আমাদের মুক্তি দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে কাউকে তুমি আমাদের বন্ধু ও সহায়ক বানিয়ে দাও' (সুরা তওবাহ)। মুসলমান হলো নির্যাতীত মজলুম মানব সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহপাকের তরফ থেকে মনোনীত বন্ধু ও সাহায্যকারী একমাত্র মিল্লাত, ফিত্না সমূলে উৎপাটিত না-হওয়া পর্যন্ত যে-মুসলমানের কোন বিরাম নেই। কিন্তু ইসলামের নামে বহু কুহক ও কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, নাস্তিক-মুশরিকদের পাতা-ফাঁদে আটকেপড়া মক্ষিকারূপী বর্তমান মুসলমানের কাছে এই কথা-যে কতটুকু পছন্দ ও বোধগম্য হবে, একবিংশ শতাব্দীর প্রবেশমুখে সেটাই আজ সর্ববৃহৎ জিজ্ঞাসা।

দৈনিক ইনকিলাব : ৩রা, ৬ই ও ১১ই মার্চ, ২০০০

www.pathagar.com

সুন্নাতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত ইসলামী জিন্দিগী ও জীবনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য শর্ত। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) কর্তৃক উপস্থাপিত জীবনাদর্শ যে-কোন মুসলমানের জন্য আদর্শস্বরূপ ও অবশ্যমান্য। কারণ আল্লাহপাক বলেন, রাসূল (সাঃ) নিজেও বলেন, জীবনের সকল দিক সম্পর্কে তাঁর পেশকৃত যে-সিদ্ধান্ত ও সমাধান, তাকে নিঃশর্তভাবে হুবহু মান্য করার নামই ইসলাম। ইসলাম অন্য কিছু নয়, ইসলাম হলো রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত পথে চলারই সার্বক্ষণিক অঙ্গীকার। বাস্তব ক্ষেত্রে যাঁর যাপিত-জীবন যে-পরিমাণে ও যতটা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সমান্তরাল ও নিকটবর্তী, তিনি সেই পরিমাণে ও ততটা মুসলমান। যার মধ্যে রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত আদেশ-নিষেধের কোন বিবেচনা ও অনুসৃতি নেই, তার মধ্যে মুসলমানিত্বও নেই, ইসলামও নেই। এবং ইসলাম যেহেতু কোনো খণ্ডিত জীবনদর্শন নয়, অথবা বিশেষ বিশেষ নিয়মাধীনে নির্ধারিত তিথি ও লগ্নের সাময়িক আনুষ্ঠানিকতা নয়; ইসলাম যেহেতু সকল মানুষের জন্য সর্বতোমুখী ও সার্বক্ষণিক কল্যাণের এক অব্যর্থ গ্যারান্টি, মনে রাখা জরুরি, এই নির্ভুল ও শাশ্বত ব্যবস্থাপত্রে এমন কোনো ফাঁক-ফোকর অবশিষ্ট নেই, যা একালের কোন প্লেটো, এরিস্টটল তাদের মেধা ও মনীষা ও বিদ্যাবত্তা দ্বারা সংশোধন বা পূর্ণ করে দেবে। যারা এ-রকম ধারণা করে, তাদের জ্ঞাতার্থে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, আল্লাহপাক ইসলামকে এমন সর্বতোমুখী ও পরিপূর্ণ ও মনোনীত দ্বীন (সূরা মায়িদা) হিসেবে ঘোষণা করেছেন, যার উপরে কিঞ্চিত্তম হস্তক্ষেপের অধিকার এমনকি রাসূল (সাঃ)কেও দান করা হয় নি, অন্যদের তো প্রশ্নই ওঠে না। বরং এই ধরনের চিন্তা ও দুর্মতি যাতে ভুলক্রমেও কারো মাথায় না-আসে, সেজন্য এমনকি রাসূল (সাঃ)কেও একটু কঠিনভাবেই সতর্ক করা হয়েছে। এবং কোনো বদ্ধ-উন্মাদ কি অতিরিক্ত সংস্কারকামী কোনো মূঢ় বুদ্ধিজীবী যাতে ইসলামের সংবিধানকে অণু-পরিমাণও বিকৃত করতে না-পারে, সেই সুরক্ষারও ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহপাক। 'কোরআন আমার তরফ থেকে অবতীর্ণ, আমিই তাকে সংরক্ষণ করবো' (সূরা হিজর)।

আল্লাহপাক কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর ইচ্ছাই যথেষ্ট। তবু বলা যায়, এই সুরক্ষার ব্যবস্থা আল্লাহপাক করেছেন বাহ্যত দু'ভাবে। প্রথমত, আলকোরআনের যে-শাব্দিক ও আক্ষরিক ভাষাগত রূপ, তাকে সকল রকম বিকৃতি ও প্রক্ষেপ থেকে নিরাপদ রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কুরআনুল কারীমের যে-ব্যবহারিক রূপ ও তাৎপর্য, তাকেও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহর মাধ্যমে এমন দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তব দৃশ্যরূপ দান করা হয়েছে, যা-নিয়ে কোনরূপ সূক্ষ্মতম সংশয়েরও কোনো অবকাশ কখনো না-থাকে। এবং রাসূল (সাঃ)-এর জীবন ও জীবনাদর্শের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত আল কোরআনের এই বাস্তব রূপরেখাটিও কুরআনুল কারীমের মতই রোজ কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহপাক হুবহু অক্ষত রাখবেন।

www.pathagar.com

অতএব কোরআনের মতো রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহর অনুসরণও যে-কোন মুসলমানের জন্য ফরজ ও অপরিহার্য। এবং বুঝতে ভুল না হয়, এই জন্য আল্লাহপাক এই কথা একাধিকবার ঘোষণাও করেছেন। অর্থাৎ যত যা-ই বলি, সুন্নাহকে পাশ কাটিয়ে ইসলামও হয় না, মুসলমানও হওয়া যায় না। আশা করি, এই বক্তব্যের সঙ্গে কোনো মুসলমান অন্তত দ্বিমত পোষণ করবেন না। অবশ্য এই সঙ্গে এই আশঙ্কা কিছুটা হলেও বর্তমান যে, সুন্নাতি-রাসূলুল্লাহ বলতে সকল বিষয় সকলের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়, সম-অর্থবোধকও নয়। স্বীকার-অস্বীকার যা-ই করি, এটা সত্য যে, সুন্নাহর গুরুত্ব ও অগ্রাধিকারের প্রশ্নে আমরা বহুলাংশে জটিল আত্মবিভক্তি ও অনৈক্যের শিকার। অর্থাৎ গুরুত্বের হেরফের ও অগ্রাধিকারের অগ্রপশ্চাৎ নিয়ে মুসলিম মিল্লাত আজ বহুধাবিভক্ত। অনেকের কাছে মেসওয়াক, কুলুখ-ব্যবহার, লেবাস, মেঝেতে বসে আহার করা, সুগন্ধি, সুরমা, লাঠি-ব্যবহার, পাগড়ি-পরিধান ইত্যাদি বিষয় এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এর যে-কোন একটি পরিহার করলে শুধু অগণিত সওয়াব থেকেই মাহরুম হবে না, আখেরাতে জাহান্নামের ফয়সালাও হয়ে যেতে পারে।

সত্য যে, উল্লিখিত কোন একটি বিষয়ও গৌণ নয়; কিন্তু কেউ-তো এই প্রশ্নও উত্থাপন করতে পারেন যে, মেসওয়াক যেমন সুন্নাত, ইসলামের তরক্কীর প্রশ্নে যুদ্ধের ময়দান থেকে পশ্চাদপসরণ না-করাও সুন্নাত। চোখে সুরমা লাগানো কি সুগন্ধি-ব্যবহার যেমন সুন্নাত, জিহাদের ময়দানে শত্রুর আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হওয়াও সুন্নাত। মেঝেতে আহার করা যেমন সুন্নাত, জননী আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ) বর্ণনামতে রাসূল (সাঃ)যে কোনদিনই ভালো রুটি খান নি, নরম কোন বিছানা বালিশ ব্যবহার করেন নি, নিঃসন্দেহে এগুলোও সুন্নাত। মাঝে মাঝে মধু খাওয়া যেমন সুন্নাত, কাইলুলা অর্থাৎ আহারান্তে দ্বৈপ্রহরিক সামান্য আরাম যেমন সুন্নাত, আল্লাহর নবী-যে সারা জীবন ভূষিসমেত যবের রুটি খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেছেন, আট ফুট বাই বারো ফুট ঘরে আমৃত্যু জীবন নির্বাহ করেছেন, নিশ্চয়ই এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। পেঁয়াজ না-খাওয়া সুন্নাত, প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত আছে কিনা সেই খবর রাখাও সুন্নাত, অট্টালিকা নির্মাণ না-করাও সুন্নাত। এবং বলাই বাহুল্য, দ্বিতীয় ধরনের সুন্নাতসমূহের গুরুত্ব এত বিশাল ও ব্যাপক এবং অপরিহার্য যে, এর কোন কোনটি ইসলামে রীতিমত ফরজ। এজন্যই পেশাব থেকে পবিত্র হওয়া জরুরি বটে, কিন্তু পেশাবের কথা-তো অনেক লঘু, এমনকি জানাবাত অবস্থায়ই হজরত হানয়ালা (রাঃ) ওহুদের ময়দানে ছুটে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। অথচ কী গুরুতর দুঃখের কথা, আমরা কেবল আমাদের আপনাপন সুবিধানুযায়ী বেছে বেছে সহজ কিছু সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছি। সত্যই এর চেয়ে গুরুতর বিভ্রম আর কিছু হয় না।

www.pathagar.com

আসলে মুসলমান এখন আর ইসলাম নয়, ইসলামের নামে এক সহজিয়া ধর্মের উপাসক। তার পরহেজগারি তাকওয়া সুন্নাতের অনুসরণ জিকির-ফিকির সবই ইসলামের বৈপ্লবিক আপোষহীন দাবির মুখে পলায়নপরতারই নামান্তর। কী হবে না-হবে আল্লাহপাক ভালো জানেন। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে ধারণা হয়, ইবলিসের মোকাবিলায় এই ধরনের ভীরু ও ভয়ার্ত মুসলমানের কোনো বন্দেগী আল্লাহপাকের কাছে চূড়ান্ত বিচারে প্রত্যাখ্যাত হবারই সমূহ সম্ভাবনা। কারণ, ইবলিসের মোকাবিলায় যার ভূমিকা নিরপেক্ষ, সে-ব্যক্তি নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দলভুক্ত নয়। সে বরং ইবলিসেরই পরোক্ষ সহযোগী। জার্মান নাট্যকার ব্রেখ্‌ট বলতেন, সমাজতন্ত্রকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু এই ভালোবাসার কারণে আমি আমার গাড়ি-বাড়ী ও সচ্ছল নিরাপদ জীবন পরিত্যাগ করতে অক্ষম। বহু মুসলমান আজ বহুলাংশে ব্রেখটের মতই। তারা ইসলামকে ভালোবাসে, ইসলামের বিজয়ও কামনা করে, কিন্তু নিজে কোনো ত্যাগ ও ঝুঁকির মধ্যে প্রবেশ করতে নারাজ। অর্থাৎ এই মুসলমানেরা রাসূল (সাঃ)কে ভালোবাসে, ইসলামকেও ভালোবাসে, কিন্তু এই ভালোবাসার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সারবস্তু কিছু নেই। এটা ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে হতে পারে, অথবা আখেরাতের তুলনায় পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ার কারণেও হতে পারে। কিন্তু যেটাই হোক, ইসলামের সঙ্গে, মুসলমানিত্বের সঙ্গে এই ধরনের আত্মপরিচয়-বিস্মৃত ক্লীব ও বিকৃত মুসলমানের সম্পর্ক অত্যন্ত শিথিল। শুধু শিথিল নয়, কখনো কখনো সাংঘর্ষিকও বটে। অতএব এরা যখন রাসূল (সাঃ)-এর অনুগত-অনুসারী বলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করে, সেই আত্মশ্লাঘার মধ্যে কোনো প্রকৃত প্রাণসত্তা বলে কিছু থাকে না। পুরোটাই একজাতীয় লঘু তামাশার বস্তু হয়ে ওঠে। আসলে রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত মানে আল্লাহপাকের পথনির্দেশ অনুযায়ী রাসূল (সাঃ) যে-জীবনাদর্শ পেশ করেছেন, সেই পার্থিব জীবনাদর্শ। এই জীবনাদর্শের নিঃশর্ত অনুসরণই মানুষকে তার সর্বোচ্চ কামিয়াবির দিকে নিয়ে যায়। মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের সন্ধান পায় ও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সর্বোচ্চ কামিয়াবি ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য কী-জিনিষ, এ বিষয়ে যে-কোনো মুসলমানের প্রকৃষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক; অন্যথায় তার পক্ষে নির্ভুল সাফল্য অর্জন করা অসম্ভব।

মুসলমান বিশ্বাস করে, তার জীবনের সর্বোচ্চ সাফল্য হলো আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি। কারণ আল্লাহ্‌পাকের নিজস্ব ঘোষণা, 'ওয়া রিদওয়ানুম মিনাল্লাহি আকবার জালিকা হুয়াল ফাউজুল আজীম'-আল্লাহ্‌পাকের সন্তুষ্টিই জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাফল্য (সূরা তাওবাহ)। আর তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য হচ্ছে, পার্থিব সকল পরীক্ষা ও আখেরাতের হিসাব-নিকাশ উত্তীর্ণ হয়ে, আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ মাথায় নিয়ে অনন্তকালের জান্নাত। এই জান্নাত এমন একটি অভাবনীয় অকল্পনীয় পুরস্কার যে, আল্লাহপাক এরশাদ করেন,

www.pathagar.com

'ফাদ খুলি ফি ইবাদি ওয়াদ খুলি জান্নাতি' (সূরা ফাজর) আমার দাসত্ব করো এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। এ-থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ্পাক তাঁর প্রীতিভাজন বান্দাহ্দের জন্য যে-পুরস্কার নির্দিষ্ট রেখেছেন, তার নাম জান্নাত।

অবশ্য জান্নাত জাহান্নাম ও আখেরাতকে যারা বিশ্বাসই করে না, তারা নামত মুসলমান হলেও, তারা এই বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। বর্তমান এই আলোচনার লক্ষ্য সেই সকল মুসলমান, যারা আসন্ন আখেরাত ও বিচারদিনের প্রতি গুরুত্বের সঙ্গে ঈমান রাখে এবং প্রকৃত কামিয়াবি ও প্রকৃত গন্তব্যের কথা আন্তরিকভাবে বিবেচনা করে। অর্থাৎ যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যে আশ্রয়লাভে আকাঙ্ক্ষী এবং যাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাতে প্রবেশাধিকার। কিন্তু এই দুটো বস্তু লাভ করার প্রকৃষ্ট উপায় কী? আল্লাহপাক বলেন, 'ওয়ামা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুজুহু ওয়ামা নাহাকুম আনহু ফানতাহু'-রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে যা প্রদান করেন, তা গ্রহণ করো, যা নিষেধ করেন তা-থেকে বিরত থাকো (সূরা হাশর)। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি সর্ব বিষয়ে নিঃশর্ত আনুগত্য রক্ষাই ঐহিক ও পারত্রিক সাফল্যের মূলধন। কিন্তু দিনে দিনে, যে-কোন কারণেই হোক, মুসলমানের মধ্যে নানা ধরনের সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। আসলে মহানবী (সাঃ) সমগ্র মানববংশের জন্য কী-পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন, কী-উপহার পেশ করেছিলেন, সেই বিষয়টি সম্যক অনুধাবনের মধ্যেই রয়েছে তাঁর সুন্নাহর সার্থক অনুসরণ। অথচ এইখানেই আমরা মারাত্মকরূপে দিকভ্রষ্ট, মারাত্মকরূপে বিভ্রমের শিকার। বহু মুসলমান জানেই না এবং জানতেও চায় না যে, রাসুল (সাঃ)এর কাজটা কী ছিল এবং পরবর্তীদের উপর কী-কাজের দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন।

মুসলমান আজ আলখাল্লার যতটা মূল্য দিচ্ছে, গুদ্ড়ি ধরনের দরবেশী-লেবাসের যতটা মূল্য দিচ্ছে, তার এক শতাংশ মূল্যও পৃথিবী-পরিচালনায় ইসলামের সাংবিধানিক রূপরেখাকে দিচ্ছে না। অবস্থা এমন যে, আজ মনে হচ্ছে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) পৃথিবীতে এসেছিলেন তাঁর উম্মতদেরকে টেলারিং শেখাতে, এসেছিলেন দোয়া-তাবীজের গোপন বিদ্যার পশরা নিয়ে। এবং হজরত জিব্রাইল (আঃ)ও যে সহস্র সহস্রবার আমাদের এই প্রিয়তম মানুষটির কাছে এসেছিলেন, আজ মনে হচ্ছে, সেটা কেবলই দরবার ও খানকাহ্ সাজানোর পরামর্শ নিয়ে অথবা নিষ্ক্রিয় দোয়া-দরুদ ও মুরাকাবা-মারেফাতির সবক দানের জন্য। না, এসব পরিহাসের কথা নয়। বহু মুসলমানের সুন্নাতি-জিন্দিগীর যে-নমুনা, তা-থেকে অনিবার্যভাবে এ-রকম ধারণাই গড়ে উঠছে। অথচ এসব কোনটাই ইসলামের আসল কথা নয়। ইসলামের মূল বক্তব্য হলো, ফিত্না সমূলে উৎপাটিত না-হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে, ইবলিসী-তৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বস্ব নিয়ে প্রতিরোধ রচনা করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহপ্রদত্ত সংবিধানকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে, কোরআনের সকল নির্দেশ ও নিষেধকে শিরোধার্য

www.pathagar.com

করে পৃথিবীকে সুন্দর ও পবিত্র করে তোলাই মুমেনের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে কুণ্ঠার এতটুকু অবকাশ ইসলামের প্রথম যুগেও ছিল না, এখনো নেই। এইজন্যই একজন মুমেন সর্বদায়ই একজন সার্বক্ষণিক মুজাহিদ। এটাই রাসুল (সাঃ)এর শিক্ষা, এটাই তাঁর সর্বপ্রধান সুন্নাত এবং এটাই সর্বকালের সকল মুসলমানের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় কাজ ও কর্তব্য।

প্রকৃতপক্ষে নবী মোহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সকল অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান এক বিপ্লবী মহানায়ক, এক অকুতোভয় সিপাহসালার। এবং এই কারণেই বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কিছু সাহাবীর দ্বিধা ও দুর্বলতাদৃষ্টে, তিনি ঘোষণা করেছিলেন-তোমরা কেউ না-গেলে আমি একাকী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হবো। এবং তিনি বলতেন, আল্লাহর যাঁরা নবী ও রাসুল, তাঁরা যুদ্ধের পোশাক পরিধান করার পর যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে আর পোশাক পরিবর্তন করতে পারেন না। অথচ এই বিপ্লবী মহাপুরুষের উম্মত হিসাবে সুন্নাত সম্পর্কে আমাদের আজ কতই-না অভিনব ধারণা, ইবাদত-বন্দেগী ও রাসুল প্রেমের আজ কতই-না ভ্রান্তিবিলাস! ধর্ম রাষ্ট্র ও পৃথিবী-নিরপেক্ষ মুদিতনেত্র মুসলমানের এই ইসলামপ্রীতি আসলে একটি তামাশা। নিশ্চয়ই তামাশা, কারণ ইসলামের যারা শত্রু, তাদের ভয়ে হোক বা তাদের প্রতি সখ্যবশত হোক, যে-মুসলমান সকল ঝুঁকি এড়িয়ে নিরাপদ নিরপেক্ষ থাকতে চায়, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাদেরকে মুসলমান বলে স্বীকারই করেন না, বরং তারা মুনাফিক বলেই চিহ্নিত।

মুনাফিকই বটে! পৃথিবীতে রাজত্ব করবে ইবলিস ও তার অনুচর ক্রীতদাসবৃন্দ, আর 'সুন্নাহ দরদী' মুসলমান দোয়া-দরুদের আড়ালে হল্‌কা-জিকিরের আবেশে-অনুরাগে আত্মগোপন করে থাকবে, ইবলিসের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন গুজরান করবে, আল্লাহদ্রোহী শক্তির প্রতিরোধ-তো দূরের কথা, কোনরকম ঝামেলার মধ্যেই যাবে না, এর চেয়ে গুরুতর ও ক্ষমাহীন মুনাফিকী আর কী-হতে পারে! অসংখ্য মুসলমান আজ হুবহু হামামের মত। হামাম ছিল ফেরাউনের মুখ্যমন্ত্রী। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে ছিল ফেরাউনী-বিধানের সমর্থক ও সহযোগী। শুধু একটি জায়গায় একটু ব্যতিক্রম ছিল; কৌতুক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দাড়ি টুপি পোশাকে-আশাকে সে ছিল মুসা (আঃ)এর অনুকারী। আমরাও ঠিক এইরকমই; জীবনের সকল পদক্ষেপে কাফের-মুশরিক-মুনাফিক-পৌত্তলিকদের আইন-আদালত, নিয়ম-রীতি ও শাসন, রসম-রেওয়াজ কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে সাদরে গ্রহণ করলাম, শুধু ইসলামের প্রতি মহব্বতের তীব্রতায় রাসুল (সাঃ)এর টুপি-পাগড়ি-দাড়িকে নাজাতের নির্ভুল অবলম্বন হিসাবে আঁকড়ে ধরেছি। এটা সুন্নাত নয়, এটা হামামী তামাশা; এটা মুহব্বত নয়, এটা লঘু চালাকি ও গুরুতর বিভ্রান্তি। এই তামাশা ও বিভ্রান্তি নিয়ে পৃথিবীতে কিছু স্বার্থসিদ্ধি হলেও হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ'র সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক সাফল্য লাভের খুব-একটা আশা নেই।

www.pathagar.com

বলাই বাহুল্য, রাসুল (সাঃ)এর সুন্নাহ অনুসরণ করেছেন তাঁর প্রত্যক্ষ সাহচর্যধন্য সাহাবাবৃন্দ, যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেছেন - 'আল্লাহ তাদের উপর রাজী, তারাও আল্লাহর উপর রাজী' (সূরা বায়্যিনাহ)। এই সাহাবীদের সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)ও পরম আস্থা ও প্রীতিভরে জানিয়েছেন, তারাই পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম জামাত। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সাঃ)এর ঘোষণা থেকে বুঝা যায়, সাহাবী (রাঃ)দের স্থান ও মর্যাদা কত অভাবনীয় সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর নবী এই কথাও বলেছেন, তাদের যে-কোন একজনকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করলেও আর পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। এবং মুসলিম মিল্লাত ক্রমশ নানা বিভক্তির শিকার হয়েছে সত্য, কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো মতানৈক্য নেই যে, একজন নগন্যতম সাহাবীর যে-মর্যাদা, পরবর্তীকালের কোনো উৎকৃষ্টতম উম্মতের পক্ষেও তার ধারে-কাছে পৌঁছনো সম্ভব নয়। এবং এই কারণেই সাহাবীদের প্রশ্নে হজরত বড় পীর (রঃ) সাহেব দ্রুতধাবমান অশ্বারোহীর সঙ্গে বহু-পশ্চাতে বাতাসে ভেসে-বেড়ানো একটি অতি ক্ষুদ্র ধূলিরেণুর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছেন। কিন্তু সাহাবীরা এই অকল্পনীয় অত্যুচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন কী-কারণে? রাসুল (সাঃ)এর নির্দেশ অনুযায়ী নামাজ-কালাম ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে সাহাবী (রাঃ)দের যে-ইসলামী জিন্দিগী, সেই জীবন পরবর্তীকালেও আল্লাহপাকের অনেক রহমতপ্রাপ্ত বান্দাহ নিষ্ঠার সঙ্গে যাপন করেছেন ও করছেন। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে ব্যবধান দুস্তর ও অনতিক্রম্য। শুধু একটি যে-ক্ষেত্রে, পরবর্তীকালের যত বড় ইবাদতগুজার বান্দাহ্ই হোক, সাহাবীদের এক-সহস্রাংশ কামিয়াবীও কেউ অর্জন করতে পারেন নি, সেটা জিহাদ; সেটা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) ও ইসলামের প্রশ্নে হৃদয়-নিংড়ানো শাহাদাতের তামান্না। এমন একজন সাহাবীর সন্ধান কেউ পাবেন না, যাঁর শরীরে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নেই। সাহাবীরা খুশিমনে আল্লাহর নবীর সঙ্গে দাওয়াত খেতে গিয়েছেন, কিন্তু সহস্রগুণ বেশি আগ্রহ ও আকর্ষণ নিয়ে জিহাদের ময়দানেও গিয়েছেন। অথচ পরবর্তীকালে দিনে দিনে দাওয়াত খাওয়ার সুন্নাতটি যত প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরা হলো, ইসলামের স্বার্থে সর্বস্ব কোরবানীর তামান্না, জিহাদ ও শাহাদাত-বরণের বিষয়টি ততটাই প্রবলভাবে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দাওয়াত খাওয়া, বিবাহ করা, উপহার আদান-প্রদান, পাগড়ি পরা, ঈদের মাঠে কোলাকুলি, ফুলকে ভালোবাসা নিঃসন্দেহে এগুলিও সুন্নাত। কিন্তু এই সকল সুন্নাত তখনই মহামূল্যবান হয়ে ওঠে, যখন আল্লাহর দ্বীন ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার নিরবচ্ছিন্ন সংকল্প ও সংগ্রামে মুসলমান, তার জীবন ও সম্পদ নিঃশেষে উৎসর্গ করে হলেও, নিজেকে মৃত্যুঞ্জয়ী মুজাহিদদের দলভুক্ত করে রাখে। অন্যথায় এগুলি কোনো সুন্নাতই নয়; এই সকল সহজ ও বাছা বাছা সুন্নাত এমনকি কাফের-মুশরিকরাও নিষ্ঠাসহকারে পালন করে। বলাই বাহুল্য, এই ধরনের সংগ্রাম-নিরপেক্ষ নিরাপদ সুন্নাতের পাবন্দীর মধ্যে কৃতিত্বের কিছু নেই, আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি লাভেরও কোনো সম্ভাবনা নেই।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে সুন্নাতি রাসূলুল্লাহর অর্থ হলো, রাসূল (সাঃ)এর আনীত পয়গাম এবং বিশ্বব্যাপী মানবসম্প্রদায়ের জন্য প্রদত্ত সর্বকল্যাণময় আদর্শের উত্তরাধিকার। যেহেতু মুসলমানই এই মহৎ উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে, মুসলমানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, বিশ্বকে ইসলামের নির্ভুল ব্যবস্থাধীনে নিয়ে আসা, নিয়ে আসার চেষ্টা করা ও ক্ষতিগ্রস্ত মানবসমাজের কাছে পৃথিবী-পরিচালনায় কোরআনের সংবিধানকে একমাত্র আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এই কাজে গাফেল থেকে মুসলমান অন্যসব সুন্নাতকে যতই কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরুক, তা খুব-একটা কাজে আসবে বলে মনে হয় না। ভুল হলে আল্লাহপাক মাফ করুন। কোরআন, হাদীস, আসহাবে রাসূল (সাঃ)এর জীবনী ও ইসলামের ইতিহাসপাঠে আমার যেটুকু ধারণা হয়েছে তা হলো, সঠিক ঈমান না-থাকলে আল্লাহর কাছে সহস্র রকমের সৎকর্মের যেমন এক পয়সা মূল্য নেই, ঠিক একই রকম, রাসূল (সাঃ)-আনীত মূল পয়গামের প্রতি অমনস্ক বা অন্যমনস্ক থেকে অন্য সকল সুন্নাত আঁকড়ে ধরার মধ্যে আদৌ কোনো সার্থকতা নেই। ঈমানরিক্ত সৎকর্মের মতই তা গুরুত্বহীন।

রাসূল (সাঃ) চেয়েছিলেন আল্লাহর পথনির্দেশনার আলোকে এমন একদল মানুষ তৈরী করতে, যারা হবে নির্লোভ, নির্ভীক, আল্লাহ এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গিতপ্রাণ, যারা হবে ইবলিসের জন্য অসহ্যরূপে ভীতিকর, সমাজ ও পৃথিবী-পরিচালনায় যারা হবে আল্লাহপাকের একান্ত অনুগত, সত্য ইনসাফ ও সাহসিকতায় বলীয়ান দৃঢ়চিত্ত মুজাহিদ। সুন্নাতি রাসূলুল্লাহ মানে, যতটুকু বুঝি, ইসলামের এই অকুতোভয় মুজাহিদ হয়ে-ওঠারই অব্যর্থ সবক এবং রাসূল (সাঃ)এর জীবন ও জীবনাদর্শ দেখে-বুঝে হাতে-কলমে অনুশীলন। অথচ কী বিস্ময়কর, মুসলমানের অবস্থাদৃষ্টে আজ আর মনেই হয় না, সে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আল্লাহ'র প্রিয়তম নবী (সাঃ)এর প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারপুষ্ট। তার সর্বাঙ্গে এখন শুধু জিল্লতি ও যন্ত্রণার কলঙ্কচিহ্ন। তাকে আর এখন শার্দূল বলা চলে না, সে এখন কাফের-মুশরিকদের পোষ-মানা সার্কাসের বাঘ। যাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহপাক ঘোষনা করেছেন, 'ওয়া ছাখ্খারা লাকুম মাফিছ্ ছামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদি জামিয়াম মিন্হু' ভূমণ্ডল থেকে নভোমণ্ডল পর্যন্ত সবকিছু তোমাদের অধীন করে দেয়া হয়েছে (সূরা জাসিয়া); সেই মুসলমান আজ সবকিছু থেকেও নিঃসম্বল, সর্বস্বান্ত।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তোমরা যদি কোরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকো, তোমাদের ভয় নেই, চিরদিন তোমরাই বিজয়ী থাকবে। আফসোস, আমরা আজ কী-যে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরেছি, বিজয়ী থাকা-তো দূরের কথা, আজ আমরা ভয়ার্ত মূষিকের মতো বিবরবাসী, কাফের-মুশরিক-মুনাফিক-পৌত্তলিকদের অঙ্গুলিচালিত করুণ ক্রীড়নক। বিপদ বঞ্চনা জিল্লতি এসব কোনো কিছুই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না; অতএব

www.pathagar.com

মুসলমান আজ বিপদের যোগ্য বলেই বিপদগ্রস্ত। এই জিল্লতি মুসলমানের দুই হাতে উপার্জিত জিল্লতি।

হৃদয় তবু হাহাকার করে ওঠে, মুসলমান কি তার হারানো গৌরব, নেতৃত্বের আসন আর কখনো ফিরে পাবে না? মুসলিম মিল্লাতের এই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় কি অবশিষ্ট নেই? আছে। অবশ্যই আছে। কিন্তু তার আগে রাসূল (সাঃ)এর প্রতি মুহব্বতের নামে হামামী তামাশা পরিত্যাগ করতে হবে, চোখের জলে বুক-ভাসানো দোয়ার মাহফিল করে পৃথিবী-জয়ের দিবাস্বপ্ন ত্যাগ করতে হবে; পূর্ণ আনুগত্য ও আন্তরিকতা নিয়ে ফিরে আসতে হবে রাসুল (সাঃ)এর কাছে। তিনি যে-সততা, ইনসাফ ও হিম্মতের পাঠ দান করেছিলেন, জাগিয়ে তুলেছিলেন আল্লাহ'র পথে শাহাদাত-বরণের যে-অকুণ্ঠ তামান্না, মুসলমানকে আজ সেই-সুন্নাতের অনুগামী হতে হবে। মুসলিম উম্মাহ্‌র হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের এই একটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আল্লাহপাক স্বীয় অনুগ্রহে আত্মভ্রষ্ট মুসলিম উম্মাহকে আল কোরআন ও সুন্নাতি রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ইল্‌ম ও সঠিক আমল দান করুন। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লাহ বিল্লাহ।

পাক্ষিক পালাবদল : জানুয়ারি ১ম ও ২য় পক্ষ, ২০০০

www.pathagar.com

তওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত

সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবেও যাকে বলা হয় জ্ঞান বা শিক্ষা বা Knowledge, প্রায় সব ক্ষেত্রেই সেটা প্রকৃতপক্ষে ইনফরমেশন। এই ধরনের জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে কিন্তু অন্তর্জগতকে খুব-একটা আলোকিত করে না। আর এজন্য এই জাতীয় জ্ঞানচর্চার ফলে মানুষের প্রকৃত কোন রূপান্তরও ঘটে না। এই জ্ঞান তাকে অপেক্ষাকৃত একটু বুদ্ধিমান প্রাণীতে পরিণত করে মাত্র। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় যাকে ইল্‌ম বলে, সেটা আল্লাহপাকের একটা বিশেষ নেয়ামত। এই ইল্‌ম লাভের সৌভাগ্য যার হয়, বস্তুত তিনিই জ্ঞানী, ইংরাজীতে Man of wisdom। এবং যার যে-পরিমাণে এই ইল্‌মের প্রাপ্তিযোগ ঘটে, তিনি সেই পরিমাণে জ্ঞানী। এই জ্ঞান বা ইল্‌ম নবী-রাসূলরা সরাসরি আল্লাহপাকের নিকট থেকে লাভ করেন, যে-কারণে মানুষের মধ্যে একমাত্র তাঁরাই নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী। এজন্য সর্বকালেই সকল মানুষের নির্ভুল শিক্ষাগ্রহণের সঠিক পন্থা হলো সমসাময়িক নবী-রাসূলদের আনুগত্য ও অনুসরণ। আর সর্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর আগমনের পর পৃথিবীর কর্তব্য হলো জ্ঞান-আহরণ ও শিক্ষালাভের জন্য একমাত্র তাঁকেই শিক্ষকরূপে গ্রহণ করা। আমরা নানারূপ কূটতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারি; কিন্তু আমাদের জীবন ও জগৎ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃথিবী ও পরলোক, এ-সকল বিষয়ে যদি সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়, পৃথিবীকে যদি আরণ্যক জান্তবতা থেকে মুক্তি দেবার কথা ভাবতে হয়, তাহলে নি:শর্ত আনুগত্য নিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উপায় নেই। অবশ্য ইসলামের যারা প্রতিশ্রুত-শত্রু, যারা ইসলামকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, তারা যেহেতু নানা কথা বলতে পারে, অতএব কোন প্রয়োজন না-থাকা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে প্রাসঙ্গিক দু'একটি অতিরিক্ত কথা বলা জরুরি।

পৃথিবীতে মনীষীর কখনো অভাব ছিল না, এখনো নেই; এবং তাঁরা পৃথিবীকে নানামুখী শিক্ষাদানে ব্যগ্রও ছিলেন, যত্নবান ও সমধিক তৎপরও ছিলেন। কিন্তু পৃথিবী দেখেছে, তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল, কিন্তু বিস্তর ভুলও ছিল। এবং বার বার পৃথিবীকে এই ভুলের উপযুক্ত খেসারতও দিতে হয়েছে, যদিও আশাব্যঞ্জক বোধোদয় বিশেষ ঘটে-নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি, গৌতম বুদ্ধ মানুষের জ্বরা-মৃত্যু দেখে বিচলিত ও বেদনার্ত হয়েছিলেন ; তাঁর সাধনার লক্ষ্য ছিল এগুলোকে জয় করা। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি কি সমর্থ হয়েছিলেন ? না, তিনি বরং 'নির্বাণ' নামক এক দুর্বোধ্য-কুহকের মধ্যে নিজেকে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসী বহু মানুষকে শূণ্যাশ্রয়ী করে ফেললেন। বুদ্ধদেব মহাপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও দর্শন থেকে মানুষের জীবনে যথার্থ কোন উপকারী ও ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, এমন বলা

www.pathagar.com

যায় না; যে-কারণে পৃথিবীতে কোটি কোটি বৌদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু কারো জীবনেই এই ধর্মের খুব-একটা বাস্তব প্রভাব নেই। অপর একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ কার্লমার্কস। তাঁর পেশকৃত শিক্ষা ও সুসংবাদ যে কত প্রমাদবহুল, সামান্য কয়েক দশকের ব্যবধানেই তা প্রমাণিত হলো। আসলে মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি ও গবেষণাপ্রসূত কোন শিক্ষাই-যে খাঁটি নয়, সম্পূর্ণ নয় শাশ্বত নয়-এটাই বড় সত্য। কিন্তু পৃথিবীর একটি বড় দোষ হলো, সে প্রতারিত হতেই ভালোবাসে; মধুর পরিবর্তে ইবলিসের প্ররোচনায় মানবরূপী মক্ষিকাগুলো শুধু ভুলে-ভুলে বিষ সংগ্রহ করাই নশ্বর এই জীবনের আরাধ্য-কর্ম বলে বিবেচনা করে। আল্লাহপাকের অশেষ করুণা, তিনি এই অভিশাপ, ভ্রান্তির এই অক্টোপাস, বিচিত্রবর্ণ ইবলিসী কুজ্ঝটিকা, এসব থেকে মুক্তি নিয়ে মানুষ যাতে সঠিক লক্ষ্যের প্রতি নিবিষ্ট হয়ে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পারে, সেজন্য নির্ভুল শিক্ষার প্রদীপ হাতে পাঠিয়ে দিলেন এক মহান শিক্ষক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)কে।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) সমগ্র মানবসম্প্রদায়ের জন্য শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক। 'শ্রেষ্ঠতম' বিশেষণটি সঠিক হলো না; বলা উচিত, একমাত্র শিক্ষক। কে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করলো কি করলো-না, সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ; কারণ কিছু অবাধ্য অমনোযোগী ছাত্র সর্বদা ও সর্বত্রই বর্তমান। এবং এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম নয়, যারা পাঠ গ্রহণের ক্লেশ অস্বীকারকরত শিক্ষককেই সমূহ বিপদের কারণ ও রীতিমত অভিশাপ বলে গণ্য করে। অথবা এমনও হয় যে, ছাত্র তার শিক্ষককে ভক্তিশ্রদ্ধা ও মান্যগণ্য করছে, কিন্তু শিক্ষকের আদেশ-নির্দেশ তথা প্রদত্ত শিক্ষার প্রতি প্রদর্শন করছে ঘোরতর অনীহা, উপেক্ষা ও অবহেলা। অতএব রাসূল (সাঃ)-এর শিক্ষার প্রতি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ্‌র একটি বিরাট অংশসহ সারা পৃথিবীর যে অবহেলা ও আনুগত্যহীনতা, যে আত্মঘাতী দূরত্ব, তা আদৌ কোন আশ্চর্যজনক বিষয় নয়। এ-থেকে এই কথাটি বোঝা যায় যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছে সত্যের চেয়ে ইবলিসের কুপ্ররোচনা অধিক প্রিয় ও সুখদ। সে জেনেশুনেও ভুলকে ভালোবাসার মোড়কে সাজিয়ে রাখে। আসলেও মানুষ স্বভাবতই খুব অদূরদর্শী; একেবারে অবোধ প্রাণীর মতই সে তাৎক্ষণিক ও নিকটবর্তী সুখের দিকে আকৃষ্ট ও ধাবমান হতে পছন্দ করে। আর রাসূল (সাঃ)কে আল্লাহ এই ধরাপৃষ্ঠে প্রেরণই করেছিলেন এজন্য যে, ইবলিসের প্ররোচনা-তাড়িত মানুষ যেন তার আপাতপ্রিয় বিষয়সমূহ পরিহার করে স্থায়ী ও প্রকৃত কল্যাণের দিকে যাত্রা করতে পারে।

নিঃসন্দেহে রাসূল (সাঃ) সকল মানুষের জন্য একটি সর্বতোমুখী নির্ভুল শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন; সারা পৃথিবীর সকল মানুষের তিনি শিক্ষক। কিন্তু তিনি নিজে কোথা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন? তিনি যে-শিক্ষা পেশ করেছেন, তা-কি তাঁর চিন্তা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার কোন ফল ও ফসল? না, তিনি শিক্ষালাভ করেছেন সরাসরি মহান আল্লাহপাকের নিকট থেকে। এবং এজন্যই মানুষের কাছে উপস্থাপিত তাঁর শিক্ষা

www.pathagar.com

একদিকে যেমন সর্বতোভাবে নির্ভুল, অন্যদিকে মানুষের বুদ্ধি আবেগ ও অনুরাগের ক্ষুদ্রতা-সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এই শিক্ষায় না-কোন অসম্পূর্ণতা আছে, না-কোন বিকৃতি। এবং এই হেতুই রাসূল (সাঃ) শিক্ষক হিসেবে যেমন প্রশ্নহীন আনুগত্যের দাবীদার, তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাও দাবী করে একই রকম নিঃশর্ত বাধ্যতা ও আনুগত্য। এক্ষেত্রে যে-কোনরূপ সন্দেহ, সংশয় ও অস্বীকৃতি রীতিমত বেঈমানী এবং পুরোপুরি আল্লাহকেই অস্বীকার করা। মানুষ যাতে কোন অবস্থাতেই এই ধরনের আত্মবিধ্বংসী দুর্মতির শিকার না-হয়, সেজন্য খুব সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহপাক জানিয়ে দিয়েছেন, 'রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে যা দান করেন তা গ্রহণ করো; যা-থেকে নিবৃত্ত করেন তা-থেকে বিরত থাকো' (সূরা হাশর)। যাঁরা আসহাবে রাসূল, তাঁরা এ-বিষয়টি পুরোপুরি অনুধাবন করেছিলেন, সর্বান্ত:করণে পুরোপুরি মেনেও নিয়েছিলেন। এবং এজন্যই তাঁরা মহানবী (সাঃ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র, মুসলিম উম্মাহ তথা সমগ্র জগদ্বাসীর সামনে আদর্শস্বরূপ শ্রেষ্ঠতম জামাত। অলৌকিক কোন কারণে নয়, শুধু রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত ও গৃহীত শিক্ষার গুণেই এই সাহাবীরা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সর্বোচ্চ মানবিক মহত্বের শীর্ষদেশে। দুরারোগ্য হীনমন্যতাহেতু যে যতই অস্বীকার করুক, সবাই জানে আবহমান পৃথিবীর আবহমান মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সততা ইনসাফ ও বীরত্বে, প্রেমে ও মানবপ্রেমে, সাধনায়-কৃচ্ছতায়, ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ও অন্যায়ের উৎখাতে, ত্যাগ ও সর্বমানবিক মমতা ও দায়িত্ববোধে উদ্দীপিত এই সাহাবীরাই ধরাপৃষ্ঠে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

পবিত্র কোরআনের ভাষায় রাসূল (সাঃ)-এর যে-নিজস্ব পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে, তাহলো 'ওয়ামা আনা ইল্লা নাজীরুম মুবীন'-আমি একজন প্রকাশ্য সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র (সূরা আহকাফ)। প্রকৃত শিক্ষকের তো এটাই কথা, এটাই কাজ; ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের প্রভেদ বুঝিয়ে দিয়ে তিনি আলো ও কল্যাণের প্রতি অমনোযোগ ও অনীহার যে-ভয়াবহতা, যে-মারাত্মক পরিণতি, সে-বিষয়ে সতর্ক করবেন। রাসূল (সাঃ) আমৃত্যু এই কাজটিই করেছেন। এবং সমগ্র মানববংশের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র শিক্ষক, যিনি কেবল শিক্ষার বিষয়াদি বর্ণনা করেন-নি, সমস্যা ও সমাধানের একটি শুধু তাত্ত্বিক-লেখচিত্র অঙ্কন করেন-নি, নিজের জীবন ও কর্ম দিয়ে পেশকৃত-শিক্ষার একটি হুবহু ব্যবহারিক-বাস্তব রূপও স্থাপন করেছেন। এবং এই নমুনা এত প্রাঞ্জল ও সর্বগ্রাহ্য ও শাশ্বত যে, অনাগত কালের যে-কোন শিক্ষার্থী রাসূল (সাঃ)কে না-দেখেও সঠিক পথনির্দেশনা পেতে পারে; এমনকি কোন মুহাদ্দিস-মুফাস্‌সিরের সহায়তা ছাড়াই পেতে পারে। রাসূল (সাঃ)-এর শিক্ষার এ-এক বিরাট মোযেজা যে, এই শিক্ষা সকল মানুষের জন্য এমন সহজভাবে অবারিত, যা-থেকে আলো নিয়ে নিজেকে আলোকিত করতে কারো কোন বাধা কি অসুবিধা নেই। উপমাস্বরূপ বলা যায়,

www.pathagar.com

সূর্যালোকের মত স্বতঃবিকীর্ণ; যে-আলোকধারা থেকে স্বেচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে না-রাখলে, প্রয়োজনীয় উপকার পেতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

যাই হোক, এই প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, রাসূল (সাঃ)-এর মৌলিক শিক্ষাটি কী? অর্থাৎ তিনি জগদ্বাসীর জন্য আল্লাহপাকের নিকট থেকে কোন্ শিক্ষার পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন? বলাই বাহুল্য, তিনি না কবি ছিলেন, না বৈজ্ঞানিক। তিনি ভবিষ্যদ্বক্তাও ছিলেন না। কেউ কেউ তাঁকে যাদুকর বলে ধারণা করতো বটে, কিন্তু কোন অলৌকিক ঈন্দ্রজাল রচনার কলাকৌশল তাঁর আদৌ জানা ছিল না। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন না, সমুদ্রবিজ্ঞানীও ছিলেন না। এবং আজ পুরো আরব্যভূমির বক্ষ বিদীর্ণ করে যে-তরল স্বর্ণের মহাসমুদ্র জেগে উঠেছে, রাসূল (সাঃ) সেই অফুরন্ত গুপ্তধনের কথাও বলে যান-নি। আসলে তিনি ছিলেন মানুষকে মানুষরূপে গড়ে তোলার একজন অব্যর্থ শিক্ষক। বাবুই পাখিদের মত বাসা থেকে ধানক্ষেত এবং ধানক্ষেত থেকে বাসা, এ-রকম নয়; মানুষ যেন নিজেকে এক বিশাল প্রেক্ষাপটে রেখে আত্মদর্শন ও আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে, নিজেকে নিজের সঠিক পরিচয়ে চিনতে পারে, রাসূল (সাঃ) এই শিক্ষাই দান করেছেন। মানুষের জন্য ধনাঢ্যতা কোন বিবেচ্য পদার্থ নয়, দৈহিক আরামের উপকরণসমূহও নয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ-সব যে-কোন অমানুষেরও আয়ত্বাধীন হতে পারে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই-ই হয়। রাসূল (সাঃ)এর শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মানবিক যোগ্যতা, মানবিক উৎকর্ষ ও মানবিক ঋদ্ধি। মানুষ যদি মানুষ হতে ব্যর্থ হয়, মানুষের স্বাভাবিক সুকুমার বৃত্তিগুলো যদি নিঃসাড় হয়ে থাকে, সে যদি প্রবৃত্তির বন্দীদশা থেকে মুক্তি না পায়, তাহলে শুধু বস্তু-সম্পদের অজস্রতা দিয়ে কোন লাভ নেই। লাভ-তো নেই-ই, বরং এই ধরনের ধনবান অমানুষদের দ্বারা অধ্যুষিত পৃথিবী প্রায় জাহান্নামের মতই অগ্নিগর্ভ। অতএব প্রবৃত্তির দাসত্ব-লাঞ্ছিত এক-একটি অভিশপ্ত মানুষকে তিনি চেয়েছিলেন এক একটি আশীর্বাদের ইউনিটে পরিণত করতে, যাদের সামষ্টিক পদচারণায় মুখর এই মাটির পৃথিবীতে অবতরণ করবে জান্নাতুল ফিরদাউস।

আমরা জানি, কাফের-মুশরিকরাও জানে, রাসূল (সাঃ)-এর এই অভিপ্রায় ও চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি; তিনি শতকরা একশ' ভাগ সাফল্য অর্জন করেছেন। এবং তাঁরই শিক্ষা ও শিক্ষকতার গুণে জনবিরল আরবভূমিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের এমন একটি সমাজ বিনি-র্মিত হলো, যে-সমাজ সহস্র সহস্র বৎসরের মানবেতিহাসে আদর্শ মানবগোষ্ঠীর এক অভাবনীয় নমুনা। একটি মানুষ ভুলক্রমেও মিথ্যা কথা বলে না, হিংসা, অশ্লীলতা বেইনসাফীর গন্ধমাত্র নেই, চুরি-ব্যভিচার-দস্যুতা, স্বার্থান্ধতা কোন কিছু নেই, এবং এই মূর্খ মূর্তিপূজকদের দেশে এমন একটি মানুষ নেই, যে আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় আর কাউকে ভয় পায়। সত্যই কল্পনাতীত; সত্যই মানবতার সর্বোচ্চ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ একটি অনবদ্য মানবসমাজ। মাত্র কিছুদিন আগেও ছিল যারা সর্বাধিক পাপে পরিকীর্ণ এক পঙ্কিল

www.pathagar.com

অন্ধকার জগতের বাসিন্দা, কোন্ অলৌকিক আলোর স্পর্শে সেই আপাদমস্তক মূর্খ ও বধির এবং অন্ধ মানুষগুলোই রূপান্তরিত হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানবসন্তানে। দ্বিতীয় কোন রহস্য নেই, রহস্য একটাই, তারা এক মহান শিক্ষকের কাছে পাঠ-গ্রহণের সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেছে। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ)এর শিক্ষার গুণেই, যারা এতদিন ছিল অবহেলায় পরিত্যক্ত মরচে-ধরা লৌহখণ্ড, তারাই হয়ে উঠলো এক-একটি শানিত অব্যর্থ জুলফিকার। কারো অজানা নয়, ঘনঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন এক জাহেলিয়াতের মধ্যে রাসূল (সাঃ)-এর আগমন; ইতিহাস বলছে, আইয়ামে জাহেলিয়াত। এমন প্রচণ্ড জাহেলিয়াত যে, হজরত উমার ফারুক (রাঃ)-এর মত মেধাবী ও প্রজ্ঞাচক্ষু মানুষেরও ইসলাম ও রাসুল (সাঃ)কে চিনতে পাঁচবছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। সর্বাধিক নিকৃষ্ট এই সমাজের গাফেল ও দুর্ধর্ষ ও গন্তব্যহীন প্রাণীগুলিকে তিনি-যে সর্বোচ্চ গুণাবলীতে পৃথিবীর সামনে আদর্শরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন, তার মূল রহস্য হলো, পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ও অভ্যস্ত দুরারোগ্য শির্কের স্থলে একটি সত্য-বিশ্বাসকে তিনি সর্বপ্রথম এদের মধ্যে জীবন্ত করে তুললেন। এই বিশ্বাসটি হলো, তওহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের প্রতি নিশ্ছিদ্র বিশ্বাস। আল্লাহপাক সর্বজ্ঞ; মানুষের রোগব্যাধি ও তার সঠিক নিরাময়ের উপায় সম্পর্কে আল্লাহ অপেক্ষা ভালো আর কে জানে! অতএব আল্লাহপাক কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় রাসূল (সাঃ) যে-চিকিৎসা শুরু করলেন, সময় যাই লাগুক, সমাজদেহে যত অস্থিরতাই সৃষ্টি হোক, চিকিৎসার সাফল্য সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন।

এটাই সত্য যে, মানুষের যা-কিছু নৈতিক অধঃপাত ও কদাচার, তা বস্তুত কোন মৌলিক রোগ নয়, রোগের বহির্লক্ষণ। প্রকৃত রোগ হলো, তওহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের প্রতি ধারণাহীনতা ও বেপরোয়া অবিশ্বাস। এটাই রোগ। এ-থেকে নিরাময় করা গেলে, পৃথিবীকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করা খুব কঠিন কাজ নয়। আধুনিক এই পৃথিবীকে আজ-যে কিছুতেই পথে-আনা সম্ভব হচ্ছে না, তার একমাত্র কারণ হলো, তওহিদ ও আখেরাত সম্পর্কে এই পৃথিবী একেবারেই গাফেল। শিরক এবং সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাস এত কঠিনভাবে মানুষকে অধিকার করে নিয়েছে যে, এটা উৎখাত করা না-গেলে কোন ঔষধেই কোন কাজ হবে না। এটা অত্যুক্তি নয়, এটা পরীক্ষিত সত্য। অতএব আল্লাহর নির্দেশক্রমে রাসূল (সাঃ) সর্বপ্রথমে তওহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি বললেন-না, তোমরা দস্যুতা ও হানাহানি পরিত্যাগ করো, মিথ্যা, অশ্লীলতা, মদ্যপান ইত্যাদি পরিত্যাগ করো। তিনি বললেন, 'শিরক মূর্তিপূজা এ-সব ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করো একমাত্র আল্লাহর কাছে; আমি আল্লাহর রাসূল, আমাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নাও; আর এতদ্সঙ্গে মৃত্যু-পরবর্তী অনন্ত আখেরাতের জিন্দিগীকে বিশ্বাস করো এবং সেই আখেরাতের কঠিন

www.pathagar.com

জবাবদিহিতা ও জান্নাত-জাহান্নামের ফয়সালাকে ভয় করো'। এভাবেই শুরু হলো শিক্ষাদান ও চিকিৎসা। এই শিক্ষা ও চিকিৎসায় যাঁরা সাড়া দিলেন তাঁরা সৌভাগ্যবান। সকল পাপ ও নীচতা দূরীভূত হয়ে তাঁদের অন্তর্লোক অচিরেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো এক পরম আলোর বন্যায়। এঁদো-পুকুরের থলথলে পাতিহাঁস মুহূর্তমধ্যে রূপান্তরিত হলো এক-একটি সোনালী-ডানার বিমানবিহারী বিহঙ্গে। অন্ধকারের কোন অস্তিত্বই আর অবশিষ্ট থাকলো না। এরপর রাসূল (সাঃ) মহিমান্বিত কুরআনের আলোকে যতদিকের যত শিক্ষা দিলেন, কোন একটি বিষয়ও আর ব্যর্থ হলো না।

আসলে শির্ক হলো সর্বাপেক্ষা কুৎসিত ব্যাধি, যা-থাকলে ন্যূনতম সুস্থতাও আর আশা করা যায় না। অন্তর থেকে শির্ক দূরীভূত হলে বহু পাপ এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়ে ও জীবন থেকে মৃত-পত্রের মত ঝরে যায়। অপর বিষয়টি হলো আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস ও ভয়, যা না-থাকলে মানুষ খুব সহজেই নরপশুতে পরিণত হতে পারে। আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হওয়া ও জবাবদিহির ভয় থেকে যে-মানুষ মুক্ত, এমন কোন পাপকর্ম নেই যা-করা তার পক্ষে অসাধ্য। এজন্যই রাসূল (সাঃ) সর্বাগ্রে তওহিদ এবং আখেরাত, এই দু'টি বস্তু তাঁর সাহাবাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিলেন। ইসলামের এটাই বুনিয়াদী শিক্ষা; এবং রাসূল (সাঃ) যোগ্যতম শিক্ষক হিসেবে প্রথম এই বুনিয়াদেরই শিলান্যাস করেছিলেন। বলাই বাহুল্য, জীবনে এমন কিছু নাই, যা রাসূল (সাঃ) শেখান নি। দাঁতন-করা থেকে শুরু করে জিহাদের ময়দানে অকুতোভয়ে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে অবিচলিত থাকা, সংসারযাত্রা নির্বাহ থেকে রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-কানুন, জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ খুঁটিনাটি সবকিছু তিনি শিখিয়েছেন। আমাদের একজন আধুনিক লেখকের ভাষায়, 'সন্ধি-চুক্তি, কূটনীতি, যুদ্ধনীতি, মানবাধিকার ঘোষণা, মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, ধন-সম্পদের নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, একের প্রতি অন্যের অধিকার ও দায়, মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য, নারীর হক, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, ন্যায়বিচারের মানদণ্ড, স্বাস্থ্যনীতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে রুচিসম্মত খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, স্যানিটেশন এক কথায়—আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক যুগে সভ্য মানুষের সকল ইতিবাচক আচরণ' সবই আল্লাহর নবীর প্রদত্ত শিক্ষার প্রত্য অবদান। (মুসলিম উম্মাহ : বিগত সহস্রাব্দের সাফল্য-ব্যর্থতা আগামী শতকের দায়বদ্ধতা ও প্রত্যাশা-মাসুদ মজুমদার)। মানুষ স্বভাবতই বড় কৃতঘ্ন; এজন্যই রসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা নিয়েই অনেক মানুষ আজ তাঁরই বিরুদ্ধে নিরন্তর শরবর্ষণ করে চলেছে। অথচ অতি-বড় অনুসন্ধিৎসু গবেষকও এমন একটি বিষয় উদ্ধার করতে পারেন না, যা রাসূল (সাঃ)এর শিক্ষাক্রমের মধ্যে নেই, যেখানে পৃথিবী আকণ্ঠ ঋণী নয়। এমনকি ইসলামের সংস্পর্শে আসার আগে, ইউরোপ এবং আমাদের এই বৈদিক-সভ্যতাস্নাত ভারতবর্ষের বাথরুম-কনসেপশন পর্যন্ত ছিল না। অর্থাৎ

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক ক্রিয়াদি-যে লোকচক্ষুর আড়ালে সম্পন্ন করতে হয়, মানুষ এটাও জানতো না। আসলে নৈতিকতা, মানবতা, ইনসাফ ও পবিত্রতা, শ্লীলতা, সভ্যতা ও পরিমিতিবোধের যা-কিছু শিক্ষা, তা-সবই পৃথিবী সম্পূর্ণ ও যথাযথরূপে লাভ করেছে রাসূল (সাঃ)-এর কাছে। আর এই শিক্ষার অব্যর্থতা ও মহিমা-যে কত গভীর ও সর্বতোমুখী, তার প্রকৃষ্ট নমুনা হলো আসহাবে রাসূল (সাঃ), যাঁদেরকে হাদীসে 'নক্ষত্রসদৃশ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু এতদ্সঙ্গে এটাও সর্বাংশে সত্য যে, কোন কিছুই সার্থক ও ফলপ্রসূ হতে পারতো না, যদি তওহিদ, রেসালাত ও আখেরাতকে সকল শিক্ষার প্রাথমিক ও দৃঢ়ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা না-হতো।

বিশ্বে এখন কোনদিক থেকেই কোন অভাব নেই; সবদিক থেকে প্রাচুর্য উপচে পড়ছে। আর এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, এত গ্রন্থ, এত অসংখ্য গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়, এত মনীষীপ্রতিম শিক্ষক, শিক্ষার এমন জমজমাট আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা পৃথিবী পূর্বে কখনো দেখে-নি, কখনো কল্পনাও করে-নি। অথচ কী দুর্ভাগ্য, পৃথিবীব্যাপী এত হাহাকার, এত ভয়, ক্ষুধা, অভাব ও দারিদ্র্য, মানবতার এত অপমানও পৃথিবী ইতোপূর্বে কখনো দেখে-নি। উল্লেখ করতে পারি, মানুষের এমন গগনবিদারি আর্তনাদ ফেরাউনের রাজত্বেও ছিল না। কদাচার, অশ্লীলতা, মিথ্যা চালাকি শোষণ, লুণ্ঠন ইত্যাদি আজ এমন সাংঘাতিক পর্যায়ে পৌঁচেছে, যা-দেখে এমনকি ইবলিস পর্যন্ত লজ্জায় ও নিশ্চিন্তে অবসর গ্রহণের কথা ভাবছে। এই হলো আধুনিক পৃথিবীর শিক্ষা ও শিক্ষকদের 'অমূল্য' অবদান। আফসোস, এমন শিক্ষাই আজ পৃথিবীকে অধিকার করে বসলো, যা অর্জন করে শিক্ষিতজনেরা অধিকাংশই এখন হয়ে উঠলো এক-একজন কুশলি ধুরন্ধর প্রতারক। মানুষের পক্ষে কত-বেশি স্বার্থপর ও মানববিদ্বেষী এবং প্রবৃত্তির কতখানি বিনীত কিংকরে পরিণত হওয়া সম্ভব, শিক্ষা এখন সযত্নে সেই-শিক্ষাই দিচ্ছে। পৃথিবীতে এখনো যে-দু'একজন প্রকৃত মানবপ্রেমী অবশিষ্ট আছে, কিছু কিছু মানুষ যাঁরা এখনো বিবেক ও সুস্থতা নিয়ে গোপনে গোপনে জেগে আছেন, তাঁরা এই সত্য ব্যক্ত না-করে আর পারছেন-না যে, কুশিক্ষা-প্লাবিত নৈতিকভাবে দেউলিয়া এই পৃথিবীর পরমায়ু আর বেশি অবশিষ্ট নেই, থাকার কোন দরকারও নেই। রাসূল (সাঃ) বহুদিন আগে এই কথাই বলেছিলেন, 'কুশিক্ষিত ব্যক্তিই নিকৃষ্ট'; বলেছিলেন, 'কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে নিকৃষ্টতম জনগোষ্ঠীর উপর'। কে জানে, রাসূল (সাঃ)-এর শিক্ষার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে মানুষ হয়ত সেই কেয়ামতকেই ত্বরান্বিত করে তুলছে।

বিধর্মীদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু মুসলমানের আজ কী হলো? কী আশ্চর্য, রাসূল (সাঃ)-এর কোন শিক্ষারই কোন প্রভাব কি গুরুত্ব আজ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে পরিদৃষ্ট হচ্ছে না। বরং অবস্থা এত করুণ যে, তার জীবন ও জীবনবোধ এখন পুরোপুরি রাসূল (সাঃ)-এর শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন ও সাংঘর্ষিক। কোন কাজেই সে আর এখন রাসূল (সাঃ)-এর আনীত ও প্রদত্ত শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করে না, করার প্রয়োজনও অনুভব করে

www.pathagar.com

না। ফলত, মানবিক সকল গুণ আজ মুসলমানের মধ্য থেকে প্রায় পুরোপুরিই নিষ্ক্রান্ত। সে এখন মিথ্যা, অন্যায় ও অশ্লীলতার সঙ্গে সখ্যস্থাপনে বিধর্মীদের চেয়েও সহস্রগুণ উৎসাহী ও বেপরোয়া। সকল সৎগুণ ও কল্যানবুদ্ধি থেকে মাহরুম, সম্মান ও সম্ভ্রহীন বিশাল এই মুসলিম মিল্লাত সারা পৃথিবীর আজ করুণা ও কৌতুকের পাত্র। কিছু ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু সে-সব নিতান্তই ব্যতিক্রম। প্রকৃত অবস্থা হলো, রাসূল (সাঃ)-এর অব্যর্থ শিক্ষার ঐশ্বর্য নিয়ে একদিন যে-মুসলমান জাহেলিয়াতের কঠিন অন্ধকার থেকে আলোর জগতে বেরিয়ে এসেছিল, সমগ্র পৃথিবীকে দেখিয়েছিল আলোকোজ্জ্বল সাফল্যের নির্ভুল পথরেখা, কী বদনসীব, দিনে দিনে আবার সেই জুলমাত-জাহেলিয়াতের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করেছে মুসলমান। তার অধঃপাত আজ এমনই বহুমুখী, এতই অসৎ ও কুৎসিত তার জীবনাচার যে, মুসলমান-তো নয়-ই, সে এখন মনুষ্যরূপে গণ্য হবারও অযোগ্য। অথচ এ-রকম-তো হওয়ার কথা ছিল না; সত্যই বদনসীব, যা হবার নয়, তাই হলো।

এই প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক যে, সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষকের শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকার নিয়েও মুসলমান আজ কী-কারণে এমন সর্বগ্রহ দুর্গতির শিকার? ছোটখাটো এবং আনুষঙ্গিক কারণ অনেক আছে; কিন্তু মূল কারণ প্রকৃতপক্ষে একটাই, সেটা হলো রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত বুনিয়াদি শিক্ষা থেকে মুসলমান আজ সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তওহিদের বাণী তার কাছে আজ সর্বাপেক্ষা শ্রুতিকটু ও নিরর্থক একটি উপদ্রব। মূর্তিপ্রিয়তা এবং নানারকম শির্ক তাকে এমন অক্টোপাসের মত আঁকড়ে ধরেছে যে, সে এখন মূর্তিপূজক মুশরিকদের চেয়েও অনেক বড় মুশরিক। অন্যদিকে রেসালাত, সহজ ভাষায় যাকে বলা যায় রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও আনুগত্য, সেই বিষয়টিও মুসলমানের কাছে আজ আর বিশেষ গুরুত্ব বহন করে না। বরং ক্ষেত্রবিশেষে এমন মারাত্মক ও অমার্জনীয় বিবেচনার প্রকাশ ঘটছে, যা-দেখেশুনে বিধর্মীরা পর্যন্ত হতবাক। অনেক মুসলমান আজ বেঈমানীর এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত যে, রাসূল (সাঃ)কে নেহেরু কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করতেও কোনরূপ দ্বিধাবোধ করছে না (নাউজুবিল্লাহ্)। এদের সংখ্যা বেশি নয় সত্য, কিন্তু চিৎকার করবার শক্তি অপরিসীম। আর যারা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর মুহাব্বতে উন্মাদ ও আত্মহারা, তাদেরও প্রেম যতটা মৌখিক ও পোশাকী, তার এক সহস্রাংশও খাঁটিভাবে আন্তরিক নয়; যে-কারণে তারা দরুদ শরীফের মধ্যে কামালিয়াত অনুসন্ধানে যতটা ব্যগ্র ও তৎপর, রাসূল (সাঃ)-এর শিক্ষা ও ফয়সালা-গ্রহণে ততটাই পরাঙ্মুখ। অর্থাৎ তওহিদের মত রেসালাতের প্রতি বিশ্বাসও আজ মুসলিম উম্মাহ্র কল্ব থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। আর আখেরাতের কথা উত্থাপন না-করাই উত্তম। আখেরাত ও আখেরাতের জবাবদিহিতার প্রশ্নে মুসলমানের মধ্য থেকে ভয় ও বিশ্বাস দুটোই এমনভাবে হ্রাস পেয়েছে, যা তাকে পরিণত করেছে কট্টর নাস্তিকে। যদিও কারো কারো মধ্যে আখেরাত

www.pathagar.com

নিয়ে সামান্য কিছু উদ্বেগ অবশিষ্ট আছে, কিন্তু সেই উদ্বেগ তারা প্রশমিত করছে রাসূল (সাঃ)-এর সম্পূর্ণ বিপরীত ও অননুমোদিত পন্থায়, মাজার-পূজা, পীর-পূজা, আখেরি-মোনাজাত ইত্যাদি বিদআত ও গর্হিত ধরনের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। সমূহ পরিতাপেরই কথা, রাসূল (সাঃ) শেখালেন কী, আর মুসলমান এখন করছে কী!

যাই হোক, উপসংহারে যা বলতে চাই তাহলো, রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত যে-বুনিয়াদি শিক্ষা-তওহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস-সেই শিক্ষা ও সম্পদের সঙ্গে মুসলমানের আজ আর কোন সংশ্রব নেই। অতএব মুসলমান আর মুসলমানও নেই। আর এজন্যই জন্মগতভাবে গগনচুম্বী মর্যাদার উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও, শুধু আত্মঘাতী-আত্মভ্রষ্টতার কারণে মুসলমান আজ দ্বিগুণ জিল্লতী দ্বারা আক্রান্ত; সে এখন পৃথিবীর করুণাপ্রার্থী, পঙ্গু, অথর্ব, আত্মসম্মানহীন এক বিপন্ন মিল্লাত। অবশ্য এটা কোন আকস্মিকভাবে নেমে-আসা গজব নয়, এটা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের শিক্ষাকে অবহেলা করারই স্বাভাবিক পরিণতি। কারণ মুসলমান হয়ে মুসলমানিত্বকে অবজ্ঞা ও পরিহার করা, কাফের-মুশরিকদের প্রতি ঝুঁকে পড়া একটি অমার্জনীয় অপরাধ। আর এই অপরাধের কী-শাস্তি, সে সম্পর্কে আল্লাহপাক বহু পূর্বেই বলে দিয়েছেন, 'যদি এরূপ হতো, তাহলে আমি তোমাকে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থা করতাম; তারপর আমার মোকাবিলায় তোমার কোন সাহায্যকারী মিলতো না' (সূরা বনি ইসরাইল)। ভয়াবহ শাস্তির এমন অগ্রিম ঘোষণা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ্-যে কী-ভাবে ও কোন্ সাহসে রাসূল (সাঃ)-এর মূল শিক্ষা থেকে ছিটকে পড়লো, এ-এক বিস্ময়।

অবশ্য নৈরাশ্য আল্লাহপাক পছন্দ করেন-না; এবং আল্লাহপাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া একটি গর্হিত অপরাধ। অতএব এই আশা আমরা রাখতে পারি যে, পুরোপুরি আল্লাহর অনুগ্রহ বঞ্চিত না-হলে এই অধঃপতিত মুসলিম উম্মাহর হয়ত বোধোদয় ঘটবে। আল্লাহপাকের কী-অপার রহস্য, পৃথিবীতে ইসলাম-বৈরিতা বাড়ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের প্রতি আকর্ষণও বাড়ছে। অতএব পুরোপুরি আশাহত না-হয়ে আমরা একটি সুস্থ, নিরাপদ ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারি। এবং এটা আদৌ অবাস্তব নয় যে, মুসলিম উম্মাহ-তো বটেই, পুরো পৃথিবীই একদিন রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত যে-বুনিয়াদি শিক্ষা, সেই শিক্ষার কাছে ফিরে আসবে, আসতে বাধ্য হবে। কারণ অতি-বড় মদ্যপায়ীরও একসময় বমনোদ্রেক হয়, মদির মনোরম পানপাত্র থেকে ইচ্ছা জাগে মুক্তি গ্রহণের। কুফর ও শির্কের বিষে আপাদমস্তক জর্জরিত পৃথিবীর এখন বুকভরা বিবমিষা। আত্মবিক্রীত কিছু বুদ্ধিজীবী নামক গন্ধমূষিক তারস্বরে যত চিৎকারই করুক, দুর্বহ পাপ ও গ্লানিতে জর্জরিত পৃথিবী এখন এক নতুন-পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছে। তওহিদ, রেসালাত ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসপুষ্ট সেই পৃথিবীই আমাদে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের পৃথিবী।

পাক্ষিক পালাবদল : ১ম ও ২য় পক্ষ জুন, ২০০০

www.pathagar.com

রাসূল প্রেম : একটি অপ্রিয় সমাচার

রাসূল (সাঃ)-এর কথা বলছি; কেউ কেউ তাঁকে বিলম্বে-অবিলম্বে চিনতে পেরেছেন, তাঁরা সৌভাগ্যবান। কিন্তু অনেক মানুষই তাঁকে চিনতে পারে-নি, বুঝতেও পারে-নি। এবং মানুষের এই দুর্ভাগ্য ও অক্ষমতা রাসূল (সাঃ)-এর আবির্ভাবকালে যেমন ছিল, আজও একইভাবে বিদ্যমান। এজন্যই সকলের বুঝবার সুবিধার্থে অশেষ করুণাবশত আল্লাহপাক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, 'ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লিল আলামীন'-আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি (সূরা আম্বিয়া)। এবং তিনি-যে সত্যই পরম রহমতস্বরূপ প্রেরিত, এবং তিনি-যে সত্যই শাশ্বত-অব্যর্থ আশীর্বাদ, এই বিষয়টি যাতে সম্যক অনুধাবন করা সহজ হয়, এজন্য আল্লাহপাক এইকথাও এরশাদ করেছেন, 'ওয়া মাকানাল্লাহু লিইউয়াজ্জিবাহুম ওয়া আন্তাফিহিম'; আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা-অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না (সূরা আনফাল)। মানুষ তাঁকে প্রথমদিকে পাগল বলেছে। আল্লাহপাক জবাবে বলেছেন, 'ওয়ামা সাহিবাকুম বিমাজনূন'- তোমাদের সঙ্গী পাগল নয় (সূরা তাকবীর)। আল্লাহপাক আরো এরশাদ করেন, 'নূন ও কলম এবং ফেরেশতাদের কলম-চালনার শপথ, আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি বিকৃতমস্তিষ্ক নন। নিশ্চয়ই আপনার জন্য নির্ধারিত আছে অপরিমিত পুরস্কার। এবং নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের কথায় ব্যথিত হবেন-না; শীঘ্রই দেখতে পাবেন, তারাও দেখবে, কে আপনাদের মধ্যে বিকৃতমস্তিষ্ক' (সূরা কালাম)। এই সকল ঘোষণা থেকে সমকালীন ও পরবর্তীকালের কাফের-মুশরিকদের মধ্যে বোধোদয় ঘটা উচিত ছিল, কিন্তু সকলের নসীব সমান নয়। কেউ কেউ তাঁকে বুঝতে পেরে ইসলামে প্রবেশ করেছে; কারো কারো বদনসীব, তারা বুঝতেই পারে নি, এখনো পারে না। অবশ্য মুসলমানের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন সমস্যা নেই, থাকার কথাও নয়; কারণ রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা দৃঢ় না-থাকলে ঈমানও থাকে না, মুসলমানও থাকা যায় না। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি, আর যাই হোক, কোন মুসলমানের মধ্যে অন্তত রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসে কোনরূপ ঘাটতি নেই। কিন্তু যথেষ্ট পরিতাপের কথা, সাহাবা (রাঃ)দের যামানা অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই মুসলমানদের মধ্যে ধীরে ধীরে এমন অনেক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে, যা-কেবল অনভিপ্রেতই নয়, রীতিমত বিস্ময়কর, রীতিমত আতঙ্কজনক। বর্তমান প্রবন্ধে সেই সকল দুঃখবহ সমস্যার দিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করতে চেষ্টা করবো।

রাসূল (সাঃ) রাহমাতুল্লিল আলামীন, এ-কথা আমরা জানি; এবং যেহেতু আল্লাহপাকের ঘোষণা, সর্বান্ত:করণে স্বীকার করি, বিশ্বাসও করি। কিন্তু কী-অর্থে ও কোন্ অর্থে তিনি বিশ্বজগতের আশীর্বাদ, তা-কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? দেখি-

www.pathagar.com

নি। দেখলে, পৃথিবীর যাই হোক, মুসলমানের অন্তত দুর্বিষহ অভিশপ্ত জীবনের গ্লানি বহন করে বেড়াবার কথা নয়। যাঁর উপস্থিতির কারণে এমনকি নিখাদ কাফেররাও আল্লাহপাকের গজব থেকে নিরাপত্তা লাভ করে; অথচ তাঁর প্রত্যক্ষ উম্মত হয়েও, তাঁর পবিত্র নামের মহিমা দিবারাত্রি উচ্চারণ করা সত্ত্বেও আমরা আজ আল্লাহর গজবের নির্ভুল লক্ষ্যস্থলে পরিণত। আমরা কি তাহলে কাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট? আমরা কি আল্লাহর কাছে এতই অপ্রিয় ও বিরাগভাজন যে, তিনি পৃথিবীকে আমাদের জন্য কারাগারের মত সঙ্কুচিত করে দিলেন? রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি আমরা-যে এত মুহাব্বত পোষণ করি, প্রেরণ করি এত দরুদ ও সালাম, তার কি কোন মূল্যই নেই? এই সকল প্রশ্নের জবাব, কোন সন্দেহ নেই, আমরা আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে খুঁজে পাবো।

রাসূল (সাঃ)কে আমরা ভালোবাসি; কিন্তু সেই ভালোবাসার মধ্যে অন্ধ আবেগ যতটা আছে, সে-তুলনায় অর্থবহ কোন বাধ্যতা ও আনুগত্য (Obedience) প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ আমাদের এই ভালোবাসা পুরুষানুক্রমে-বাহিত একটি সংস্কার মাত্র, যার মধ্যে সারবস্তু বলে কিছু নেই। রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি মুহাব্বতের নামে আমরা আমাদের অজ্ঞতাবশত অথবা পার্থিব সুবিধার্থে, প্রাণশক্তি ও তাৎপর্য-বিবর্জিত এক ধরনের খোলস তৈরী করে নিয়েছি। আমাদের আর কিছু নেই, এই মনোরম খোলসটাই শুধু সম্বল। এজন্যই রাসূল (সাঃ)-এর কোন নিষেধ-নির্দেশের প্রতি মনোযোগী হওয়া নয়, আমাদের মুহাব্বত প্রকাশের একমাত্র ভাষা হলো দরুদ শরীফ। এবং এই হেতুই আমরা শত শত বার দরুদ শরীফও পাঠ করি, আবার একই সঙ্গে শত সহস্রবার তাঁর আদেশ-নিষেধকে অবজ্ঞা করি নির্ভয়ে ও নির্বিকারভাবে। এ-এক আত্মঘাতী কুৎসিত স্ববিরোধিতা। রাসূল (সাঃ)-এর আনীত পয়গাম সম্পর্কে এই ধরনের গাফেল, মূঢ় ও অজ্ঞ মুসলমানের চেয়ে এমনকি নিরেট কাফেরও অনেকগুণে উৎকৃষ্ট। কারণ আশা করা সম্ভব, কাফের কখনো রাসূল (সাঃ)-এর পয়গামকে গ্রহণ করতেও পারে, এবং ইতিহাসে এমন সাক্ষ্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমানও বটে। কিন্তু পুণ্যজ্ঞানে পাপ, বিদআত ও শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত কোন মুসলমান সহজে উদ্ধার পেয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। যে-মানুষ অন্ধকারে আছে, কোন-না-কোনভাবে তার মধ্যে আলোর জন্য তীব্র পিপাসাও আছে; কিন্তু যার কাছে অলীক-আলেয়াই হলো আলো, তার পক্ষে প্রকৃত-আলোর সন্ধানলাভ শুধু কঠিন নয়, একেবারে অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। যাই হোক, এই সকল কথা লিখতে হচ্ছে এজন্য যে, এটা-তো সত্য, ইসলাম সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। অর্থাৎ ইসলাম কী বলে, কী তার দাবী ও তাৎপর্য সে-সম্পর্কে আমরা ছিলাম একেবারেই অজ্ঞ ও বেখবর। এবং এটাও সত্য যে, আমরা-তো ইসলামকে জিব্রাইল ফেরেশতার নিকট থেকে পাই-নি, পেয়েছি রাসূল (সাঃ)-এর নিকট থেকে। অতএব রাসূল (সাঃ)-এর নিঃশর্ত অনুসরণের নামই-যে ইসলাম, এ-নিয়ে কোন সংশয় থাকার কথা নয়। সংশয়

www.pathagar.com

আসলে নেইও। কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের উপলব্ধি ও আমলে এক ধরনের বিপজ্জনক ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর এই ভ্রান্তিগুলো দিনে দিনে এতই দৃঢ়তা লাভ করেছে, যা-থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ।

মানুষের একটি বড় সমস্যা হলো, কোন বিশ্বাসকে একবার আঁকড়ে ধরলে, তার অসারতা ও অন্ত:সারশূন্যতা যতভাবেই প্রমাণিত হোক, সেই বিশ্বাসকে মানুষ সহজে পরিত্যাগ করতে পারে না। আমার এক বন্ধুর বিশ্বাস, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ছিলেন যে-কোন মানদণ্ডে একজন অমিত-প্রতিভাবান মনীষী, যিনি স্বীয় প্রতিভাবলে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছেন। অপর এক বন্ধু, তিনিও উচ্চশিক্ষিত, তাঁর বিশ্বাস হলো–রাসূল (সাঃ) এসেছিলেন মানুষকে পুরোপুরি পার্থিবতামুক্ত করার কাজ নিয়ে; এসেছিলেন, মানুষকে পৃথিবী-নিরপেক্ষ এক নির্বিকার সর্বংসহা পরহেজগার বানাবার পয়গাম ও লক্ষ্য নিয়ে। বলা বাহুল্য দুটোই ভুল। প্রথম ভুলটি বুদ্ধিবৃত্তিক; এবং দ্বিতীয়টি হলো, ইসলামকে আদৌ না-বুঝবার একটি স্বাভাবিক প্রমাদ ও পরিণতি।

রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে এক ধরনের আপাত-প্রশংসনীয় কিন্তু খুবই গুরুতর ভুল-ব্যাখ্যার সূত্রপাত হয়েছে বিধর্মী পশ্চিমালেখক ও চিন্তাবিদদের দ্বারা। তাঁরা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)কে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবরূপে স্বীকার করেন; কিন্তু তিনি-যে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত ও নির্বাচিত রাসূল, তিনি-যে সর্বমানবের অনুসরণীয় একমাত্র নির্ভুল হেদায়েতের বার্তাবহ, তাঁর পথই একমাত্র পথ–এই বিষয়টি তাঁদের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে না। রাসূল (সাঃ) যা-করেছেন, যা-বলেছেন, কোন কিছু-ই যে তাঁর নিজের নয়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বিষয়ে তিনি-যে আল্লাহপাকের আদেশ-নির্দেশেরই বিশ্বস্ত রূপকার ও প্রতিবিম্ব, এই কথাটা পশ্চিমা লেখকরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। গ্যেটে, কার্লাইল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি অতি-সাম্প্রতিক মাইকেল হার্ট পর্যন্ত বহু লেখক ও গবেষক, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক, মোহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে অনেক সপ্রশংস উক্তি ও গুণগান করেছেন। তারা সীমাহীন ভক্তির নৈবেদ্য পেশ করেছেন, অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন আবহমান পৃথিবীর সর্বকালীন প্রেক্ষাপটে মোহাম্মদ (সাঃ)ই এক-নম্বর ব্যক্তি; কিন্তু বুঝতে পারেন-নি, এটা তাঁর চেষ্টা পরিশ্রম মেধা ও প্রজ্ঞাজাত কোন কৃতিত্ব নয়, এটা পূর্ণরূপে আল্লাহপাকের মনোনয়ন। এই না-বুঝা হয়ত অমুসলিম আধুনিক পশ্চিমা লেখকদের জন্য স্বাভাবিক; কারণ তাঁরা যে-ধরনের চিন্তা, বিবেচনাবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়ের মধ্যে আবদ্ধ, তাতে তাঁদের দৃষ্টি জগতাতীত রহস্যের দিকে প্রসারিত হতেই পারে না। এমনকি সেই আকাঙ্ক্ষাও জাগে না। অবশ্য দু'একজন মুহম্মদ আসাদ ('The Road to Mecca' গ্রন্থের প্রণেতা) অথবা স্বপ্নাদিষ্ট ড: ইসলাম-উল-হকের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা একান্তভাবেই আল্লাহপাকের রহমতপ্রাপ্ত, সৌভাগ্যবান। কিন্তু যাঁদের নসীব তেমন সুপ্রসন্ন নয়, তাঁরা তাঁদের বস্তুবুদ্ধি দ্বারা এমনভাবে আক্রান্ত ও অধিকৃত যে, রাসূল

www.pathagar.com

(সাঃ)-এর প্রকৃত পরিচয় ও মর্যাদা তাঁদের কাছে অধরাই থেকে যায়। আর এসব লেখকদেরই প্রভাবহেতু আমরাও অনেকে আজ এরকম একটি গর্হিত বিশ্বাসে আস্থাবান হয়ে উঠেছি যে, মোহাম্মদ (সাঃ) আপন অসাধারণ প্রতিভা ও বুদ্ধিবলেই মহাকালের অক্ষয় মহানায়করূপে নিজেকে এক শাশ্বত-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। মুসলমানের জন্য এটা একটা গুরুতর ধারণা। এতটাই গুরুতর যে, এতে ঈমানের নামগন্ধও আর অবশিষ্ট থাকে না। আর সম্ভ্রম ও ভক্তিশ্রদ্ধার যত প্রাবল্যই থাক, এ-রকমের বিশ্বাস নিয়ে যারা রাসূল (সাঃ)কে মুহাব্বত করে, তাদের মুহাব্বতের ক্রান্তি-পরিমাণ মূল্যও আল্লাহর কাছে নেই, এবং আখেরাতে তাদের নসীবও কাফের-মুশরিকদের চেয়ে আলাদা কিছু হবার সম্ভাবনা কম।

অন্যদিকে যাঁরা মনে করেন, রাসূল (সাঃ) শুধু মানুষকে সর্বপ্রকার জাগতিক কলহ-কোন্দল সমস্যা ও সংকট থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর ভয়ে ভীত আপাদমস্তক মুত্তাকী তৈরীর সবক দান করেছেন, তারাও এক নিদারুণ ভুলের শিকার। সন্দেহ নেই, আল্লাহর ভয় ইসলামী জীবন-দর্শনের একটি অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু এই ভয়ের অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীর মোকাবিলা না-করে মুসলমান অনেকটা বাউল বা হিপ্পিদের মত লোটা-কম্বলসর্বস্ব পথে পথে ঘূর্ণায়মান এক অকর্মণ্য যাযাবর জাতিতে পরিণত হবে। এটা কি কখনো আল্লাহপাকের অভিপ্রায় হতে পারে? পৃথিবী যেভাবে চলে চলুক, মুসলমান সব তপোবনের এক-একজন বিবিক্ত বিচ্ছিন্ন মৌন মূক অহিংস ঋষিতে পরিণত হোক, এটাই কি ছিল রাসূল (সাঃ)-এর অভিলাষ? এজন্যই কি এত সংগ্রাম, এত ত্যাগ, শাহাদাতের এত অসংখ্য অকুণ্ঠ নজরানা? রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের মধ্যে কি এই শিক্ষাই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে? সাহাবী (রাঃ)গণ কি এই শিক্ষা নিয়েই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয় ও সন্তোষভাজন হয়েছিলেন? অসম্ভব! এটা হতেই পারে না। যাঁরা অজ্ঞতাবশত এই ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করেন, আল্লাহপাক মাফ করুন, তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। আর যাঁরা জেনেশুনে পৃথিবী-নিরপেক্ষ নিরাপদ পরহেজগারীকে জান্নাতের একটি সুগম রাস্তা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা মতলবী-পরহেজগার। তাদের পরহেজগারী-আচ্ছাদনের তলায় লুকিয়ে আছে অর্থ, খ্যাতি ও ব্যক্তিগতভাবে পৃথিবীজয়ের কুৎসিত দুরভিসন্ধি। আল্লাহপাক তাদেরকে হেদায়েত নসীব করুন। সম্ভবত এদের সম্পর্কেই রাসূল (সাঃ) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, –পূর্ব এলাকা থেকে একদল লোক আত্মপ্রকাশ করবে। তারা কোরআন পড়বে কিন্তু তাদের পাঠ তাদের গলার নীচে নামবে না। তারা তাদের দ্বীন-ধর্ম এমনভাবে উপেক্ষা করবে যেভাবে তীর শিকার অতিক্রম করে যায়। তারা পুনরায় আর তাদের ধর্মের দিকে ফিরে আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তীর স্বস্থানে ফিরে না-আসে (অর্থাৎ ফিরে আসা অসম্ভব)। জিজ্ঞাসা করা হলো, তাদেরকে চেনার মত চিহ্ন কী হবে? রাসূল (সাঃ) বললেন, তাদের

www.pathagar.com

চিহ্ন হলো তাদের মাথা ন্যাড়া হবে (মাথায় চুল থাকবে না)। [সহীহ আল বুখারি : ৬ষ্ঠ খণ্ড : হাদীস নং ৭০৪১ : পৃষ্ঠা ৫৫৬ : আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা]। সহীহ আল বুখারির কোন কোন হাদীসে এমন বর্ণনাও আছে যে, ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত কিছু মানুষের নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদত দৃশ্যত এত সুন্দর ও নিখুঁত হবে, যে-তুলনায় সাহাবী (রাঃ)দের ইবাদতও মনে হবে যথেষ্ট নিম্নমানের। অতএব অন্তরে-অন্তরে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বহির্ভূত কিছু মানুষ যে, তাকওয়া ও পরহেজগারীর কথা বলে বহু মুসলমানকে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবে, এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এজন্য বলতে পারি, বলা উচিতও, রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি এই জাতীয় মুত্তাকীদের মুহাব্বত আপাতদৃষ্টিতে যতই প্রগাঢ় প্রতিভাত হোক, আসলে তা অসার, আসলে তা লোক-দেখানো অভিনয়। বস্তুত, আল্লাহকে ভয় করা ও রাসূল (সাঃ)কে মুহাব্বত করার সঠিক অর্থ হলো, জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁদের আদেশ-নির্দেশকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে মান্য করা; ইসলামকেই একমাত্র সত্যদ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠাদানের ক্ষেত্রে সর্বস্ব বিসর্জনের তামান্না নিয়ে অবিচল থাকা। এ-ছাড়া কোন মুহাব্বত হয় না, সেই মুহাব্বতের কোন মূল্যও হয় না। বলাই বাহুল্য, রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি এই-মুহাব্বত আজ খুব কম মুসলমানের মধ্যেই বর্তমান।

রাসূল (সাঃ) কখনোই তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসার কথা বলেন-নি। আর কেনই-বা বলবেন? যিনি পৃথিবীর সকল সুখ-সম্ভোগ ও ঐশ্বর্য থেকে স্বেচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে এক কঠিন কৃচ্ছতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করলেন; ভালো খাবার খেলেন না, ভালো ঘরে থাকলেন না, ভালো কোন পোশাক পরলেন না, তিনি ব্যক্তিগত কী-কারণে মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবেন? যাঁর জীবনে আরাম-আয়েশের কোন অস্তিত্বই ছিল না, যিনি একটি কপর্দকও নিজের জন্য জমিয়ে রাখতে নিদারুণ কষ্ট ও অস্বস্তি বোধ করতেন, নিজের যে-কোন কাজে অপরের সাহায্য নেয়াকে যিনি অপছন্দ করতেন ঘোরতরভাবে, তিনি কী-কারণে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মানুষের খেদমতকে গ্রহণ ও ব্যবহার করবেন? রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসার মধ্যেই-যে ঈমানের পরিপূর্ণতা এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ এটা সহীহ হাদীস। কিন্তু এই ভালোবাসা সত্য-সত্যই কী-জিনিষ, সেটা সঠিকভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। ইতিহাস কী বলে? যাঁরা আসহাবে রাসূল, তাদের জীবনী কী বলে? রাসূল (সাঃ) কি কখনো কাউকে বলেছেন, 'তোমার খেজুর বাগানটি আমার নামে ওয়াক্‌ফ করে দাও'। অথবা এই ধরনের প্রস্তাব কেউ পেশ করলে, তিনি কি তাদের বিরত রেখেছেন, নাকি উৎসাহিত করেছেন? তিনি কি তাঁর কোন সাহাবীকে কখনো বলেছেন যে, তোমরা আমার প্রশংসাকীর্তনে সর্বদা মগ্ন ও মশগুল থাকো; এবং এতেই ইসলামের তরক্কী, তোমাদেরও তরক্কী? আফসোস! মুসলমান এতদিনেও বুঝতে সক্ষম হলো-না যে, রাসূল (সাঃ)-এর

www.pathagar.com

চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার গন্ধমাত্র ছিল না। এজন্যই প্রিয়তম পিতৃব্য হজরত হামজার (রাঃ) হন্তা ওয়াহশীর প্রতি তীব্রতম ক্ষোভ ও ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ওয়াহশী ক্ষমা লাভ করেছিলেন। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত প্রাণঘাতী দুশমন ইকরিমা এবং কবি কাবও সস্নেহে গৃহীত হয়েছিলেন। আসলে রাসূল (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও অসূয়া, আবেগ-অনুরাগ, ঘৃণা ভালোবাসা বলে জীবনে কিছু অবশিষ্টই ছিল না। তাঁর তুচ্ছ-বৃহৎ সবকিছু আবর্তিত হতো একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর দ্বীনকে কেন্দ্র করে। অতএব রাসূল (সাঃ)কে ভালোবাসা মানে তাঁর আনীত পয়গামকে ভালোবাসা, আল্লাহ এবং আল্লাহর দ্বীনকে ভালোবাসা, আল্লাহ এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেকে নিঃশেষে নিঃশর্তভাবে কোরবানী করে দেয়া। যিনি এভাবে মুহাব্বতের নমুনা তুলে ধরতে পারেন, তিনিই যথার্থ রাসূল-প্রেমিক; যিনি পারেন না, তাঁর মুহাব্বতের দাবী একেবারেই অসার।

অবশ্য রাসূল (সাঃ) যেহেতু একই সঙ্গে নবী এবং মানুষ, তাঁকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করেও ভালোবাসা যায়; কিন্তু সমস্যা হলো, সেই ভালোবাসা দিয়ে কোনরূপ উপকৃত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। আবু লাহাব তাঁকে ভালোবাসতো; এবং এতটাই বাসতো যে, তাঁর জন্মগ্রহণের সুসংবাদ ক্রীতদাসীর কাছে শোনামাত্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে দাসীকে সঙ্গে সঙ্গে আযাদ করে দিয়েছিল। এবং নবুয়তপূর্ব পুরো চল্লিশ বছর মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আবু লাহাবের এই অপত্যস্নেহ অক্ষত ছিল, অব্যাহত ছিল। কিন্তু এ-দিয়ে তার কোন লাভ হয় নি; ইসলামকে অস্বীকার করার কারণে তার পরিচয়, সে একজন জাহান্নামের সুসংবাদপ্রাপ্ত আপাদমস্তক কাফের। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, আবু লাহাব কাফের বটে, কিন্তু এই কুখ্যাত কাফেরও তার ভাতিজার প্রতি ভালোবাসার কারণে, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্মদিবস সোমবার কবরের আযাব থেকে অব্যাহতি পায়। পেতেও পারে, কিন্তু এ-রকম কোন তথ্য কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় পাওয়া যায় না। বরং আবু লাহাব সম্পর্কে যে-অবধারিত দুঃসংবাদ কুরআনুল কারীমে সূরা আবু লাহাব-এ ঘোষিত হয়েছে তাহলো, 'আবু লাহাবের দু'টি হাত ধ্বংস হয়ে গেল, এবং সে নিজেও ধ্বংসপ্রাপ্ত। ... শীঘ্রই সে লেলিহান অগ্নিকুণ্ডের ইন্ধন হবে'। খাজা আবু তালিবের কথা কারো অজানা নয়। রাসূল (সাঃ)-এর একেবারে শৈশব থেকে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এই আবু তালেব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য যে-গভীর ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা অতুলনীয়। বিশেষ করে নবুয়ত-পরবর্তী সীমাহীন সমস্যাকীর্ণ উত্তাল দিনগুলোতে আবু তালিবের যে-ত্যাগ, সকল প্রতিকূলতা তুচ্ছজ্ঞানে ভ্রাতুষ্পুত্রের নিরাপত্তা ও সাহায্যার্থে তাঁর যে-দৃঢ়তাপূর্ণ অবিচল ভূমিকা, যে-কোরবানী, তা রীতিমত বিস্ময়কর। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এমন আত্মত্যাগ, এত নিখাদ ভালোবাসা, কাফেরদের সর্বাত্মক সহস্রমুখী বৈরিতার মোকাবিলায় এমন পর্বতের মত অটলতা—এত কিছু সত্ত্বেও আবু তালিবের

www.pathagar.com

কোন লাভ হলো না। আবু তালিবও সেই কাফেরদেরই দলভুক্ত থেকে গেল, জাহান্নাম যাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল, যাদের মাগফেরাতের জন্য এমনকি দোয়া করাও নিষেধ। আবু তালিবের এই-যে এত কিছু নিঃস্বার্থ খেদমত, সব-যে নিষ্ফল হয়ে গেল তার একমাত্র হেতু আবু তালিব ইসলামকে ভালোবাসে-নি, ভালোবেসেছে মুহাম্মদকে। ইসলামের আহ্বানে সাড়া না-দিয়ে আবু তালিব তার সবটুকু কষ্ট ও ভালোবাসা বিছিয়ে দিয়েছিল শুধু ব্যক্তি-মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য; এজন্যই কোন লাভ হলো না আবু তালিবের। আবু তালিব যখন মৃত্যুশয্যায় একেবারে শেষ মুহূর্তে উপনীত, রাসূল (সাঃ) তাকে শুধু একবার কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করতে বললেন। হেদায়েত যেহেতু একান্তই আল্লাহপাকের হাতে, গৃহে উপস্থিত কাফেরদের মুখের দিকে তাকিয়ে কী-এক রহস্যময় লজ্জা ও দুর্ভাগ্যের কারণে আবু তালিব নীরবই রয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো মোহাম্মদ (সাঃ)কে অকৃত্রিমভাবে সর্বোচ্চ সহায়তাদানকারী এই মানুষটি। কোন একজন সাহাবী (রাঃ) রাসূল (সাঃ)কে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, শেষ মুহূর্তে অস্ফুট আওয়াজে আবু তালিবের ঠোঁট দু'টি নড়ছিলো, মনে হলো তিনি কালেমা শরীফ পাঠ করছেন'। রাসূল (সাঃ) বললেন, 'আমি শুনি-নি'। কত ত্যাগ, কত কোরবানী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্য, কত নিখাদ ভালোবাসা, অথচ ইসলাম গ্রহণ না-করার কারণে, এই হলো আবু তালিবের নসীব! আসলে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি অন্ধ অপত্যস্নেহ এক জিনিষ, আর মোহাম্মদ (সাঃ)কে ইসলামের নেতা হিসেবে সর্বান্তঃকরণে বরণ করে নেয়া এক জিনিষ। দু'টির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। নিঃসন্দেহে আমাদের মত রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি মুহাব্বতের শিরোপাধারী দরুদ-পড়া মুসলমানের জন্য আবু তালিবের এই কর্ম ও কর্মফল এবং পরিণতি একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

যাই হোক, যা বলতে চাই, তার সংক্ষিপ্তসার হলো, রাসূল (সাঃ)কে ভালোবাসার অর্থ তাঁর আনীত দ্বীনের আনুগত্য করা। রাসূল (সাঃ) শুধু একটি মানবিক সত্তা নয়, তিনি তওহিদ, রেসালত ও আখেরাতের দিকে আহ্বানকারী এক জীবন্ত সংবিধান। আল্লাহপাকের তরফ থেকে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব হলো পৃথিবীকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা, পৃথিবীবক্ষে ইসলামকে বিজয়ী করা। এই দায়িত্বপালনে সাহাবীরা (রাঃ) সর্বস্ব উৎসর্গ করে তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁরা যথার্থ রাসূলপ্রেমী। ইসলামের বিজয়, সুরক্ষা ও অগ্রযাত্রার প্রশ্নে আমরা যদি আমাদের সর্বস্ব কোরবানী করবার নমুনা পেশ করতে দ্বিধা না-করি, আমরাও রাসূলপ্রেমী। আর যদি ইসলামের জয়-পরাজয়ের প্রশ্নে জিকির আজকার ও দরুদনির্ভর এক চতুর পলায়নী জীবনদর্শনকে আশ্রয় করে রাসূলপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে চাই, সেটা নিতান্তই হাস্যকর এক বালখিল্যতা। রাসূল (সাঃ) বোকা ছিলেন না, আল্লাহপাকও বোকা নন। তাঁরা অবোধ বালক-বালিকাদের মত সুললিত গান শুনে মুগ্ধ হন না; তাঁরা কবিতাপ্রেমী নন। তাঁরা চান

www.pathagar.com

ইসলামের জন্য উৎসর্গীত সম্পদ ও রক্তের নজরানা। ভয়ে কি অন্য কোন দুর্বলতাবশত আমরা যদি কাফের মুশরিকদের সাথে আপোষরক্ষায় আমাদের রাসূলপ্রেমকে নত ও ন্যুব্জ করি, ঝুঁকি ও বিপদের আশঙ্কায় মুহাব্বতকে পরিণত করি এক বাউলধর্মী তরল দ্রবণে, পরিণত করি জাগতিক স্বার্থসম্মত এক চতুর ব্যবসায়ে, তাহলে আর কিছু নয়, আমাদের মুহাব্বতের অসারতাই শুধু প্রমাণিত হবে। আর এই ধরনের পরিহাস-তরল অসার মুনাফেকি-মুহাব্বতও যে আমাদের উপর আপতিত গজব ও লাঞ্ছনাসমূহের অন্যতম বড় কারণ, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ বিধর্মীদের জন্য যাই হোক, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহও যেমন অফুরন্ত, শাস্তিও একইরকম ভয়ংকর। সূরা বনি ইসরাইলের ৭৫ নং আয়াতে, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় দ্বিগুণ শাস্তির এক ভয়ংকর ঘোষণা আল্লাহ প্রদান করেছেন। কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর সাথে মুহাব্বতের নামে বহুদিন ধরেই আমাদের যে-নিরবচ্ছিন্ন লুকোচুরি খেলা, আজকের গজব তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ভয়ে শিহরিত হই, এই গজব দ্বিগুণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়ে মুসলিম উম্মাহর জন্য আরো কঠিন রূপ পরিগ্রহ না-করে! অতএব এখন আর তিলমাত্র কালক্ষেপ না-করে, আমাদের এটা অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি যে, রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি আমাদের মুহাব্বত যথার্থই কতটা খাঁটি ও কতটা অভিনয়, কতটা সত্যই প্রেম আর কতটা আত্মপ্রেম। অনেক কথা লেখা যায়, কিন্তু সর্ববিষয়ে আল্লাহর অনুগ্রহই চূড়ান্ত। আল্লাহপাক আমাদেরকে মার্জনা করুন, আমাদের স্বহস্ত-অর্জিত জিল্লতী-লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করুন। এবং এতদসঙ্গে আমাদের মধ্য থেকে সকল কুহক ও অলীক-মারেফাতি বিদূরিত করে, রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি যে-ধরনের ভালোবাসা আল্লাহপাকের কাছে গ্রহণযোগ্য, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সেই-ভালোবাসা জ্ঞাপনের উপলব্ধি ও তওফিক দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

মাসিক মদীনা : সিরাতুন্নবী সংখ্যা-২০০০

www.pathagar.com

প্রতিকারহীন অনৈক্য ও আলেম-সমাজ

আমরা যারা ইসলামী কোন আন্দোলনের সঙ্গে কোনরূপ প্রত্যক্ষ যোগ না-রেখেও ঐকান্তিকভাবে কামনা করি ইসলামের বিজয়, কামনা করি তৌহিদের বুলন্দ আওয়াজে দিক-দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হোক, পৃথিবী পরিচালিত হোক আল্লাহর পথনির্দেশ ও রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের অনুসরণে, তাদের কাছে এটা খুবই দুর্বহ কষ্টের কথা যে, আমাদের আলেম-উলামারা আজ মর্মান্তিকভাবে বহুধাবিভক্ত।

সত্যিই বড় কষ্টের কথা! অথচ এই আলেমরাই নবী-রাসূলদের উত্তরাধিকারী; এই আলেমরাই ইসলামের শিক্ষা ও প্রেরণা ও প্রাণশক্তির প্রকৃত বার্তাবাহক। সংগত কোন কারণ নেই, তবুও ফিরকা-ফতোয়ার নানাবর্ণ পতাকা তুলে তারা আজ দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে মুসলিম উম্মাহর জন্য বিপদের কারণ হয়ে উঠেছেন। বলাই বাহুল্য, আলেমদের এই অকারণ-অনৈক্য মুসলমানের জন্য বিপজ্জনক বটে, কিন্তু ইসলামের যারা প্রতিপক্ষ, তাদের কাছে এটিই অপরিসীম আনন্দ ও উৎসাহের বস্তু। কারণ আলেমরা যদি বিভেদ-বৈরিতার শিকার হয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েন, তাহলে মুসলিম মিল্লাতের সর্বনাশ-সাধন দুশমনদের জন্য বহুলাংশে সহজ হয়। আলেম-সমাজ এটা যদি না বোঝেন, তাহলে তারা বোকা ও গাফেল; আর যদি বুঝেও না-বোঝেন, তাহলে তারা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম বটে, কিন্তু আসলে তারা দুশমনদের হাতে স্বেচ্ছা-সমর্পিত ক্রীড়নক।

'ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল্লাজীনা ইউ কাতিলুনা ফি ছাবিলিহি ছাফ্ফান কাআন্নাহুম বুনিয়ানুম মারছুছ'-নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন লোকদেরকে পছন্দ করেন, যারা সীসাঢালা প্রাচীরের মতো আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে। 'ওয়া তাছিমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়াঁউ ওয়ালা তাফাররাকু'-আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়তার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে ধরে থাকো, পরস্পর মতবিরোধ করো না। কোনো আলেম কি পীর-দরবেশ, কোনো তাবলিগী-ভাই কি ইসলামী আন্দোলনের কোনো নেতা, মুফাচ্ছির মুহাদ্দিস, মুবাল্লিগ যে-কোন ব্যক্তিকে যদি সবিনয়ে প্রশ্ন করা হয়, 'হুজুর, উপরের কথা কি সত্য?' অথবা এই কথাটি কি সত্য, 'ওয়া মাঁইয়া তাওয়াল্লাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ওয়াল্লাজীনা আমানু ফাইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল গালিবুন'- আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুসলমান যাদের বন্ধু, তারা আল্লাহওয়ালা; এবং আল্লাহওয়ালাগণই বিজয়ী হবেন। এই প্রশ্ন করবার সঙ্গে সঙ্গে, ইনশাআল্লাহ কোনো সন্দেহ নেই, সকল পীর-মাশায়েখ, আলেম-উলামা একবাক্যে বলবেন, 'অবশ্যই সত্য। এ-কথা কোনো মানুষের কথা নয়; সূরা ছফ, সূরা ইমরান ও সূরা মায়িদায় অন্তর্ভুক্ত এই কথা আল্লাহপাক স্বয়ং এরশাদ করেছেন। এ-নিয়ে কারো মধ্যে তিলমাত্র সন্দেহ থাকলেও, অর্থাৎ একথা আল্লাহর নয়, সত্য নয়, এ-রকম মনে করলে তার ঈমানই থাকে

www.pathagar.com

না'। হুজুরদের কাছে সবিনয়ে যদি এই প্রশ্নটিও উত্থাপন করা যায় যে, এই কথা কি সত্য যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'একটা সময় আসবে যখন মুসলমানের মধ্যে নানা মতভেদ ও দলাদলি শুরু হয়ে যাবে। এ-সময় যে সব লোক উম্মতের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হবে, তারা যে কেউ হোক-না কেন ওদের কতল করে দিও'। তাঁরা এই কথায়ও সমস্বরে বলে উঠবেন, 'পাগল, এ-তো মুসলিম শরীফে সংকলিত একটি পবিত্র সহীহ্ হাদীস। এই ধরনের সহীহ হাদীস অস্বীকার করার দুর্মতি থেকে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন।'

তাহলে? তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল-কোরআন ও আল-হাদীস মুসলিম উম্মাহ্র প্রস্তরকঠিন ঐক্যবদ্ধতার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করে, সে বিষয়ে কোন আলেমের মধ্যেই কোনো মতানৈক্য নেই। আলহামদুলিল্লাহ! এবং তাঁরা এ-বিষয়েও পূর্ণ ওয়াকিবহাল যে, শত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও সহস্র রকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কারণ এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর সুস্পষ্ট হুকুম; এই হুকুম অমান্যকারী নিঃসন্দেহে গোনাহগার। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয়, সবকিছু জানা সত্ত্বেও ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত আমাদের এই আলেম-সমাজই, অতীতের যে-কোন সময়ের তুলনায় আজ এক মর্মান্তিক অনৈক্যের শিকার। এবং আরো দুঃখ ও ভয়ের কথা, নানা দলে-উপদলে বিভক্ত এই সকল বুজুর্গানে-দ্বীনের মধ্যে বিভেদ আজ এমন ক্ষিপ্রগতিতে ক্রমবর্ধমান, যা মাঝে মাঝে সহিংসও হয়ে ওঠে।

আল্লাহপাক-যে মুসলমানকে সর্বদা সর্বক্ষেত্রে ও সর্বত্র ঐক্যবদ্ধ থাকতে আদেশ করেছেন, তার একটি বড় কারণ হলো, শুধু আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে ইসলামের দাবী পূরণ হয় না। ইসলামের মূল লক্ষ্য পৃথিবীকে জঞ্জালমুক্ত করা, ইবলিসের কাছে পরাভূত পৃথিবীকে আল্লাহ'র কাছে ফিরিয়ে আনা, সকল অব্যবস্থাকে উৎখাত করে আল্লাহ'র পৃথিবীকে আল্লাহ'র নিয়মাধীনে পরিচালনা করা। কিন্তু এই কাজ অত্যন্ত কঠিন; এত কঠিন যে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রীতিমত রক্তাক্ত সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। অথচ বিষয়টি এত জরুরি ও অপরিহার্য যে, কোন মুসলমানের পক্ষে পিছিয়ে আসা ও পিছিয়ে থাকার কোনো অবকাশ নেই। অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদের প্রশ্নে মুসলমান সর্বস্ব বিসর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ; আল্লাহ'র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় ও আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করে তোলার লক্ষ্যে মুসলমানের পক্ষে অদেয় কিছু নেই। আল্লাহপাক এই মুসলমানের জন্যই প্রস্তুত রেখেছেন অভাবনীয় সুখের আবাস, অনন্তদিনের নিরবচ্ছিন্ন জান্নাত।

সপরিতাপে উল্লেখ করি, সম্ভবত এই কথাটি ভেতরে-ভেতরে ভুলে আছে অথবা খুব একটা বিশ্বাস করে না বলেই পীর-মাশায়েখদের মধ্যে আজ এই করুণ ও মর্মান্তিক

www.pathagar.com

বহুধাবিভক্তি। না-হলে যে-কোন ধরনের সংগ্রামের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ থাকা যে ফরজ, ঐক্যের প্রশ্নে যে-কোন রকম দ্বিধা, সংশয় ও তর্কপ্রবণতা-যে শতকরা একশ' ভাগ নিষিদ্ধ, এই কথা মুসলমান ভুলে যায় কী করে? এই ভুলে যাওয়ার কারণে-যে কঠিন জবাবদিহির জন্য আল্লাহ'র সম্মুখে অবশ্যই একদিন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, এই কথাই-বা কী করে ভুলে থাকে? আর অবস্থা এতই করুণ ও মর্মদাহী যে, আলেম-উলামারা সবাই আল্লাহওয়ালা, অথচ সবাই একে অপরকে কাফের-মুশরিক বলে প্রতিনিয়ত তিরস্কার করছেন।

কিন্তু এই বিভেদ ও অনৈক্যের হেতু কী? আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) ও ইসলামের প্রশ্নে যাদের মধ্যে দৃশ্যমান কোনো মতবিরোধ নেই, কী এমন সমস্যা যা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধা দেয়? কোন কোন আনুষ্ঠানিকতা ও কোন কোন বিষয়ে লঘু-গুরু বিবেচনায় কিছু মতানৈক্য আছে, কিন্তু সেগুলো না-জরুরি, না পরস্পর-বিরোধিতার জন্য খুব শক্তিশালী উপাদান। বস্তুত, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য থাকলে, রাসূল (সাঃ) ও তাঁর আনীত দ্বীনের প্রতি যথোচিত মুহব্বত থাকলে ও ইসলামের জয়-পরাজয়কে জীবনে অগ্রাধিকার দিলে, ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আদৌ কোনো সমস্যা থাকে না। আসলে সবাই যা বলে সেটাই হয়ত সত্য যে, এই আল্লাহওয়ালারাও পার্থিব-নেতৃত্বলিপ্সু। এবং এই লিপ্সা এতটাই সর্বগ্রাসী, এতটাই চেতনা-নাশক ও দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য যে, আল্লাহ'র সব কথা ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও তারা নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না।

কেউ কেউ এ-কথাও বলে যে, সবাই কিছু-না-কিছু ধর্মভিত্তিক কায়েমী স্বার্থের শিকার। এই স্বার্থে বিঘ্ন ঘটতে পারে, সেই আশঙ্কার কারণেও কারো নেতৃত্ব কেউ মেনে নিতে চান না, পরস্পর বৈরিতারও অবসান ঘটে না। অর্থাৎ অনেকের কাছেই আজ আর ইসলাম ও ইসলামের তরক্কী মুখ্য নয়, ইসলামের নামে ব্যবসাটাই মুখ্য। অতএব স্ব-স্ব ব্যবসার নিরাপত্তা ও প্রসারের স্বার্থে সবাই যদি বিচ্ছিন্নতাকে আঁকড়ে ধরে, তাহলে ব্যবসাবুদ্ধি তিরোহিত না-হওয়া পর্যন্ত এই বিচ্ছিন্নতার কোনো চিকিৎসা নেই। এ-ছাড়াও অনেকের ধারণা, পীর-মাশায়েখ, আলেম-আউলিয়াদেরও অনেকে ইসলামের শত্রুগোষ্ঠীর কাছে নানা দামে বিক্রয় হয়ে গেছে। তারা ইসলামের ভালো-মন্দ, ক্ষতি-বৃদ্ধি নিয়ে অনেক কথা বলে, কিন্তু তাদের প্রকৃত কাজ হলো, মুসলমানের মধ্য থেকে ঐক্য, ইনসাফ ও হিম্মতকে যথাসাধ্য বিনষ্ট করা।

এই ধারণা একেবারে অমূলকও নয়। স্পেনে শত্রুরা প্রথমে মসজিদের ইমাম ও বহু প্রভাবশালী আলেম-উলামাকে গোপনে গোপনে খরিদ করে নিয়েছিল। বাদশাহ আকবরও তাঁর দীন-ই-ইলাহীর সমর্থকরূপে পেয়েছিলেন অনেক বিজ্ঞ আলেম। মুসলমানের মধ্যে যাতে কোনোভাবেই কোনো জিহাদী তামান্না জেগে উঠতে না পারে,

www.pathagar.com

সেই কাজে অনেক আলেম উলামা যে বৃটিশ শাসকদের কাছে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে, ইংরেজ আমলের ইতিহাসে তার সাক্ষ্য আছে। অতএব এখনো আশ্চর্য নয়, ইসলামের যারা দুশমন তাদের সাহায্যার্থে মুসলমান নামসর্বস্ব অনেক মুরতাদ মুনাফিকদের মতো কিছু ইসলাম-দরদি আলেমও আজ সকল বিভেদ ও অনৈক্যের মূলে জলসিঞ্চন করে চলেছে। যা-ই হোক, অনৈক্যের তিনটি কারণ যা উল্লেখ করেছি - নেতৃত্বের লিপ্সা, কায়েমী-স্বার্থের নিরাপত্তা ও প্রসার এবং শত্রুদের কাছে আত্মবিক্রয় - তিনটিই অত্যন্ত জটিল ও দুরারোগ্য। অতএব অনেকের অনেক আন্তরিক চেষ্টা সত্বেও সকল ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে শীঘ্রই-যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে, সেই আশা ও সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীন।

নেতৃত্বের বিষয়টি যাঁদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের উদ্দেশ্যে অন্তত এটুকু সবিনয়ে নিবেদন করা যায় যে, ইসলামে যদিও নেতৃত্ব একটি বড় জিনিষ, কিন্তু এ নিয়ে উতলা হওয়া ও বিভেদ কি বিদ্বেষ সৃষ্টির কারণ হয়ে ওঠা একেবারেই নিষিদ্ধ। হজরত উমার ফারুক (রাঃ) যখন মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদকে পদচ্যুত করে সাধারণ সৈনিকের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিলেন, রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত 'আল্লাহর তরবারি' অভিধায় বিভূষিত খালিদ সাইফুল্লাহ কি একবিন্দুও বিচলিত হয়েছিলেন? না, তিনি প্রতিবাদও করেন নি, বিচলিতও হন নি। হজরত আবুজর গিফারী (রাঃ) একবার হজ্বে গেলেন। হজরত উসমান (রাঃ) তখন খলীফা। এক ব্যক্তি বললো, 'খলীফা উসমান (রাঃ) মীনায় অবস্থানকালে কসর না-করে নামাজ চার রাকায়াত আদায় করেছেন।' হজরত গিফারী (রাঃ) তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'রাসূল (সাঃ), আবু বকর এবং উমারের পেছনে আমি এখানে নামাজ পড়েছি; তাঁরা সবাই দু'রাকাত পড়েছেন'। এই কথা বলে তিনি নামাজের ইমামতি করলেন এবং চার রাকায়াতই আদায় করলেন। সবাই বললো, 'আপনি আমীরুল মুমেনীনের সমালোচনা করলেন, আবার নিজেই চার রাকায়াত পড়লেন!' তিনি বললেন, 'মতভেদ খুবই খারাপ জিনিষ। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমার পরে যারা আমীর হবে তাদের অপমান করবে না। যে ব্যক্তি তাদের অপমান করার ইচ্ছে করবে, সে ইসলামের সুদৃঢ় রজ্জু নিজের কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলবে এবং নিজের জন্য তওবার দরজা বন্ধ করে দেবে।'

এরপরও অনৈক্যের সমর্থনে কেউ যদি কিছু বলতে চান, তাঁদের বিবেচনার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর এরশাদকৃত অন্য একটি কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেছেন, তোমরা সর্বদা বড় জামাতকে গ্রহণ করবে। অর্থাৎ যত প্রবল ও অকাট্য যুক্তিই থাক, ইসলামের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যাবার মতো না-হলে, খণ্ডিত-বিখণ্ডিত না-হয়ে মুসলমানের উচিত সর্বদা বড় জামাতের আনুগত্য করা। এমন সহজ সমাধান থাকা সত্বেও, আলেম-উলামারা সব কিছু জেনে-শুনেও, খুবই তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে

www.pathagar.com

মুসলমানের মধ্যে ও নিজেদের মধ্যে অক্লান্তভাবে বিভেদ সৃষ্টি করছে, বর্তমান সময়ে সত্যই এর চেয়ে দুঃখবহ দ্বিতীয় কোনো দুর্ভাগ্য নেই।

যুগপৎ বিস্ময় ও পরিতাপের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, বর্তমান সময়ে আমাদের যাঁরা বুজুর্গানে দ্বীন, তাঁদের অনেকেরই ভূমিকা থেকে মনে হয়, বোখারী শরীফের এই হাদীসটি তাঁরা বোধহয় পুরোপুরি বিস্মৃত হয়েছেন: 'এক সময় আসবে যখন তোমরা বড় বড় পদ লাভ করার জন্য লালায়িত হবে। অথচ এই পদলাভই হাশরের দিন তার জন্য সমূহ অনুশোচনার কারণ হবে।' এতদসঙ্গে তিরমিজী শরীফে সংকলিত অন্য একটি হাদীসও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রণিধানযোগ্য: 'কোন মুমিনের পক্ষেই নিজেকে লাঞ্ছিত করা উচিত নয়'। অনেক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, 'কী-ভাবে নিজেকে লাঞ্ছিত করা হয়'? রাসূল (সাঃ) বললেন, 'জেনে-শুনে এমন দায়িত্ব গ্রহণ করা, যা বহন করার ক্ষমতা তার নাই।' এরপরেও মুসলমানের মধ্যে কী-করে যে নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল ও অনৈক্য সৃষ্টি হয়, সে এক অপার ও অভাবনীয় বিস্ময়। আর আলেম-উলামারা কি জানেন না যে, নেতৃত্ব চাইলেই পাওয়া যায় না? নেতৃত্ব আল্লাহপাকের হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন, যার নিকট থেকে ইচ্ছা কেড়ে নেন। অতএব অযথা ইসলাম ও মুসলমানের গতিপথে নানারূপ যুক্তির অবতারণা করে বাধা সৃষ্টি করা বিশুদ্ধ মূঢ়তা।

বলাই বাহুল্য, যত বড় আলেমই হোক, সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত যত বড় পীর-দরবেশই হোক, ইসলামের নামে এই ইসলাম-বিরোধী ভূমিকার জন্য তাদের সবাইকে একদিন খুব বড় রকমের মূল্য দিতে হবে, বড় রকমের বিপদে পড়তে হবে। কারণ, আখেরাতে আলেমদের জন্য আলাদা কোনো সুব্যবস্থাও নেই, আলাদা কোনো বিচার-ইনসাফের মানদণ্ডও নেই। বরং আলেম বলে তাঁদের আমলের বিচারটা অপেক্ষাকৃত কঠিনই হবে।

অবশ্য নেতৃত্বলোভীদের চেয়েও, শত্রুদের কাছে গোপনে গোপনে আত্মবিক্রীত আলেমরাই সর্বাধিক বিপজ্জনক। কিন্তু তাদের নিয়ে কথা-বলা নিষ্ফল বাক্যক্ষয়। কারণ বাহ্যত যা-ই মনে হোক, তারা আসলে ইসলামের ক্ষতিসাধনের নিমিত্ত দুশমনদের দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত এজেন্ট। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর কথায় এদের খুব একটা কিছু এসে যায় না; নিয়োগদাতা প্রভুরাই এদের আরাধ্য দেবতা। এদিক থেকে, যারা রবীন্দ্রনাথকে আল্লাহর কাছাকাছি জ্ঞান করে অথবা নেহেরুকে মনে করে নবী (নাউজুবিল্লাহ), আমাদের সেই অনেক বিবেকভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে এই আলেমদের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই; কথা ও কর্মের বাহ্যিক রূপ আলাদা, কিন্তু উভয়ের লক্ষ্য এক। আর যারা নিজ নিজ কায়েমী-স্বার্থের কারণে বিভেদ জীবিত রাখতে চায়, মুসলিম উম্মাহ্‌র সংহতি বিনষ্ট করতে চায়, পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী ভূমিকাকে মনে করে

www.pathagar.com

ঈমান ও ইসলামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খেদমত, তাদের-যে কী-ভাবে কী-বুঝানো যায়, সে-এক সমস্যা। কোরআন-হাদীস থেকে অকাট্য উদ্ধৃতি দিয়েও বিশেষ কোন ফললাভের সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীন। কারণ তারা সবই জানে। সবকিছু জেনে-শুনেও তারা স্বার্থের নিগড়ে এমন অসহায়ভাবে বন্দী যে, সেই বন্দীদশা থেকে তাদের পক্ষে উদ্ধার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তবু যেহেতু এই শ্রেণীর আলেমদেরও হৃদয় এবং মস্তিষ্কে আল কোরআন ও আল হাদীসের, নীরব ও অকর্মক হলেও, অন্তত আক্ষরিক উপস্থিতিটুকু আছে, আশা করা যায়, অর্থ-বৈভব, খ্যাতি ও প্রতাপ-প্রতিষ্ঠার কারণে, তারা একেবারে সমূলে নিঃস-াড় হয়ে যায় নি। তারা নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারে আল্লাহ কী বলেন, আল্লাহর রাসূল কী বলেন। এবং কোনো সন্দেহ নেই, লোকে যা-ই বলুক, খ্যাতি ও ঐশ্বর্যের যত অবিরল ধারাই নেমে আসুক, তারা একাকী একান্ত কোন মুহূর্তে ইসলামের নির্দেশ ও দাবীর প্রশ্নে নিশ্চয়ই নিজের সঙ্গে নিজে বোঝাপড়া করতে বাধ্য হয়, বোঝাপড়া করে। অতএব এটা পরিষ্কার যে, তাঁরা আত্মজয়ে অসমর্থ বটে, কিন্তু আত্মজিজ্ঞাসায় নীরবে নীরবে জর্জরিত। কারণ, এ-বিষয়ে তাঁরা সম্যক অবগত যে, কায়েমী কোন আত্মস্বার্থের সংরক্ষণ ও সুরক্ষার প্রশ্নে ইসলামকে ভুলে থাকার কোন অনুমতি নেই, ইসলামকে ব্যবহারেরও নেই।

বলাই বাহুল্য, আল কোরআন সর্বমানবিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের অব্যর্থ গ্যারান্টি, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কারো বৈষয়িক উন্নতির জন্য ব্যবহার্য হাতিয়ার নয়। জীবিকা অর্জনের অসংখ্য বৈধ উপায় আল্লাহ অবারিত করে দিয়েছেন, কিন্তু ইসলামকে কৌশলে কাজে লাগাবার কোনো অনুমতি নেই। আল্লাহপাক বলেন, 'ওয়ালা তাশতারু বি আইয়াতি ছামানান কালীলা ওয়া ইয়াইয়া ফাত্তাকুন' আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না, এবং যথোচিতভাবে আমাকেই ভয় করো (সূরা বাকারা)। একই সূরায় ১৭৪ নং বাক্যে আরো কঠিনভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন, 'ওয়া ইয়াশতারুনা বিহি ছামানান কালীলা উলাইকা মাইয়াকুলুনা ফি বুতুনিহিম ইলান্নার'; আল্লাহপাকের নাজিলকৃত কিতাব যারা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে, তারা ভক্ষন করছে অগ্নি। আর হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন-'কেয়ামত হবে না, যে পর্যন্ত এমন একটি শ্রেণীর উদ্ভব না হবে যাদের জীবিকা হবে বাকচাতুর্য'। অর্থাৎ অর্থোপার্জনে কোরআন শরীফ ব্যবহারকারী অগ্নিভুক এক শ্রেণীর বাকচতুর আলেম হলো কেয়ামতের আলামত।

কী ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী! অথচ এ-নিয়ে কোনো সংশয় নেই যে, আমাদের উলামায়ে কেরাম, বুজুর্গানে দ্বীন ও পীর-মাশায়েখদের একটি বড় অংশ আজ ইসলামকে 'ভালোবেসে' ইসলামকে সহজ অর্থাগম ও নিরাপদ জীবিকার উপায় করে নিয়েছে। এই প্রকার আলেম, 'যাদেরকে আল্লাহপাক পবিত্রও করবেন না এবং যাদের সঙ্গে কথাও

www.pathagar.com

বলবেন-না' (সূরা বাকারা), বলে কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে, তারা ইসলাম ও মুসলমানের ঐক্য-সংহতি নির্মাণের ক্ষেত্রে রীতিমত বৈরী ভূমিকায় স্থির ও অচঞ্চল থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ 'এরাই তারা যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং ক্ষমার বিনিময়ে ক্রয় করেছে শাস্তি' (সূরা বাকারা)। কারো প্রতি কোনো ব্যক্তিগত অসূয়ার লেশমাত্র নেই, কারো বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগও নেই; বর্তমান লেখক যেহেতু আক্‌ল ও ইল্‌মের মানদণ্ডে খুবই অপরিপক্ক, স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল একটু বেশি। প্রশ্ন করতে চাই, আমাদের শ্রদ্ধেয় অনেক আলেম-আউলিয়া-মুরুব্বিজন, তাঁরা নিজেদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কর্তৃক নিষিদ্ধ ভূমিকায় নিবিষ্ট রাখেন কী-করে? সম্ভবত, তাঁরা মনে করেন, একদিকের অপরাধ যতই পর্বতপ্রমাণ হোক, অন্যদিকের জিকির-আজকার ও তসবিহ-তাহলীল দিয়ে আল্লাহকে একভাবে মানিয়ে নেয়া বিশেষ কঠিন হবে না। আফসোস, আল্লাহপাক ও তাঁর অভ্রান্ত ইনসাফ সম্পর্কে আমাদের ধারণা কতই-না গুরুতরভাবে লঘু ও অলীক!

যাই হোক, আলেম-উলামাদের অনৈক্য একটি দুশ্চিকিৎস ব্যাধিই শুধু নয়, একই সঙ্গে একটি আত্মবিনাশী কৌতুকও বটে। চতুর্দিক থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে অবিরাম-অব্যাহত শরবর্ষণ চলছে; অথচ আলেম-উলামারা চব্বিশ ঘন্টা আত্মকলহে লিপ্ত। এই মর্মদাহী কুৎসিত অবস্থার অবসান কি কখনো ঘটবে? আল্লাহপাক জানেন, কোথায় এর পরিসমাপ্তি। আমাদের ধারণা, একেবারে পুরোপুরি আপাদমস্তক কাফের-মুশরিকদের পদানত না-হওয়া পর্যন্ত, এসব আলেমদের যথোচিত বোধোদয় ঘটবে বলে মনে হয় না। না-হলে অবস্থা কখনো এত করুণ হয়!

আলেমদের পদস্খলন ও পৃথিবীপ্রীতি বড় ভয়ংকর জিনিষ; আশঙ্কা হয়, তাদেরকে উপযুক্ত জ্ঞানদানের জন্য হলেও, আল্লাহ'র গযব হয়ত এই জমীন ও জনপদে শীঘ্রই অবতরণ করবে। কে জানে, আমাদের অলক্ষ্যে হয়ত সেই প্রস্তুতিই চলছে। আল্লাহপাক হেফাযত করুন; কিন্তু না বলে উপায় নেই যে, আল্লাহ'র ক্ষমা ও অনুগ্রহ এবং নিরাপত্তা লাভের ঈমানী-যোগ্যতা আমরা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছি। সত্যই-যে হারিয়ে ফেলেছি, আমাদের ও বিশেষ করে আমাদের আলেমদের আত্মঘাতী অনৈক্যই তার বড় প্রমাণ। অতএব কোন-না-কোনরূপে শাস্তি বোধহয় অত্যাসন্ন। কারণ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'জামাতবদ্ধতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আল্লাহর রহমত এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্যে আযাব'। গযব প্রস্তুত। কিন্তু কোন শাস্তিই যেহেতু আল্লাহপাকের অনুমতি ছাড়া আসতে পারে না, এখনো হয়ত একটু সময় অবশিষ্ট আছে। কালবিলম্ব না-করে সকল আলেম-উলামার উচিত মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থে নিঃশর্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কিন্তু এই আহ্বানে আমাদের আলেম সমাজ মুখে যা-ই বলুন, কার্যত কতটা সাড়া দেবেন, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন। কারণ, স্বদেশে-বিদেশে এমন সব আলেমদেরই এখন

www.pathagar.com

সংখ্যাধিক্য, যারা ইসলামের জন্য জীবন ও সম্পদ কোরবানী করার চেয়ে, নিজেদের পার্থিব স্বার্থে ইসলামকেই কোরবানী করে দিতে ভালোবাসে। ধারণা করি, এই ধরনের আলেমদের কথা ভেবেই রাসূল (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'এমন একটা সময় আসবে যখন আলেমরা হবে আকাশের নিচে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণী'। আমাদের আলেম বুজুর্গানে-দ্বীন, পীর-মাশায়েখ, তাঁরা কি চান এই পরিচয় নিয়ে আল্লাহর সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে? তাঁরা কি চান আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও মুসলিম-মিল্লাতের সমূহ ক্ষতি সত্বেও আত্মকলহ ও অনৈক্য আঁকড়ে থাকতে?

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) তৎকালীন খলীফার নির্দেশে কারাগারে প্রেরিত হন। কারাগারে তাঁর মাথায় জল্লাদ কর্তৃক প্রতিদিন নির্মম-নৃশংসভাবে বেত্রাঘাত করা হতো। তিনি যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যেতেন। কারাগারের এক দাগী-অপরাধী একদিন ইমাম সাহেবকে বললো, 'হুজুর, আমার উপরে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছে। কিন্তু অপরাধ করেও আমি অপরাধ স্বীকার করি নি, প্রাণ থাকতে করবোও না। আমি যদি মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে এতটা দৃঢ়তা দেখাতে পারি, আপনি কেন সত্যের জন্য তা পারবেন না'? অনেকটা এরকমই একটা ক্ষুদ্র অনুরোধ বর্তমান বহুধাবিভক্ত আলেম সম্প্রদায়ের কাছে নিবেদন করতে চাই। দস্যু-তস্কর, পিকপকেট, ধর্ষক, মস্তান, চাঁদাবাজ, এমনকি উন্মাদ ও ভিখারিদের মধ্যেও ঐক্য আছে; অথচ নবী-রাসূলদের উত্তরাধিকারী হিসেবে আপনাদের পরিচয়, আপনারা কি পারেন-না পারস্পরিক ঈর্ষা ও অবিশ্বাসকে পরিহার করতে? তুচ্ছ ক্ষুদ্র পার্থিব স্বার্থকে উপেক্ষা করে তওহিদের আওয়াজ ও আল্লাহর প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আপনারা কি পারেন না ঐক্যবদ্ধ হতে? যদি না-পারেন, বুঝতে হবে আপনাদের বদনসীব, বুঝতে হবে এই জমীন ও জনপদে বসবাসরত সকল মুসলমানের বদনসীব।

দৈনিক ইনকিলাব : ৫.৫.২০০০

www.pathagar.com

পীরের লড়াই

দেওয়ানবাগ ও চরমোনাই, আধ্যাত্মিক জগতের দুই মহান 'পীঠস্থান'। ইসলাম ও ইল্‌মে-তাসাওফের বিশাল ভাণ্ডার নিয়ে দু'জায়গাতেই দু'জন বিখ্যাত পীর স্ব-স্ব মুরীদের ঐহিক ও পারত্রিক 'কল্যাণের' লক্ষ্যে দরবার-শরীফ সাজিয়ে বসেছেন। গায়েবের কোন খবর যেহেতু জানি না, কার মধ্যে আল্লাহপাক কী-ইল্‌ম ও অনুগ্রহ দান করেছেন, সে বিষয়ে যেহেতু জ্ঞাত নই, আমরা দুই দরবারকেই দূরে থেকে সমীহ করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতি সম্প্রতি দুই ভক্তদলের মধ্যে যে-রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়ে গেল, তাতে আমরা খুবই বিস্মিত, ব্যথিত ও নিরুৎসাহিত হয়েছি। এমনিতেই মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান অবস্থা খুব ভালো নয়; এমনিতেই ইসলাম আজ কাফের-মুশরিক-মুনাফিকদের পরিহাসের বস্তু ও সহজ টার্গেটে পরিণত হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে মুসলমানের মধ্যেই ইসলাম-বিরোধী এক প্রবল পঞ্চমবাহিনী; এমতাবস্থায় এই পীরে-পীরে লড়াই অতীব দুঃখজনক। বিশেষ করে দুঃখজনক এই হেতু যে, এই ধরনের লড়াই, ইসলামের যারা দুশমন তাদের কাছে খুবই উপভোগ্য এবং উৎসাহব্যঞ্জক। আর দুশমনদের কাছে যা-কিছু পছন্দনীয়, তা-যে ইসলামের জন্য খুবই গুরুতর, এই কথাটি পীরও যদি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বুঝতে হবে, পীর হয়ত অন্য বহু কিছু হাসিল করেছেন, কিন্তু হারিয়ে ফেলেছেন সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান।

সে যাই হোক, লড়াইটা বাধলো কেন? এ-নিয়ে কাগজে-কাগজে যা দেখেছি, তা-থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসার মত মনঃস্থির করা যায়নি; বরং রহস্য আরো বেশি ঘন হয়ে উঠেছে। এই ঘনীভূত রহস্যের কিনারা করা বড় কঠিন। ডিটেকটিভ উপন্যাসে দেখেছি, ঘটনার মোটিভ আবিষ্কার করা গেলে সবকিছু জলের মত সহজ হয়ে যায়, পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে কে নায়ক আর কে খলনায়ক। কিন্তু এখানে সেই ডিটেকটিভ গোয়েন্দাগিরি একেবারেই অচল। কারণ হকীকত, তরিকতের অধরা আসমানি-জগতের যাঁরা বাসিন্দা, তাঁদের মারেফাতি খবরের সন্ধান পাওয়া সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। অতএব সাধারণ মানুষের জন্য সাধারণ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করাই সর্বোত্তম পন্থা। এই লড়াই ও যুযুধান এই দুই পক্ষ সম্পর্কে সাধারণ বুদ্ধিতে কী বলে? সাধারণ জ্ঞানে আমরা তিনটি বিষয় বিবেচনা করতে পারি। এক. দু'টি পক্ষই সমানভাবে গোমরাহীতে নিমজ্জিত; দুই. কোন একটি পক্ষ সৎ অপরটি সত্যভ্রষ্ট; এবং তিন. দু'টি পক্ষই নিয়তের দিক থেকে হয়ত সঠিক, কিন্তু বিষয়-বিবেচনার দিক থেকে নির্ভুল হতে পারে নি। বলাই বাহুল্য, ইতিহাসে এই তিন প্রকার উদাহরণই বর্তমান। আব্বাসীয় খেলাফতের সময় বাগদাদে আরব ও পারস্যবাসীদের মধ্যে এক ধরনের শীতল স্নায়ুযুদ্ধ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। লড়াই বাধেনি, কিন্তু স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য বহু গোপন অপচেষ্টা, এমনকি জাল হাদীস তৈরীর

www.pathagar.com

ক্ষমত গর্হিত মাহীন কাজও তাদের অনেকের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। আর মুসলিম ইতিহাসে দ্বিতীয় ধরনের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত উদাহরণ হলো কারবালা অর্থাৎ ইমাম হোসেন (রাঃ) ও এজিদের লড়াই। আকবর-জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মুজাদ্দিদ-ই-আলফে-সানী (রঃ)-এর যে লড়াই, সেটিও ছিল এই একই রকম সুস্পষ্ট সত্য-মিথ্যার লড়াই। তৃতীয়ত, বিষয়-বিবেচনার দিক থেকে নির্ভুল না-হলেও নিয়তে কোন ত্রুটি ছিল না। জঙ্গে জামাল অর্থাৎ উষ্ট্রের যুদ্ধ তারই দৃষ্টান্ত। এই যুদ্ধে হজরত আলী (রাঃ) এবং জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মুখোমুখি হয়েছিলেন। এখন দর্শকদের স্থির করা আবশ্যক, বর্তমান এই চরমোনাই বনাম দেওয়ানবাগী যুদ্ধটা কোন্ শ্রেণীতে পড়ে।

একবার মনে হয়, দু'পক্ষই আশাতীতরূপে ইসলামপ্রেমী এবং দু'পক্ষই সমানভাবে নির্ভুল। আবার মনে হয়, পরস্পরের বিরুদ্ধে সংহারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ দুই দলই ইসলাম থেকে সমানভাবে দূরবর্তী। কখনো মনে হয়, দুই পীরই কঠিনভাবে আল্লাহওয়ালা। আবার কখনো মনে হয়, দু'জনেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথকে অবজ্ঞায় পরিত্যাগ করে পুরোপুরি ইবলিসকেই সখা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আমরা কোনরূপ কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারছি না যে, পবিত্র রমজান শুরুর প্রাক্কালে এই লড়াইয়ের নেপথ্য শানে নুজুল ও প্রকৃত মর্তবা কী? এ-বিষয়ে একমাত্র আল্লাহপাকই পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল; এবং তিনিই একদিন ফয়সালা দান করবেন। তবে এটা সত্য যে, শুধু সত্য-মিথ্যা নয়, আদর্শ-আদর্শহীনতা নয়, ইসলামের প্রতি প্রেম ও বিদ্বেষের প্রশ্ন নয়, পৃথিবীতে বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে শুধু স্বার্থরক্ষাকল্পে শক্তি প্রদর্শনের জন্য। সবাই নয়, কিন্তু বাংলাদেশ নামক এই শ্যামল বদ্বীপে এমন বহুসংখ্যক পীর আছেন, যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হলো বিষয়-বৈভব। এবং বর্তমান এই লড়াইকে মনে হয়, অবশ্য ভুলও হতে পারে, নিতান্তই ভূ- দখলের লড়াই, ব্যবসা সম্প্রসারণের লড়াই। এ-যেন এক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিশেষ করে যখন শুনি, কোরআন-হাদীসকে সামনে রেখে দুই পীরই মুখোমুখি বাহাসে লিপ্ত হতে চান, তখন এই আশঙ্কাই প্রবল হয়ে ওঠে যে, শুধু এক শ্রেণীর গোবৈদ্য-সদৃশ বুদ্ধিজীবীর কাছে নয়, অনেক পীর-আউলিয়ার কাছেও ইসলাম আজ একটি লঘু বিনোদনমূলক তামাশার বস্তু। যাই হোক, দুই পীরের বাহাস যদি সত্যই কখনো অনুষ্ঠিত হয়, অগ্রিম ধারণা করা যায়, সেদিন উভয় দলই মরিয়া হয়ে উঠবে এবং প্রচুর রক্তক্ষয় হবে। আর এই সম্ভাবনাও সমধিক যে, বাহাসে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে ইল্‌ম ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে নয়, নির্ধারিত হবে তারাশঙ্করের গল্পের মত 'I do not know' ধরনের কোন চতুর প্রশ্নের সরল বঙ্গানুবাদের মধ্য দিয়ে। বস্তুত, বাহাস থেকে কোন ফললাভ হয় না; বরং এ-থেকে বিভ্রান্তি আরো বিস্তার লাভ করে, এবং আরো ঘন হয়ে ওঠে অন্ধকার, যে-কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) তার্কিকদেরকে খুবই অপছন্দ করেন। এবং সর্বক্ষেত্রে এটাই-তো পরীক্ষিত সত্য

www.pathagar.com

যে, তর্ক কখনোই সত্যানুসন্ধানের পথ ও প্রক্রিয়া নয়। অতএব আমাদের যে-কোন পীর-মাশায়েখেরই আশু কর্তব্য হলো, কলহ ও তর্ক-বিতর্কের পথ পরিহার করে আত্মমুখী হওয়া। এই আত্মমুখিনতার অর্থ, আল্লাহ এবং রাসূল (সাঃ)-কে সামনে রেখে আপন অন্তরের দিকে এমনভাবে চোখ ফিরিয়ে দেখা, যাতে পরিষ্কার হয়, কথা ও আমল এবং অভিপ্রায় সত্যই কতটা ইসলামসম্মত এবং কতটা নয়। যদি ভুল ধরা পড়ে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করে নেয়া ওয়াজিব। কারণ কোন পীরের ভুল শুধু তাঁর একার ভুল নয়; সেই ভুল সহস্র সহস্র মুরীদের মধ্যেও বিপুল বেগে ও শক্তিতে সংক্রামিত হয়ে যাচ্ছে। অতএব এক্ষেত্রে সামান্যতম সময়ক্ষেপন ও শৈথিল্য ও চক্ষুলজ্জার কোন অবকাশ নেই। কারণ পার্থিব চক্ষুলজ্জার চেয়ে আখেরাতের জবাবদিহিতা নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুতর। এবং এই কথাটি যদি পীর সাহেবও না-বোঝেন অথবা না-বুঝতে চান, তাহলে আমরা বুঝবো, ইসলামের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাতে পারদর্শী এই সকল পীর আসলে ভণ্ডপীর। সকল বিশ্বাসী মুসলমানের কর্তব্য, এদের হাত থেকে যে-কোন উপায়ে হোক, সরলপ্রাণ মুসলিম নারী-পুরুষকে উদ্ধার করা।

যাই হোক, একটি বিষয় খুবই গুরুতর ও বহুল আলোচিত যে, পৃথিবীর যে-কোন স্থানের তুলনায় বাংলাদেশ এখন বহুবর্ণ পীরের একটি উর্বর ভূমি। ছোট বড় কত-যে পীর এখানে আছে, তা গণনাতীত। সকলেই খারাপ নয়, সকলে ভণ্ডও নয়; কিন্তু অধিকাংশেরই ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত সন্দেহজনক। শুধু সন্দেহের কথা নয়, রীতিমত বিপজ্জনক। ইসলামের নামে তাদের ঈমান ও আকীদা বিধ্বংসী তৎপরতার কারণে বহু মুসলমান আজ পথভ্রষ্ট এবং নিখাদ গোমরাহীর মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। অথচ ইতিহাস বলছে, রাসূল (সাঃ)-এর সময় এবং তৎসন্নিহিত সাহাবী ও তাবেয়ীনদের যামানায় পীর-মুরিদের কোন ব্যাপারই ছিল না। আসলে ইসলাম এটা অনুমোদনই করে না। পীর বলে যদি সত্যই কিছু থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই রাসূল (সাঃ)-এর চেয়ে বড় কোন পীর হতেই পারে না। কিন্তু তিনি কী বলেন? তিনি তাঁর ফুফু সাফিয়া (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, দেখুন সাফিয়া, আল্লাহর নবীর ফুফু বলে আপনার কোন আলাদা সুবিধা নেই। যা করার আপনাকে এখানেই করতে হবে, আখেরাতে আমি আপনার জন্য কিছুই করতে পারবো না। এবং আল্লাহপাকও পরকালের সেই কঠিন সময় সম্পর্কে কুরআনুল করীমে সুস্পষ্টভাবে এরশাদ করেন, 'কোন বন্ধুত্ব কোন সুপারিশ কিছুই গৃহীত হবে না' (সূরা বাকারা)। এবং আখেরাত এই জাতীয় ফয়সালার ক্ষেত্র বলেই-তো আল্লাহপাক বলেন, আমরা স্মরণ করলে তিনিও স্মরণ করেন; বলেন, গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও তিনি আমাদের নিকটবর্তী। অর্থাৎ আল্লাহপাক ও তাঁর বান্দাহর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতা একেবারেই একটি অলীক ও মতলবী ধারণা, যা গর্হিত শির্‌কও বটে। অতএব কোন্ দুঃসাহস নিয়ে কিছু পীর আজ মধ্যস্থতার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান! সীমালংঘনেরও একটা সীমা আছে; দুর্ভাগ্য, কিছু পীর একেবারে পূর্ণমাত্রায় বেপরোয়া। এই জাতীয়

www.pathagar.com

পীরদের মধ্যে কী-পরিমাণে আল্লাহর ভয় ও ইসলামপ্রীতি বিদ্যমান, আমাদের পক্ষে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; কিন্তু এটা বোঝা যায় যে, শত শত কি হাজার হাজার মুরীদের সরলতা ও ধর্মভীরুতাকে মূলধন করে তাদের অনেকেরই তহবিল কোন রকম উদ্বেগ ও ঝুঁকি ছাড়াই ফুলে ফেঁপে ওঠে। এবং তাঁরা অনেকেই-যে বাৎসরিক ইছালে-সওয়াব অথবা দোয়ার মাহফিলের ইন্তেজাম করেন, তার মূল লক্ষ্য অনেকটা ব্যবসায়ীদের হালখাতা অনুষ্ঠানের মতই একযোগে একত্রে অনেক অর্থলাভ। অতএব পীরদের কাছে ধর্ম যেমন আছে, ধর্মের ব্যবসাও আছে; পারলৌকিক সাফল্যের সবক যেমন আছে, নিজস্ব ঐহিক অর্থাগমের নিপুণ ব্যবস্থাও আছে। এটা দোষণীয় কি নির্দোষ সে-প্রশ্ন অনাবশ্যক, তবে আছে। এবং আছে বলেই, কারো কারো মাত্রাজ্ঞান বিনষ্ট হয়ে লড়াইয়ের মত ঘটনা ঘটে। আর এ-থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে দর্শক বাধ্য হয় যে, ইসলামের ক্ষতিবৃদ্ধির ব্যাপারটা নিতান্তই বাহ্যিক, আসলে লড়াইটা প্রভাব পরাক্রম ও বিত্তবৈভবের লড়াই। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য, ইসলামের শিক্ষা, আখেরাতের ভয়, এসব ছাড়িয়ে যদি বিত্তবাসনাই প্রবল হয়ে ওঠে, তাহলে আর যাই হোক ইসলাম হয় না। বলা আবশ্যক যে, কোন পীর সাহেবের প্রতিই আমার কোন ব্যক্তিগত ক্ষোভ কি অসূয়া নেই। আমি শুধু আমাদের বর্তমান পীরপূজার বিষয়টি নিয়ে বিচলিত। ইসলামে-তো পাদ্রী-পুরোহিতদের মত পীরের আধিপত্য কায়েম হবার কথা নয়। কারণ ইসলামে এই ধরনের মিথ্যা-মধ্যস্বত্বভোগীর কোন জায়গাই নেই। অথচ আমাদের চোখের সামনেই কত অক্লেশে কিছু মানুষ হাজার হাজার মুরীদকে সম্মোহিত করে কোটি কোটি টাকার পাহাড় গড়ে তুলছে। সত্য যে, পীর সাহেবদের তরফ থেকেও অনেক কথা বলার আছে; এবং এটাও সত্য, সকলে সমান নয় সকলে এক-রকমও নয়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকার রূপালি স্রোত-যে অব্যাহত বেগে বহু দরবার শরীফের মোহনায় এসে মিলিত হচ্ছে, এই মনোরম দৃশ্য অবলোকন করে কোন 'অর্বাচীন' সমালোচক যদি গভীর বেদনায় এটাকে এক ধরনের নীরব লুণ্ঠন ও নীরব দস্যুতা বলে আখ্যায়িত করেন, কী-ভাবে তাঁকে প্রবোধ দেয়া সম্ভব? কিন্তু এটা হয় কী করে? ইসলামের সামান্যতম সমর্থন নেই, তবু ইসলামের নামে এই লুণ্ঠনপ্রক্রিয়া কী করে জমজমাট হয়ে ওঠে? অনেকের মনে হয়, আমারও হয়, এই অনভিপ্রেত অবস্থার প্রধান কারণ, পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীসসমূহের অনুশীলন ছেড়ে দিয়ে আমরা এখন আমাদের ইবাদতকে কিছু দুর্বল ও মওজু মনগড়া হাদীসের উপর স্থাপন করেছি। আর এতদসঙ্গে রয়েছে কিছু ধর্মব্যবসায়ী মানুষের চতুর কৌশল এবং আমাদের প্রতারিত হবার অপরিসীম ক্ষমতা।

যাই হোক, পীর পুরোহিত পাদ্রীরা-যে কী-বস্তু, তার কিছু বর্ণনা হজরত সালমান ফারসি (রাঃ) থেকে পাওয়া যায়। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি পর পর যে-দুই পাদ্রীর

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন, তাঁরা দুজনেই ছিলেন অর্থগৃধ্নু রীতিমত রক্তশোষক। সালমান ফারসি (রাঃ) এই দুই মহামান্য 'ঈশ্বরপ্রেমিকের' প্রকৃত রূপ জনগণের সম্মুখে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন তাদের গোপনে জমানো অঢেল সম্পদের হদিস তুলে দিয়ে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আহমদ দীদাত তাঁর একটি আলোচনায় এই রকমই একজন ধর্মগুরুর বর্ণনা করেছেন। গায়ানার জোন্সটাউনের রেভারেন্ড জিম জোন্স ছিলেন এক 'আত্মঘাতী ভক্তিবাদ ও ধর্মানুষ্ঠান'-এর প্রবক্তা। এই জিম তার ৯১০ জন অনুগত ভক্তকে নিয়ে একযোগে একই সময়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার জোন্সের অশুভ তৎপরতার সন্ধান পেয়ে বহু সুনির্দিষ্ট অপরাধের কারণে তাঁকে গ্রেফতারের পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। কিন্তু ধরা-পড়ার আগেই জোন্স নিজেকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন। এবং একাকী নয়, সকল অনুসারীসহ, যাতে তাঁর কৃত দুষ্কর্মের কোন সাক্ষী না থাকে। তিনি সায়ানাইড-মিশ্রিত পানীয় প্রস্তুত করলেন এবং সকল অনুরাগী ভক্তকে বৃত্তাকারে বসিয়ে সেই শরবত পান করার নির্দেশ দিলেন। আর ভক্তরা গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে সবাই একযোগে বরণ করে নিলেন এক নিরর্থক স্বেচ্ছামৃত্যু। কিন্তু ইতোমধ্যে এটা দেখা গেল যে, এই ধর্মগুরু রেভারেন্ড জিম জোন্স পৃথিবীব্যাপী তাঁর নিজ নামে বহু ব্যাংক একাউন্টে ১৫ মিলিয়ন ডলার জমিয়ে রেখেছেন। জোন্সের ভক্তবৃন্দ ছিল প্রকৃতপক্ষে দুগ্ধদায়িনী গাভী এবং জোন্স তাদের সবাইকে শোষণ ও প্রতারণা করে আপন স্বার্থপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছেন মাত্র। আমাদেরও বহু পীর এই রকমই প্রবল সম্মোহনশক্তির অধিকারী এক একজন রেভারেন্ড জোন্স, এবং মুরীদরা হলো সরল গৃহপালিত দুগ্ধদায়িনী গাভী। বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি প্রবন্ধে একজন তপস্বিনীর বর্ণনা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কথা, এই মহিলা ধর্মগুরু বাস করতেন নিউইয়র্কে। একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, নিউইয়র্কের পার্শ্ববর্তী একটি হ্রদ তিনি পায়ে হেঁটে পার হয়ে যাবেন। অশেষ কৌতূহল নিয়ে অসংখ্য ভক্ত ও দর্শক নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হলো হ্রদের ধারে। যথাসময়ে তপস্বিনী অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে সমবেত জনতাকে লক্ষ করে বললেন, 'জলের উপর দিয়ে আমি যে পায়ে হেঁটে যেতে পারি, এটা কি তোমাদের বিশ্বাস হয়'? সবাই সমস্বরে বলে উঠলো 'ইয়েস ইয়েস'। 'তাহলে আর যাবার দরকার নেই' একথা বলে যেমন এসেছিলেন, সেভাবেই ধীরপায়ে প্রত্যাবর্তন করলেন তপস্বিনী। খুবই আশ্চর্যজনক যে, এই চতুর নাটকীয়তায় ভক্তদের আস্থা ও বিশ্বাস ও মুগ্ধতা এতটুকু হ্রাস পায় নি, বরং আরো বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এর চেয়েও আরো বেশি চমকপ্রদ একটি ঘটনার কথা 'তাযকেরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থে তাপসী হজরত রাবেয়া বসরী (রঃ)-এর জীবন থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তাপসী একবার হজ্বব্রত পালনে যাত্রা করেছেন। মক্কাশরীফে পৌঁছবার আগেই তাঁকে সসম্মানে এগিয়ে নেবার জন্য কাবাগৃহ নিজেই রাবেয়া বসরীর সম্মুখে উপস্থিত। ঘটনাটি একেবারে আক্ষরিক অর্থেই সত্য বলে বর্ণিত; কারণ ওই বছর হজরত ইব্রাহীম আদহামও (রঃ) হজ্বে গিয়েছিলেন, কিন্তু কাবাগৃহকে সাময়িকভাবে অদৃশ্য দেখেছিলেন।

www.pathagar.com

এটা গল্প বা ঘটনা যাই হোক, আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমান এটা বিশ্বাস করে। তর্কে যাবো না; কারণ তর্ক দ্বারা বিশ্বাস তৈরীও করা যায় না, বিশ্বাস নষ্টও করা যায় না। শুধু এটুকু বলবো যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ একবার ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গোপনে হজ্ব করতে আসায় খলীফা হজরত উমার ফারুক (রাঃ) তাঁকে তিরস্কার করেছিলেন। জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর সঙ্গে হজ্বে আসছিলেন। পথিমধ্যে অসুস্থতাবশত তাঁর পক্ষে হজ্ব করা সম্ভব হবে কি হবে-না, এই ভেবে দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ায় রাসূল (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। এ-সবই ইতিহাস। দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, স্বয়ং রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা দূর দূরান্ত থেকে অনেক পথকষ্ট সহ্য করে হজ্বে এসেছেন; কাবাগৃহ কখনোই কারো জন্য এগিয়ে যায় নি। অথচ তাপসী হজরত রাবেয়া বসরী (রঃ)-এর ক্ষেত্রে এমন একটি অভিনব ঘটনা ঘটলো যে, কাবাগৃহ দর্শন থেকে দূরাগত হজরত ইব্রাহীম আদহাম (রঃ)সহ অনেক হাজী সাময়িকভাবে মাহরুম হয়ে গেলেন। বলা নিস্প্রয়োজন, এসব একেবারেই বানানো গল্প। কিন্তু বানানো হোক যাই হোক, আমাদের বিশ্বাস করতে কোন অসুবিধা হয় না। অতএব আমরা যদি নানা ধরনের কথায় ও কারামতে ইসলামের সকল শিক্ষা ও দাবী অগ্রাহ্য করে পীর সাহেবদের প্রতি আনুগত্যে অধীর হয়ে উঠি, সেটা অসমীচীন বটে, কিন্তু এতটুকু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ভয়ের কথা হলো, পীর সাহেবদের অভ্যন্তরে বিরাজমান বহুদিনের শীতল স্নায়ুযুদ্ধ এবার হঠাৎই এমন উত্তপ্ত রূপ নিলো যে, বহুসংখ্যক মানুষ শুধু হতাহতই হলো না, আপাত-প্রশমিত এই লড়াই আবার-যে কখন ঝড়ের মত গর্জে ওঠে বলা যায় না। কিন্তু এ-রকম প্রাণঘাতী রণঝঞ্ঝা কি একেবারে বিনা প্রস্তুতিতে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব? তাহলে পীর সাহেবরাও কি কেউ কেউ গোপনে গোপনে মাস্তান পোষেন? নাকি পীর সাহেবদের সম্মোহনীশক্তির প্রভাবে মুরিদরাই 'জিকির আজকার' ভুলে গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ মাস্তান হয়ে ওঠে। কিছু একটা রহস্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যেভাবেই যা-হোক, নিরীহ মুরিদদের ক্ষেপিয়ে তোলা কেন? এতো অনেকটাই মাফিয়া ধরনের লঘু কৌশল। এই কৌশল কি 'পরহেজগার' পীর সাহেবদের মানায়? লড়াই যদি খুব জরুরিই হয়ে ওঠে, তাহলে ভালো হয়, যদি পীর সাহেবরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সেটা বীরোচিতও বটে, সর্বসাধারণের কাছে উপভোগ্যও বটে। তবে সবচেয়ে ভালো হয়, সকল কুহক ও অনৈক্য পরিত্যাগ করে আল্লাহপাকের পথনির্দেশ ও রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শকে পূর্ণশক্তিতে নিঃশর্তভাবে আমরা যদি আঁকড়ে ধরতে পারি। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ্।

দারুস সালাম : ঈদ সংখ্যা-২০০০

www.pathagar.com

জিহাদ : ইসলামের একটি অপরিহার্য শর্ত

দুই ভিন্ন উৎস থেকে আগত আলো কি জলপ্রবাহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কোনরূপ সংঘাতও হয় না; পরস্পর পরস্পরকে বরং বাড়িয়ে তোলে, তারা মিলেমিশে আরো প্রবল ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ঠিক একই রকম, হক-এর সাথে হক-এর, সত্যের সঙ্গে সত্যের, কল্যাণের সঙ্গে কল্যাণের কোন দ্বন্দ্ব হয় না। সংঘাত আসলে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; হক-এর সঙ্গে বাতিলের এবং বাতিলের সঙ্গে বাতিলের। পৃথিবীতে ছোট-বড় যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তা-সবই সাধারণভাবে এই দুই ধরনের যে-কোন একটিতে পংক্তিভুক্ত। অবশ্য বাতিলের সঙ্গে বাতিলের যে-দ্বন্দ্ব, সেটা বৈষয়িক-স্বার্থ এবং ক্ষমতা ও হঠকারিতার কারণে দস্যুর সঙ্গে দস্যুর লড়াইয়ের মত। এই লড়াইয়ে হারজিত যেমন আছে, যুদ্ধবিরতি, আপোষরফাও আছে। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় স্বার্থের কারণে এবং স্বার্থের কারণে মিটেও যায়। এই ধরনের বাতিলে-বাতিলে যে-যুদ্ধ সেখানেও আদর্শের কথা উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু আসলে সেটা ক্ষমতা বিস্তারের ছদ্মবেশ। বলাই বাহুল্য, এই ধরনের যুদ্ধ নিয়ে মুসলমানের আদৌ কোন পেরেশানি নেই। মুসলমানের যুদ্ধ হলো নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহরই জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, এই জমীনে আবহমানকাল থেকে একটি সংগ্রাম অব্যাহত আছে এবং রোজ-কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে, সেটা হলো হক-এর সঙ্গে বাতিলের সংগ্রাম। এই সংগ্রামের চরিত্রই এ-রকম যে, এখানে কোন আপোষ হয় না। ফিত্না সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত না-হওয়া পর্যন্ত, হক-এর যারা সৈনিক তাদের বিরামও নেই বিশ্রামও নেই। আর বাতিলেরও একটা কুৎসিত স্বভাব আছে। বাতিল যেহেতু ইবলিসেরই পদানত-কিংকর ও ক্রীড়নক, তার আত্মা যেহেতু ইবলিসের কাছে বিক্রয় হয়ে-যাওয়া পণ্যবিশেষ, বাতিল সততই সত্যের প্রতিপক্ষ এক প্রতিশ্রুত শত্রু। বাতিল কখনো ব্যাঘ্রের মত ভয়ংকর ও ভয়ালদর্শন, কখনো সরিসৃপের মত পলায়নপর ও সুযোগসন্ধানী। অতএব যারা হক-কে আঁকড়ে ধরে আছে, হক-এর নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠাই যাদের একমাত্র তামান্না, সেই অকুতোভয় মুজাহিদদের সার্বক্ষণিক সজাগ-সতর্কতা যেমন আবশ্যক, তেমনি প্রয়োজন হক ও বাতিলের এই চিরন্তন দ্বন্দ্বে প্রয়োজনবোধে সর্বস্ব কোরবানি করবার অদম্য স্পৃহা। এক্ষেত্রে না-আছে পশ্চাদপসরণের কোন অবকাশ, না-আছে আপোষরফার মৈত্রীবন্ধনে কোন নিরাপদ বলয়ে সহাবস্থানের সুযোগ।

কিন্তু হক কী-বস্তু আর বাতিলেরই বা কী-পরিচয়? হক হলো রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহপ্রদত্ত অকাট্য নির্ভুল সংবিধান, আল্লাহপাক যাকে বলেছেন হেদায়েত, বলেছেন নূর ও রহমত। আর বাতিল হলো, সমগ্র মানব বংশের কল্যাণার্থে প্রেরিত এই সংবিধান, এই নূর ও রহমতকে নিভিয়ে দেবার এক অশুভ শক্তি ও তৎপরতা। বাতিল এটা জেনেশুনেই করে, এটাই বাতিলের স্থায়ী স্বভাব। কারণ মুমেনদের পরীক্ষার জন্য

www.pathagar.com

আল্লাহপাক ইবলিস ও ইবলিসের বহু বশংবদ ক্রীতদাস সৃষ্টি করেছেন, যাদের কাজই হলো পৃথিবীকে জাহান্নামের উপযোগী শস্যক্ষেত্রে পরিণত করা। তাদের এই দুষ্কর্ম সাধনে একটিই মাত্র বাধা, সেটা হলো ইসলাম, সেটা হলো মুমেনদের সর্বাত্মক ও সার্বক্ষণিক প্রতিরোধ। ইবলিসের এই এক কঠিন বিপদ; কারণ মুসলমান সবকিছু উপেক্ষা করতে পারে, অন্য সকল বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারে, কিন্তু ইবলিস ও তার খরিদকৃত সাঙ্গপাঙ্গোদের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই থেকে মুসলমান মুহূর্তমাত্র অব্যাহতি গ্রহণ করে না, করতেও পারে না। কারণ এটা তার ঈমানী-জিন্দিগীর একটি অপরিহার্য শর্ত। আল্লাহপাক সুস্পষ্টরূপে সূরা ছফ ও সূরা হুজুরাত-এ মুমেনদের যে-তিনটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ ও পরিচয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, তার একটি হলো, জীবন ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অবতরণ। রাসূল (সাঃ)ও বলেছেন, অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে মুমেনের মধ্যে প্রতিরোধের-হাত উত্থিত না হলে, প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার না হলে, অন্তত কমপক্ষে অন্তরে অন্তরে ঘৃণা থাকতেই হবে। কিন্তু এ-সব কোনকিছুই যদি না-থাকে, তার অন্য গুণপনা যাই থাক, সে কোন মুমেনই নয়। অর্থাৎ মুমেন সর্বদায়ই কায়মনোবাক্যে একজন আপাদমস্তক মুজাহিদ।

প্রসঙ্গত, কারবালার ঘটনাটি স্মরণ করতে পারি। এই ঘটনাকে সামনে রেখে প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে এটা অনুধাবন করা সহজ যে, যত মর্মান্তিক, যত অপ্রত্যাশিতই হোক, এটা কোন আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর সপরিবারে আল্লাহর পথে আত্মবিসর্জন ছিল ইসলামের চিরন্তন দাবী। 'ওয়া রিদওয়ানুম মিনাল্লাহি আকবার জালিকা হুয়াল ফাউজুল আযীম' আল্লাহর সন্তুষ্টিই জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাফল্য (সূরা তাওবাহ)। আর খোদাদ্রোহী কাফের-মুশরিক-মুনাফিকদের বিরুদ্ধে রণে অবতীর্ণ হওয়ার মত আল্লাহর কাছে গ্রাহ্য এবং অধিক প্রিয় কাজ আর কী হতে পারে! এজন্যই রাসূল (সাঃ) বলেছেন, জিহাদের ময়দানে যে-শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত ঝরেছে, ওই শরীর জাহান্নামের জন্য হারাম। আসলে হারজিত নিয়ে মুসলমানের কোন উৎকণ্ঠা নেই। বিজয় অর্জিত হলে ভালো, শাহাদাত নসীব হলে আরো ভালো। কারণ অন্য কোন আনুষ্ঠানিক ইবাদতের ফলাফল সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত কোন অকাট্য গ্যারান্টি নেই। কিন্তু শাহাদাত এমন একটি অব্যর্থ ইবাদত, যার বিনিময় অবধারিত জান্নাত। কিন্তু আফসোস, অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে এই জিহাদী-চেতনা আজ অনুপস্থিত। শুধু অনুপস্থিত নয়, কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে সখ্যস্থাপনকরত বহু মুসলমান আজ উদার ধর্মনিরপেক্ষতারও উৎসাহী প্রচারক। এমনকি বহু মুসলমান আজ ইসলামকে বৈষ্ণব কি বাউল ধর্মে রূপান্তরিত করতেও বিশেষভাবে তৎপর। সত্যই আফসোস, সত্যই বড় বদনসীব! কাফের-মুশরিক-মুনাফিকদের বিরুদ্ধে আমরণ অবিশ্রান্ত সংগ্রামই-যে মুসলমানের প্রকৃত অভিজ্ঞান, এই সহজ সত্যকথাটি

www.pathagar.com

মুসলমান আজ ঘোরতরভাবে বিস্মৃত হয়েছে। অথচ আল্লাহপাক শুধু জিহাদের মাহাত্ম্য এরশাদ করেই থেমে যান নি, অনেক প্রণিধানযোগ্য নমুনাও তুলে ধরেছেন, যা-থেকে মুসলমান সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে কী তার কর্তব্য, পৃথিবীবক্ষে কী তার অপরিহার্য ভূমিকা। বদর, ওহুদ কি খন্দকের যুদ্ধ, তাবুক, হুনাইন, কাদেসিয়া, কারবালার প্রান্তর মুসলমানদের কাছে এই-রকমই এক-একটি শিক্ষাপ্রদ অবিস্মরণীয় নমুনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আত্মত্যাগের এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে আমরা অতি অল্পই শিক্ষাগ্রহণ করেছি। সূরা আল এমরানে যে মুসলমানকে আল্লাহপাক 'সর্বোত্তম উম্মত' বলে অভিহিত করেছেন, যে মুসলমান আল্লাহর নূর ও রহমতের বিশ্বস্ত পাহারাদার, সেই মুসলমান আজ নিজেই অবলীলায় বরণ করে নিয়েছে ভীরুতা ও অন্ধকার। মুসলমান আজ এমন এক গৃহস্বামী, যে কেবল দস্যু তস্করকে খুশি রাখার জন্যই জেগে জেগে ঘুমোচ্ছে; বাতিলের সাথে সংঘর্ষের আশঙ্কায় অপরিহার্য জিহাদকে মনে করছে ফিত্না, আল্লাহর পথে সম্পদ ও রক্তের নজরানা দেবার আতঙ্কে তসবিহ ও জায়নামাযকে করেছে নাযাতের শ্রেষ্ঠতম অবলম্বন। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া এই ক্লীব ও কাপুরুষ মুসলমানকে তার হৃতগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। অনেক দুঃখে একজন কবি এজন্যই বলেছেন-

'শের কি সের পে বিল্লী খেল রহি
ক্যায়সা হায় মুসলমাঁ কা বদনসীব
শাহাদাত কি তামান্না মর গয়ি
তসবিহ কা দানো মে জান্নাত ঢুঁঢ রহি'।

ব্যাঘ্রের মাথায় বসে বিড়াল খেলা করছে, কী বদনসীব এই মুসলমানের, নিঃশেষ হয়েছে শাহাদাতের তামান্না, জান্নাত খুঁজে ফিরছে তসবিহ্র দানার মধ্যে। আল্লাহপাক এই অভিশপ্ত লীলাবিলাস ও প্রহেলিকার মধ্যে স্বেচ্ছানিমজ্জিত মুসলমানকে রক্ষা করবেন, আল্লাহপাকের তরফ থেকে এই ধরনের কোন ওয়াদা কোথাও নেই।

আসলে যে-বস্তু যত মূল্যবান, এটাই স্বাভাবিক যে, তার হেফাযত ও সুরক্ষার জন্য তত বেশি কোরবানি ও সতর্কতা প্রয়োজন। কারো গৃহে যদি মহামূল্য মনি-মাণিক্য থাকে, এবং তা সবাই জানে, সেই গৃহকর্তার চোখে ঘুম আসবার কথা নয়। প্রয়োজনবোধে সার্বক্ষণিক সশস্ত্র পাহারা বসাতে হবে। অতএব যেহেতু ইসলাম আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত, এক অমূল্য রত্নভাণ্ডার—এই ইসলামকে সব ধরনের আক্রমণ থেকে হেফাযত করার চেয়ে বড় আর কোন দায়িত্ব মুসলমানের নেই। কাফের-মুশরিকরা ইসলামের আলোয় আলোকিত জীবন পছন্দ করে না; তাদের একমাত্র লক্ষ্য ইসলামের নূরকে নির্বাপিত করা। আল্লাহপাক অবশ্য, কাফের মুশরিকদের যত কষ্টই হোক, এই নূরকে সকল ঝড়ঝঞ্ঝা ও তাণ্ডব থেকে রক্ষা করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এবং নিশ্চয়ই তাঁর ওয়াদার কোন এতটুকু ব্যত্যয় নেই; অর্থাৎ ইসলাম আল্লাহপাকের

www.pathagar.com

অভিপ্রায় নিয়ে চিরঞ্জীব। কিন্তু কী-ভাবে? ইসলামের তরক্কির জন্য আল্লাহপাক কি আকাশ থেকে দলে দলে ফেরেশতা প্রেরণ করবেন? না। কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহপাকের ক্ষমতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। মুসলমানের কোন সদর্থক ভূমিকা ছাড়াই তিনি ইসলামের আলোকবর্তিকা অনন্তকাল সমুজ্জ্বল রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে ও সকল ক্ষেত্রে আল্লাহপাকের অভিপ্রায়ই যথেষ্ট ও চূড়ান্ত। কিন্তু কেন তা করবেন তিনি? যদি তিনিই সব করবেন তাহলে মুসলমানের কাজ কী? কী-কারণে মুসলমানকে আল্লাহপাক 'সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত' বলে আখ্যায়িত করলেন? মুসলমান ভীরু খরগোশের মত পালিয়ে বেড়াবে, লালন ফকিরের দেহতত্ত্ব গানের সুরে সুরে গঞ্জিকাসেবায় তুরীয়লোকে অবস্থান করবে, আর আল্লাহপাকের নাজিলকৃত ফেরেশতাদের দ্বারা ইসলামের তরক্কি সাধিত হবে, এটা হয় না। হলে, বদরের প্রথম যুদ্ধেই চৌদ্দজন সাহাবীকে শাহাদাত বরণ করতে হতো না। আসলে ইসলামকে হেফাযতের জন্য, যতটুকু বুঝি, আল্লাহর যে-হিকমত তাহলো, আমাদের মত ভীরু ও পলায়নলিপ্সু খরগোশদের মধ্যেই আল্লাহপাক মাঝে মাঝেই প্রেরণ করেন এক-একটি অকুতোভয় রাজকীয় চিতাবাঘ—খালিদ বিন ওয়ালিদ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, সালাহদীন, মুজাদ্দিদ আলফেসানী, জওহর দুদায়েভ, ওসামা বিন লাদিন-যারা বিশ্বাস করে, 'আল্লাজীনা আমানু ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহি ওয়াল্লাজীনা কাফারু ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিত্তাগুত'-যারা মুমেন তারা আল্লাহর জন্য সংগ্রাম করে, আর যারা কাফের তারা সংগ্রাম করে শয়তানের পক্ষে (সূরা নিসা)।

আশঙ্কা হয়, আমার এই আলোচনা থেকে অনেকে ধারণা করবেন, আমাদের কিছু বুদ্ধিজীবীতো করবেনই যে, মুসলমান তাহলে প্রকৃতপক্ষেই একটি যুদ্ধবাজ জাতি। কথাটা আদৌ এ-রকম নয়। অবশ্য কাফের, মুশরিকরা এই ধরনের একটি উপসংহারই পেশ করতে চায়, যা-দিয়ে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্তও করা যায়, মুসলমান ও ইসলামকে বর্বর ও সন্ত্রাসীরূপে চিহ্নিতও করা যায়। কিন্তু না, ইসলামের প্রতিপক্ষ কাফের, মুশরিক এবং পঞ্চমবাহিনীভুক্ত আমাদের বুদ্ধিজীবী পরমহংসদেবগণ যাই বলুক, মুসলমান যুদ্ধবাজও নয়, যুদ্ধপ্রিয়ও নয়। তবে এটা সত্য যে, আল্লাহর পথে যে-কোন কোরবানী পেশ করতে মুসলমান সর্বদা প্রস্তুত। প্রস্তুত না-থেকে কোন উপায় নেই, কারণ মুমেন হিসেবে পরিচয় দেবার এটা একটা শর্ত। কারণ ইসলাম যা চায় এবং মুসলমানের যা-পরিচয় তাহলো, সত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে কোন সন্ধিও নেই কোন আপোষও নেই। সেকাল-একালের আবু জেহেলদের শক্তি ও কূটকৌশল যত পরাক্রান্তই হোক, তাদেরকে সর্বত্র ও সর্বদা সমুচিত জবাবদানে বাধিত করাই মুসলমানের কাজ। মুসলমান নিজে আগ্রাসী নয়, কিন্তু কোন আগ্রাসনকে এতটুকু বরদাশত করা তার জন্য হারাম। এজন্যই ইসলামে শাহাদাতের এত মর্যাদা! কেউ কেউ হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা উত্থাপন করেন। যাঁরা করেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সন্ধিতে পৌঁছবার আগে বাইয়াতে রিদওয়ান

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে; যে-বাইয়াতের অর্থ ছিল প্রয়োজনবোধে হুদাইবিয়ার প্রান্তরে মুসলমান তার সবটুকু রক্তের নজরানা পেশ করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। অতএব হুদাইবিয়ার সন্ধিকে আল্লাহপাক-যে এক বিরাট বিজয় বলে অভিহিত করেছেন, এবং সেই বিজয় অত্যল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানদের করতলগতও হয়েছে, তার কারণ আল্লাহপাকের অপার-অফুরন্ত রহমত। আর এই রহমত অবতীর্ণ হয়েছে বাইয়াতে রিদওয়ানের কারণে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য। আসলে অন্য ইবাদত যত নিখুঁতই হোক, ইবলিসের মোকাবিলায় ভীরু ও ভয়ার্ত মুসলমানের প্রতি আল্লাহর কোন দায়িত্বও নেই, দায়বদ্ধতাও নেই। আল্লাহর কাছে সেই মুসলমান তত প্রিয়, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করবার সংগ্রামে যার ভূমিকা যত অটুট ও অবিচল। সত্য এবং ইনসাফের প্রশ্নে, দ্বীনের সসম্মান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে কঠিন অনমনীয়তাই ইসলামের প্রকৃত রূপ। অথচ আফসোস, আমরা নিজেই আজ এই অসত্য কথাটি প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করতে চাই যে, ইসলামের বিজয় ও সম্প্রসারণের মূল শক্তি ছিল তলোয়ার নয়, উদারতা। এই শিরোনামে কিছুটা বিভ্রান্তিকর একটা বইও দেখেছি।

সন্দেহ নেই, শত্রুর প্রতি ঔদার্য ইসলামের একটি প্রধান দাবী। আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন, 'যদি তোমার শত্রু শান্তির পথে অবনত হয়, তাহলে তুমিও সে দিকে আগ্রহী হও' (সূরা আনফাল)। কিন্তু কে-না জানে, দুর্বলের উদারতা সততই মূল্যহীন। শৌর্যরিক্ত উদারতা ও মহত্ব আসলে প্রতিপক্ষের কাছে করুণাভিক্ষারই নামান্তর। এই জাতীয় পৌরুষহীন উদারতা ইসলামে আদৌ গ্রাহ্য নয়। ইসলাম উদারতা দেখিয়েছে সত্য, ইসলামের বাণী ও আদর্শপ্রচারে বহু মুবাল্লিগ বহু দেশে সম্পূর্ণ খালি হাতেই কামিয়াবি লাভ করেছেন, এই কথাও সত্য; কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস একই সঙ্গে অন্য কথাও বলে। সুলতান মাহমুদ বার বার তীব্রবেগে ছুটে এসেছেন বলেই ভারতবর্ষের কোথাও কোন অলি আউলিয়া মুবাল্লিগের প্রতি কেউ চোখ তুলে তাকাতে সাহস করে নি। মুহম্মদ বিন কাসিম কি মুহম্মদ ঘোরির পরাক্রান্ত অভিযানের কারণেই মুবাল্লিগদের প্রচার-কার্যক্রম নির্বিঘ্ন হতে পেরেছিল। এমনকি হজরত শাহজালাল (রঃ), যাঁকে আমরা আলখাল্লা পরিহিত একজন নিরীহ আউলিয়া বলেই জানি, তিনিও প্রকৃতপক্ষে ছিলেন খালিদ, মূসা ও তারিকের প্রচণ্ড বিক্রমের উত্তরাধিকারী আল্লাহর পথে নিঃশেষে উৎসর্গীত একজন নির্ভীক মুজাহিদ। কারামত প্রদর্শন করে নয়,অনুপম চরিত্রমাধুর্য ও উদারতা দিয়ে নয়, এ-সকল গুণ তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, গৌরগোবিন্দকে বশে আনতে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে। এজন্যই কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেন (রাঃ) যে-আত্মত্যাগের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন, সেটা ছিল ইসলামেরই চিরন্তন অপরিহার্য দাবী। এবং এই নমুনা পরবর্তীকালের প্রতিটি মুসলমানের জন্য এক অক্ষয় প্রেরণার অফুরন্ত শক্তিকেন্দ্র। এবং এজন্যই মুসলমানের যারা দুশমন, তাদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

আজ মুমেনদের একটি মাত্র ঘোষণা-'সারা পৃথিবীর প্রতিটি ভূমি আজ কারবালা, প্রতিটি দিন আজ আশুরা'। দজ্‌লা ফোরাত দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর মহিমময় আত্মত্যাগের মধ্যে মুসলিম উম্মাহ এই নির্ভুল শিক্ষাটি লাভ করছে যে, জিহাদের ময়দান থেকে পশ্চাদপসরণেরও যেমন কোন সুযোগ নেই, কোন আনুষ্ঠানিক ইবাদতই জিহাদের মোকাবিলায় এক শতাংশ মূল্যও বহন করে না। করলে, রাসূল (সাঃ)-এর প্রিয়তম দৌহিত্র, জননী ফাতেমা (রাঃ) ও হজরত আলীর (রাঃ) প্রিয়তম পুত্র হজরত ইমাম হোসেনের (রাঃ) পক্ষে ইতিহাসের মর্মান্তিক ট্রাজেডীকে বরণ করতে হতো না। হকিকত, মারেফাত দিয়েই যদি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ এবং রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ ও উত্তরাধিকারের মর্যাদারক্ষা সম্ভব হতো, ইমাম হোসেনের চেয়ে মারেফাতি-ফয়েযের অধিক আলোকপ্রাপ্ত কল্‌বের অধিকারী আর কে ছিলেন? ইমাম পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন, কামালিয়াত মানে অপার্থিব ধ্যানমগ্নতা (মোরাকাবা) নয়, ইয়াজিদী-প্রতাপের মোকাবিলায় নিরাপদ আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকা নয়; কামালিয়াতের প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহর জন্য, কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য, আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করবার উদ্দেশ্যে যে-কোন রকমের ঝুঁকি গ্রহণে চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত থাকা। এই কামালিয়াত যিনি অর্জন করেছেন তিনিই ইনসান-ই-কামেল; যে-জমীন ও জনপদ এই কামালিয়াতে সমৃদ্ধ, কোন শত্রুর স্পর্ধা হয় না, সেই জমীন ও জনপদের দিকে চোখ তুলে তাকায়। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের কামালিয়াত শুধু খানকাহ্ শরীফের অভ্যন্তরে। আমাদের তাকওয়া পরহেজগারীর অর্থ হলো নির্দোষ ও নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট আল্লাহ-বিল্লাহ নিয়ে জীবনযাপন করা। এই জাতীয় জিকর-আজগারে, এই ধরনের হকিকত-তরিকতের বাণিজ্যিক মহিমায় ভক্ত-মুরিদের সংখ্যা যত বর্ধিতই হোক, আল্লাহপাক এই নির্ঝঞ্ঝাট নাটকীয় পরহেজগারী কী-ভাবে গ্রহণ করবেন, বলা কঠিন। তবে এটা সত্য যে, এই ধরনের মুসলমানদের ইজ্জত আব্‌রু মানসম্ভ্রম রক্ষার্থে আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি নেই; এবং রাসুল (সাঃ)এর মাদানী জিন্দিগী ও তাঁর ওফাতের পরবর্তী তিরিশ বছরের যে-ইতিহাস, সেখানে এই জাতীয় জিহাদ-নিরপেক্ষ ঝুঁকিহীন ইবাদতের কোন নমুনাও নেই। এমনকি, 'ইন্নাল্লাহা মাআসসাবিরীন' অবশ্যই ধৈর্যশীলদের সঙ্গে তিনি আছেন (সূরা বাকারা); আল্লাহপাক যখন এই কথা বলেন তার অর্থ কোন অবস্থায়ই কোন নিষ্ক্রিয় সহিষ্ণুতা নয়। তার-যে প্রকৃত অর্থ, জিহাদের ময়দানে তুমুল তান্ডবের মধ্যেও হতোদ্যম না-হয়ে দৃঢ়পদে অবিচল থাকা, এটা অনুধাবন করা কঠিন নয়। কঠিন নয়, কারণ ধৈর্যের উল্লেখ করা মাত্রই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহপাক দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেন 'ওয়ালা তাকুলু লি মাইয়ুখতালু ফি ছাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল্ আহ্‌ইয়াউ ওয়ালা কিল্লা তাশউরুন'-যারা আল্লাহর পথে শাহাদাত্ বরণ করেছে তাদেরকে মৃত বলো না; তোমরা বুঝতে পারো না, তারা জীবিত। এবং এইভাবে আল্লাহপাক কুরআনুল করীমের ছয়শতাধিক আয়াতে

www.pathagar.com

জিহাদের যে-অপরিহার্যতা তুলে ধরেছেন, তা-থেকে কোরআনের উত্তরাধিকারী মুসলিম উম্মাহ-যে কী-কারণে সবকিছু বিস্মৃত হয়ে নির্বিবাদী প্রায়-সর্বনিরপেক্ষ বাউল কি বৈষ্ণবে পরিণত হলো, এটা সমূহ চিন্তার বিষয়।

অবশ্য 'ইবলিসের চক্রান্ত খুবই দুর্বল' (সূরা নিসা)। কিন্তু দুর্বল হলেও তার বহুমুখী ও বহুবর্ণ চক্রান্তের কোন শেষ নেই। আর এমনও ইবলিস আছে যাকে ইবলিস বলে মনেই হয় না। এবং এই রকমের কিছু ইবলিসের প্ররোচনাবশতই অনেক মুসলমান আজ আপাদমস্তক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই (সূরা বাকারা); এই আয়াতাংশটি তাদের একটি বহু ব্যবহৃত ব্রহ্মাস্ত্র। আল্লাহ মালুম, তারা জেনেশুনে কথা বলে, নাকি লালন ফকিরের মত আন্দাজে-অনুমানে ও নিজের সুবিধামত ব্যাখ্যা পেশ করে সাধারণ মুসলমানকে হকচকিয়ে বিভ্রান্ত করতে চায়। সত্য যে, ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। কিন্তু কেন নেই? নেই এজন্য যে, আল্লাহপাক একই বাক্যে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, 'কাদ্ তাবায়্যীনা রুশদু ... সামীউন আলীম'। জবরদস্তি নেই তার কারণ, 'আলাদাভাবে বলেই দেয়া হয়েছে কোন্‌টা হেদায়েতের পথ আর কোনটা গোমরাহীর; অতএব যে-ব্যক্তি শয়তানী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার জন্য রয়েছে বিপদমুক্ত সুদৃঢ় আশ্রয়; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সুপরিজ্ঞাত'। এবং পরবর্তী বাক্যেই আল্লাহপাক এরশাদ করেন, তিনি মুমেনদের বন্ধু এবং মুমেনদেরকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর শয়তানের সুহৃদ কাফেরদের অভিযাত্রা আলো থেকে অন্ধকারের দিকে। এরপরও কি এটা মেনে নেয়া যায় যে, ইসলাম ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে সর্বনিরপেক্ষতার পয়গাম নিয়ে! অতএব যে-যাই বলুক, আল কোরআন, আল হাদীস আসহাবে রাসূলের অনুপম জীবন-পরিক্রমা এবং বিগত বহু শতাব্দীব্যাপী আবির্ভূত বহু মুজাহিদ ও শহীদের উষ্ণ রক্তের সাক্ষ্য থেকে এটা প্রমাণিত যে, সকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সর্বস্ব-উৎসর্গীকৃত-সংগ্রামের যে-আহ্বান, তারই নাম ইসলাম। এই আহ্বান থেকে যারা নিজে বধির হয়ে আছে এবং অপরকেও নির্বিকার বধির করে রাখতে চায়, তাদের নাম আবদুল্লাহ কি আবদুর রহমান যাই হোক, কিছু যায়-আসে না। তাদের পদবী সৈয়দ হোক, শরীফ হোক, সিদ্দিকী, ফারুকি, আলাভি যাই হোক, তারা শয়তানের পৃষ্ঠপোষক ও শয়তানের একান্ত সহচর।

অন্য একটি বিষয়ও আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। ইহুদি খ্রীস্টান মুশরেকরা-তো বটেই আমাদের স্বধর্মী অনেক কুলাঙ্গারও বিরামহীনভাবে এই অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে, মুসলমান 'সন্ত্রাসী' এবং ইসলাম রীতিমত 'সন্ত্রাসনির্ভর' এক প্রচণ্ড 'উপদ্রব'। বিশ্ববিস্তৃত নানা ধরনের মিডিয়ার কল্যাণে কাফের, মুশরিক, মুনাফিকদের এই অপপ্রচার বহুলাংশে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছে। নিঃসন্দেহে ইসলাম তার আদর্শে পর্বতের মত

www.pathagar.com

অটল ও অনমনীয়, কিন্তু তাকে সন্ত্রাসপ্রিয় আখ্যা দেওয়ার মধ্যে একটি কোন দুর্বল যুক্তিও নেই। আসলে স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় জেনে না-জেনে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করা আধুনিক পৃথিবীর একটি বড় ফ্যাশন। অনেকে মূর্খের মত বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করছে, অনেকে করছে মুশরিকদের অনুগ্রহপুষ্ট স্ব স্ব অস্তিত্বের প্রশ্ন সামনে রেখে। এই বিরোধিতার জবাব দেয়া মুসলমানের জন্য ফরজ; কারণ আল্লাহপাক বলেন, ফিত্না সমূলে উৎপাটিত না-হওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখো। অতএব মিথ্যার মোকাবিলায় কোন প্রকৃত মুমেনের পক্ষে নীরব ও নিরপেক্ষ থাকা অসম্ভব। আর এই কথা কি মুসলমানকেও বুঝিয়ে বলতে হবে যে, পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ফিত্না হলো খোদাদ্রোহিতা ও রাসূল (সাঃ)কে অস্বীকারকরত ইসলামের সুনির্ধারিত বিধান-সমূহকে মৌলবাদ-বিবেচনা। এই জঘন্য ফিত্নাকে যারা প্রসন্নমনে নিরপেক্ষতা বিবেচনা করে বিনা চ্যালেঞ্জে অব্যাহত থাকতে দেয়, ইসলামের শত্রু-দুশমনের কাছে তারা প্রিয়ভাজন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বিশুদ্ধ মুনাফিক। আর এই মুনাফিকদের আবাসস্থল যে জাহান্নামের অতল তলদেশ, সে-কথা আল্লাহও বলেছেন, আল্লাহর রাসূলও বলেছেন।

মূলত, সকল কুফরি, সকল মুশরিকী-বিশ্বাস ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আল্লাহর মনোনীত দ্বীনকে প্রতিষ্ঠাদানই মুসলমানের সর্বপ্রধান কাজ। অথচ মুসলমান নিজেই আজ আত্মবিস্মৃত; এবং এতদসঙ্গে ইসলামের প্রতিপক্ষ কাফের-মুশরিকরাও, তাদের সীমাহীন ও পৌনঃপুনিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও, এতটাই জেদী ও সত্যভ্রষ্ট এবং আত্মপ্রতারক যে, ইসলামের সর্বমানবিক নিখাদ ও নির্ভুল কল্যাণকামিতা সম্পর্কে একেবারেই গাফেল ও না-বুঝ। ইসলাম অনমনীয় বটে, সত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে কঠোরও বটে, কিন্তু এই কঠোরতা, এই অনমনীয়তা সমগ্র মানববংশের হিত ও মঙ্গলার্থেই প্রযুক্ত। একে 'সন্ত্রাস' বলে অভিহিত করা খুবই অসমীচীন, খুবই অযৌক্তিক। জননী যেমন তার সন্তানের ভালোমন্দের কথা বিবেচনা করে কখনো কখনো নির্মম হয়ে ওঠে; ইসলামও এরকমই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয় বলেই, প্রয়োজনবোধে কঠিন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়। এটা সন্ত্রাস নয়, মমতার কারণেই এই নির্মমতা; এই কাঠিন্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জননীসুলভ অপার ও অকৃত্রিম মমতা। এবং এজন্যই রাসূল (সাঃ) হলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন-সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ। পৃথিবীর দুর্ভাগ্য, সবকিছু দেখেও তার বোধোদয় ঘটে না; ইবলিসের প্রেমে ও প্রণয়ে তার হৃদয় আসলে এমনভাবে আচ্ছন্ন যে, সে আর কিছুতেই অনুধাবন করতে পারছে না, কে শুভাকাঙ্ক্ষী আর কে আততায়ী, কোন্টা সরল ও নিরাপদ দিগন্তস্পর্শী পথরেখা আর কোন্টা মহাবিপজ্জনক দস্যুর আস্তানার দিকে যাত্রা। পৃথিবীর অভিজ্ঞতা কম নয়, সত্য সত্যই সন্ত্রাস কী-জিনিষ পৃথিবী তা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছে। রুচিবান, সুশিক্ষিত ও বহুগুণে গুণান্বিত আম্বেদকার একদা আত্মপরিচয় গোপন রেখে একটি হোটেলে

www.pathagar.com

উঠেছিলেন, কিন্তু যে-কোনভাবেই হোক পরিচয় প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণহিন্দুদের দ্বারা তিনি-যে অকথ্যরূপে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও অপমানিত হয়েছিলেন, সেটা কোন সন্ত্রাস নয়; স্ত্রী-কন্যা-শিশুপুত্রসহ সর্বশেষ জার-সম্রাট নিকোলাসকে লেনিন-যে নির্বিকারভাবে সিগারেট পান করতে করতে হত্যার নির্দেশ দিলেন, সেটাও সন্ত্রাস নয়। এবং এমনকি নারী শিশু বৃদ্ধ কারো প্রতিই কোন ভ্রূক্ষেপমাত্র না-করে হিরোশিমা-নাগাসিকি-ইরাক-লিবিয়া-ভিয়েতনাম ইত্যাদিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার যে-নির্লজ্জ দায়িত্বহীন একচক্ষু দৈত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সেটাও সন্ত্রাস নয়। কাশ্মিরে নির্বিচার গণহত্যা চলছে, কসোভোতে চলছে, আলজিরিয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সুস্পষ্ট ফয়সালাকে ক্রীতদাস-মিলিটারি জেনারেলদের পদতলে নিষ্পিষ্ট করা হচ্ছে, তুরস্কেও হচ্ছে-এ-সবই মানবসভ্যতার এক-একটি অত্যুচ্চ মহিমার 'প্রীতিকর নমুনা'! অথচ ইসলামের কোন সময়ের কোন ইতিহাসে এরকমের একটিও কোন দৃষ্টান্ত না-থাকা সত্ত্বেও ইসলাম 'সন্ত্রাসনির্ভর'। আশ্চর্যই বটে, সন্ত্রাসের এমন 'নির্ভুল সংজ্ঞা' এমনকি গোয়েবল্‌স-এরও অজ্ঞাত ছিল। বলা বাহুল্য, ইহুদি-খ্রীস্টানদের প্রচারমাধ্যমসমূহ এবং তাদের বশংবদ বুদ্ধিজীবীদের এমন কুৎসিত মিথ্যাচার, পৃথিবী ইতোপূর্বে আর কখনোই প্রত্যক্ষ করে নি। এমনকি একথা বলাও অত্যুক্তি হবে না যে, বহুনিন্দিত নমরুদ, ফেরাউন, আবু জেহেল, আবু লাহাবদের উৎকট ইসলাম-বৈরিতাও ছিল এ-কালের জ্ঞানপাপী আবু জেহেলদের তুলনায় অনেক বেশি লঘু ও সহনীয়। কারণ পূর্বকালের কাফেররা যা-করেছে তা অজ্ঞতাবশত, অন্ধত্ব ও অব্যাহত কুসংস্কারবশত। কিন্তু বর্তমানকালের চেনামুখ বুদ্ধিজীবী আবু জেহেলরা, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ জেনেও, ইবলিসদের মাসোহারাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাবিক্রীত এক-একটি বেশরম কিংকর। এবং এই কুখ্যাত কিংকরদেরই একজন একদা রাসূল (সাঃ)কে 'সন্ত্রাসী' বলবার মত ঘোরতর স্পর্ধাও দেখিয়েছিল। সত্যই মস্তক ও মুখমণ্ডলে রৌপ্যের পাদুকাঘাত কিছু মানুষকে কতই-না বদ্ধ উন্মাদে পরিণত করে! এরাই তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'ওয়াল্লাজিনা কাফারু ইউকাতিলুনা ফি ছাবিলিত্তাগুত'- তাগুত বা শয়তানী চক্রান্তের সহায়ক শক্তি হিসেবে এই কাফেররা যুদ্ধ করে (সূরা নিসা)। কিন্তু আল্লাহপাক একই সঙ্গে মুমেনদেরকে একথাও বলেন, 'ইন্না কায়দাশশায়তানী কানা দায়িফা'- নিঃসন্দেহে শয়তানের চক্রান্ত বড় দুর্বল। অতএব ইসলামের মোকাবিলায় ইহুদি, নাসারা, পৌত্তলিক-তো বটেই, এমনকি আমাদের মহাবিদ্যাধর বুদ্ধিজীবীদেরও আসন্ন অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—যে শোচনীয় পরাভব-এটাই আগামীকালের সূর্যোদয়ের মত আগামীদিনের সত্য।

এটা কোন অলীক সুসংবাদ নয়, এটা সত্য। শুধু শর্ত হলো, মুসলমানকে মুসলমান হতে হবে। এবং শর্ত পূরণে যত বিলম্ব হবে, মুসলমানের জীবনে তমসাচ্ছন্ন রজনীও তত দীর্ঘ হবে। আর সারা পৃথিবীতে ছড়ানো-ছিটানো দৃশ্য-অদৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে কে

www.pathagar.com

কার পক্ষ নিয়ে রণে অবতীর্ণ, এ দিকে দৃষ্টিপাত করলেই চেনা যায়, কে কাফের আর কে মুসলমান। মানবদেহে যে-শোণিতপ্রবাহ, সেখানে সদাসর্বদা সতর্ক প্রহরায় আছে একদল শ্বেতকণিকা। এই শ্বেতকণিকার কাজ হলো, যে-কোন রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে মানবদেহকে সুস্থ ও সচল রাখা। সমগ্র বিশ্বমানববংশের প্রেক্ষাপটে মুসলমানের ভূমিকাও এই শ্বেতকণিকারই মত; সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর নির্ধারিত বিধানকে সচল রাখা ও বিজয়ী করে তোলা, এবং এরই মধ্যে নিহিত সমগ্র মানববংশের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ। অতএব এই সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তাবিধানে মুসলিম-মিল্লাতের দায়িত্ব ও কার্যক্রম খুবই পরিষ্কার। যেখানে সশস্ত্র জিহাদ প্রয়োজন, জিহাদ; যেখানে সহিষ্ণুতা কি উদারতা প্রয়োজন সেখানে উদারতা ও ধৈর্য; যেখানে ভালোবাসা প্রয়োজন, ভালোবাসা; দেশত্যাগ প্রয়োজন, দেশত্যাগ-ইসলামের সম্মান ও সুরক্ষার প্রশ্নে যেখানে যা-আবশ্যক সেটাই মুসলিম-মিল্লাতের অপরিহার্য কর্তব্যকর্ম। এটা অনুধাবন করা আদৌ দুরূহ নয় যে, রাসূল (সাঃ)-এর তেইশ বছরের নবুয়তি-জিন্দিগী এবং তাঁর সাহাবা (রাঃ)দের জীবন প্রশ্নাতীতভাবে এই কথাই প্রমাণ করে। অথচ আফসোস, মুরতাদ-মুনাফিকদের কথা স্বতন্ত্র, তারা-তো নিশ্চিতভাবেই অগ্নিময় জাহান্নামের বাসিন্দা ইসলামের প্রতিশ্রুত শত্রু; কিন্তু মুসলমানরূপী সদাসতর্ক শ্বেতকণিকাদের হলো কী? আল্লাহপাকের নূর ও রহমত এবং নেয়ামতের যারা নির্বাচিত প্রহরী, তারা নিজেই আজ নিষ্ক্রিয়, নিদ্রামগ্ন আত্মবিভক্ত, এবং এমনকি ইসলামের প্রাণঘাতী দুশমনদেরও প্রীতিভাজন সহযোগী। এমতাবস্থায় দারুণ দুঃখে অনেকদিন আগে ইকবাল যা-বলেছিলেন, আমরাও আজ কায়মনোবাক্যে সেই কথাটিই পুনরুচ্চারণ করি-'হে খোদা, তুমি মুসলমানকে নিদ্রাহীন চক্ষু ও শ্রান্তিহীন হৃদয় দান করো'। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাহবিল্লাহ।

দৈনিক ইনকিলাব : ২৫.৬.৯৯ ও ২৬.৬.৯৯

www.pathagar.com

কাশ্মীরের জয়-পরাজয়

কাশ্মীর নিয়ে পৃথিবীব্যাপী সকল মুসলমানই যথেষ্ট কষ্টের মধ্যে আছে। অবশ্য কষ্টের মধ্যে থাকাটাই স্বাভাবিক; কারণ মুসলমানের কষ্টে-সংগ্রামে যে-মুসলমান নির্বিকার থাকে, সে আকীদায়ে মুনাফিক। তাকে আল্লাহপাক ক্ষমা করবেন না বলে ওয়াদাবদ্ধ। অতএব প্রকৃত মুসলমানের কাছে এই উৎকণ্ঠা, এই প্রশ্ন ক্রমশই তীব্রতর হয়ে উঠছে, কাশ্মীর আর কতকাল পৌত্তলিকদের পদানত থাকবে? এবং এটা বাস্তব যে, রাজনীতি-পররাষ্ট্রনীতির কূটমঞ্চে দাঁড়িয়ে মুসলিম রাজা বাদশাহদের কণ্ঠে যে-অনিচ্ছুক সংলাপই উচ্চারিত হোক, কাশ্মীর স্বাধীন হতে পারবে কি আদৌ পারবে না, এ-নিয়ে বিশ্ববিস্তৃত মুসলিম উম্মাহ্‌র উদ্বেগ ও দুর্ভাবনার অন্ত নেই। কিন্তু ভারতবর্ষ কী ভাবছে, বিশ্ব রাজনীতির গতিপ্রকৃতি কী-ধরনের ইঙ্গিত প্রদান করছে, প্রতিবেশী পাকিস্তানেরই-বা কী স্ট্র্যাটেজি—এ-সব দুরূহ প্রশ্নের জবাব আন্তর্জাতিক রাজনীতি-বিশ্লেষকরা হয়ত দিতে পারেন; কিন্তু আমাদের মত স্বল্পদর্শী মানুষের পক্ষে কিছু বলা অসম্ভব, এমনকি অনুমান করাও অসম্ভব। অতএব শেষপর্যন্ত কী-ফয়সালা অপেক্ষা করছে, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আপাতত কোন গত্যন্তর নেই।

বহুকাল আগে সেই দেশবিভক্তির সময়, ডোগরা রাজা, নেহেরু, অর্ধগাদ্দার আবদুল্লাহ ও স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন মিলে মিশে যে-এক কঠিন গিঁট দিয়ে গেছেন, তা খোলা খুবই দুরূহ। অন্তত বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস এই কথাই বলে। তিন-তিনটে যুদ্ধ হলো, বহু নিরপরাধ মানুষের প্রাণক্ষয় হলো, এখনো হচ্ছে, মুজাহিদরা অকাতরে জীবন সম্পদ ও রক্তের নজরানা পেশ করেই চলেছে, কিন্তু ভারতের অন্য ক্ষতি যত বিপুলই হোক, কাশ্মীর প্রসঙ্গে তার বজ্রমুষ্টি কণামাত্রও শিথিল হয়নি। অবস্থা যেমন ছিল তেমনই আছে; বরং আরো একটু বেশি অবনতিই হয়েছে। আফসোস, এই হলো আধুনিক পৃথিবীর ইনসাফ ও বহুনন্দিত গণতন্ত্র! কিন্তু একটি ন্যায্য দাবী এভাবে পরাভূত হয় কেন, মুজাহিদদের সংগ্রাম এভাবে দিনের পর দিন কেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়? সেটাই বর্তমান আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভারতবর্ষ বলছে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং এমন কথাও বলছে, কাশ্মীরের যে-অংশটুকু পাকিস্তান ও চীনের 'দখলে', সেটুকুও ভারতের হাতে প্রত্যর্পণ করা উচিত। সত্যই রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠাকামী ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতবর্ষের ঔচিত্যবোধ নিঃসন্দেহে 'প্রশংসনীয়'! কিন্তু পাকিস্তান কী বলছে? সে বলছে, বহুকাল আগে জাতিসংঘ যে-সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, সেই ভিত্তিতে গণভোট অনুষ্ঠানের মধ্যেই কাশ্মীর-সমস্যার প্রকৃত সমাধান নিহিত। আর পৃথিবীর বড় বড় শক্তি, যারা 'গণতন্ত্র ও ইনসাফ' প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে খুবই 'আন্তরিক ও দৃঢ়পদ ও সংকল্পবদ্ধ', যারা 'মানবিক কারণে' অনেক

www.pathagar.com

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও নিরন্তর বিচলিত, তাদের কিন্তু রক্তক্ষরিত রক্তাক্ত কাশ্মীরের প্রতি সামান্য পরিমাণও ভ্রূক্ষেপ বা মনোযোগ নেই। আর কাশ্মীরীরা বলছে, কাশ্মীর কাশ্মিরীদের; কাশ্মীরের স্বাধীনতা এতদঞ্চলের জনগণের মৌলিক ও জন্মগত অধিকার। অতএব এই অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কোন হঠকারিতা নয়, নয় কোন শৌখিন সাধারণ বিদ্রোহ; এটা হলো, এই জমীন ও জনপদের শাশ্বত ও স্বতঃস্ফূর্ত দাবী। একটি মুসলিম জীবিত থাকতেও এই সংগ্রাম থেকে পশ্চাদপসরণের কোন পথ নেই।

বলাই বাহুল্য, ভারত যাই বলুক, পেশীশক্তি ছাড়া ভারতীয় বক্তব্যের দ্বিতীয় কোন যৌক্তিক ভিত্তি নেই, নৈতিক-তো নেই-ই। অপরদিকে পাকিস্তান যা-বলছে, সেটা ইনসাফের দাবী বটে, কিন্তু বিগত অর্ধশতাব্দীকাল ধরে একই কথার পুনঃপুনঃ উচ্চারণ, তার বক্তব্যের তীক্ষ্ণতাকে একেবারেই নষ্ট করে ফেলেছে। তাছাড়া অধিকাংশ সময়ই লক্ষ করা গেছে, পাকিস্তানী শাসক ও নীতি নির্ধারকেরা বেশিরভাগ সময়ই বুরবাকের মত আচরণ করে। তার সময়জ্ঞান প্রায় নেই বললেই চলে; এবং যথাসময়ে যথাব্যবস্থা গ্রহণে পাকিস্তান সর্বদাই অত্যন্ত অলস ও কুণ্ঠিত। দুই বছর পর ভারতের সঙ্গে সর্বাত্মক লড়াই যদি একটা হলোই, সেই লড়াইটা কাশ্মীরকে মুক্ত করবার তামান্না নিয়ে বাষট্টি সালে করলে কী-হতো, যখন চীনের আতঙ্কে জায়গাজমি ছেড়ে দিয়ে ভারত বীরদর্পে পালিয়ে আসছে। আসলে পাকিস্তানের উপর ভরসা রেখে কাশ্মীরী মুজাহিদদের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানো অসম্ভব। কারণ পাকিস্তান যে-নৈতিক সমর্থনের কথা বলে, তা এমন একটা বায়বীয় বাগাড়ম্বর, যা-দিয়ে কাশ্মীরের কোন প্রকৃত উপকার হবে না। হলে, এবারে একটা কিছু হতো; এবং হোয়াইট হাউস থেকে নওয়াজ শরীফকে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসতে হতো না। অতএব যে-যাই বলুক, কাশ্মীরের স্বাধীনতা এখনো দূর-ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত একটি অনিশ্চিত ভ্রূণমাত্র।

আমার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা একেবারেই অপ্রতুল। সামান্য যেটুকু অনুধাবন করি, তা-থেকে বলা যায়, ভারত এখন আর সেই পূর্বের ভারতবর্ষ নেই। এক সময় ছিল, যখন মুহম্মদ বিন কাসিম, কি মুহম্মদ ঘোরি, কি সুলতান মাহমুদের অশ্বক্ষুরধ্বনি শ্রুত হওয়া মাত্র ভারতের নৃপতিরা হয় জঙ্গলে পলায়ন করতো, নাহলে যথাসমগ্র উপহার নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যেত স্বাগত জানাবার জন্য। কিন্তু একাদিক্রমে সহস্র বৎসর প্রথমে মুসলমান, এবং পরে আরো দু'শ বৎসর ইংরেজদের পাদপদ্মে বিনীত আনুগত্যের পর ভারত এখন অন্য ভারত। চানক্যসদৃশ চতুর কূটনীতিতে সে যেমন পারঙ্গম, একই সঙ্গে অগ্নি-পৃথ্বি ও নিউট্রন-আণবিক যুদ্ধাস্ত্র নিয়েও সে এখন প্রায় মহাভারতের এক অজেয় অর্জুন। এক দশক আগেও মনে হতো, নয়াদিল্লীর সাউথব্লক শুধু ভয় ও 'ভালোবাসা' দিয়ে আবদুল্লাহ বা লেন্দুপ দর্জিদের মত কিছু মূষিককেই বশীভূত করতে পারে। কিন্তু না, ভারতের বিলোল কটাক্ষে এখন রাশিয়া আমেরিকা বৃটেন, ইসরাইল

www.pathagar.com

এমনকি চীন পর্যন্ত সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। ভারত এখন একই সঙ্গে জুলিয়স সিজর এবং রানী ক্লিওপেট্রা, এবং অবস্থাদৃষ্টে এটাও বোঝা যায়, ভারতের নীতি নির্ধারকেরা শুধু বিবেক বিসর্জন দিতেই অভ্যস্ত নয়, দৈর্ঘে-প্রস্থে আরো বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত এক বিশাল রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে-কোন ঝুঁকি নিতেও তারা প্রস্তুত। প্রয়োজনবোধে নিউট্রন কি আণবিক বোমা-নিক্ষেপেও তারা দ্বিধা করবে না। কারণ বহু অর্থ ও শ্রমক্ষয় করে ওগুলো নিশ্চয়ই যাদুঘরে মমীর মত প্রদর্শনীর জন্য তৈরী করা হয় নি, যথাসময়ে যথাস্থলে ব্যবহারের জন্যই তৈরী হয়েছে। আর এটা-তো দিবালোকের মত স্পষ্ট, ধর্মনিরপেক্ষ অহিংস ভারতের কাছে যে-কোন অস্ত্রের প্রিয়তম লক্ষ্যস্থল হলো কাশ্মীর ও পাকিস্তান। উপরন্তু মুজাহিদদের প্রতিহত করতে আর্থিক, সামরিক যত ক্ষতিই হোক, সকল সৈন্যকে বধ্যভূমিতে পাঠাতে হলেও, অর্থাভাবে পথের ভিখারী হয়ে গেলেও, দখলকৃত কাশ্মীরের এক ইঞ্চি ভূমিও ভারত ছাড়বে বলে মনে হয় না। আর কাশ্মীর শুধু মুজাহিদদেরই বাসস্থান নয়, সেখানে ফারুক আবদুল্লাহর মত অনেক কৃত্রিম দেশপ্রেমিক ও লক্ষ লক্ষ পঞ্চম বাহিনীর (Fifth Column) সদস্যও বাস করে। অতএব এই ভারতের বিশাল ক্ষুধিত মুখগহ্বর থেকে কাশ্মীর-যে খুব সহজে বেরিয়ে আসতে পারবে, মনে হয় না। আরো সময় লাগবে, আরো অনেক অনেক রক্তের নজরানা পেশ করতে হবে।

তাহলে? তাহলে কোন পথ কি নেই, যে-পথে কাশ্মীরের স্বাধীনতা-সংগ্রাম তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে পারে? আমি কোন রাজনৈতিক বিশ্লেষক নই, তবে যেটুকু অনুমান করতে পারি তাহলো, কাশ্মীরের আযাদীলাভের জন্য দু'টি উপায় এখন বর্তমান। মাত্রই দু'টি, কিন্তু আশার কথা দু'টিই অব্যর্থ। একটি হলো সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের একতাবদ্ধ চাপ, যা ভারতকে তার বর্তমান একগুঁয়েমি থেকে অবশ্যই সরে আসতে বাধ্য করবে। ভারত যদি এরপরও তার হঠকারিতা অব্যাহত রাখে, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ইরান, ইরাক, আরব-আমিরাত অর্থাৎ পুরো মধ্যপ্রাচ্যসহ ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল মুসলিম দেশ যদি ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ বয়কট ঘোষণা করে, তাদের দেশে দেশে কর্মরত ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবীকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করবার ঘোষণা দিতে পারে, বন্ধ করে দেয় তেল সরবরাহ, ভারতবর্ষের দম্ভ সর্বাধিক তিন দিনের মধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। ইসলামও এই কথাই বলে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, মুসলিম উম্মাহ একটি দেহের মত, কোথাও কোন কষ্ট কি সমস্যা দেখা দিলে পুরো মিল্লাতই অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু বদনসীব, কাশ্মীর নিয়ে কোন মুসলিম দেশেরই খুব-একটা শিরঃপীড়া নেই। এবং নেই তার কারণ, তারা আমেরিকাকে যত ভয় করে তার এক সহস্রাংশও আল্লাহকে করে না; তারা সিংহাসনকে যত ভালোবাসে তার এক সহস্রাংশও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)কে বাসে না। তারা বড় বড় মসজিদ বানাতে পারদর্শী, মাঝে মাঝে নানা দেশে খেজুর পাঠিয়ে সওয়াব অর্জন করতেও ভালোবাসে, কিন্তু আল্লাহর পথনির্দেশ ও রাসূল

www.pathagar.com

(সাঃ)-এর জীবনাদর্শের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। অতএব মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের যাঁরা কর্ণধার, কাশ্মীর প্রসঙ্গে তাঁদের নিকট থেকে ঈমানীশক্তিতে সাহসী কোন ভূমিকা বড়-একটা আশা করা যায় না।

দ্বিতীয় যে-পথটি খোলা আছে, সেটা হলো আল্লাহপাকের গায়েবি মদদ। আল্লাহপাক যদি স্বীয় অনুগ্রহে কাশ্মীরকে পৌত্তলিকদের কবলমুক্ত করে দেন, কোন শক্তি নেই তা প্রতিরোধ করে। এবং কাশ্মীরী মুজাহিদরা বহুকাল ধরে যেভাবে কোরবানী পেশ করছে, তাতে তারা আল্লাহর অদৃশ্য-অলৌকিক মদদের 'দাবীদারও' বটে। কিন্তু এখানেও কাশ্মীরীদের প্রতিকূলে একটি গুরুতর সমস্যা বর্তমান। আল্লাহপাক কেন তাঁর অলৌকিক রহমতে কাশ্মীরকে স্বাধীন করে দেবেন? আল্লাহর গায়েবী-মদদের কিছু শর্ত আছে। শুধু নামের মুসলমান হলেই এই মদদ আসে না। মুজাহিদরা বলছে, কাশ্মীর কাশ্মীরীদের, কাজেই ভারতকে এই ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে হবে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এই দাবী শুধু হাস্যকর নয়, রীতিমত অপরাধ। শুধু অপরাধ নয়, একেবারে ইসলামের মৌল দাবী ও আকীদার পরিপন্থী একটি ভয়ানক বক্তব্য! এই জমীন আল্লাহর, জমীন-তো বটেই, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর উপর একমাত্র আল্লাহরই একচ্ছত্র মালিকানা। অথচ কাশ্মীরীরা একবারও বলছে না, জমীন যেহেতু আল্লাহর, সর্বস্ব কোরবানী করে হলেও, তারা আল্লাহর জমীনে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সংকল্পবদ্ধ। কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহপাক সমস্ত লাভ-ক্ষতির উর্ধে; তবু এই প্রশ্ন উত্থাপন করা অসংগত হবে না যে, পুরোপুরি ইসলাম যদি প্রতিষ্ঠিত না-হয়, আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ দ্বীন যদি উপেক্ষিতই থেকে যায়, যদি পূর্বের মতই যথারীতি অক্ষত থাকে ইবলিসি বিধি-বিধানের প্রতাপ ও পরাক্রম, আল্লাহর কী দায় যে তিনি গায়েবী-মদদ প্রেরণ করবেন! পৃথিবীতে এখন ৫৬-টির মত মুসলিম রাষ্ট্র; কিন্তু অতি নগণ্য ব্যতিক্রম ছাড়া, কোথাও কি আছে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের পরিপূর্ণ রূপরেখা? নাই। আর এই যদি অবস্থা হয়, ধরাপৃষ্ঠে আরো একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া না-হওয়ায় আল্লাহর কিছু এসে যায় না। এই ধরনের অর্ধ-হৃদয় (Half hearted) মুসলমানের জন্য আল্লাহপাকের কোন ওয়াদা নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ পৌত্তলিক, ইহুদি বা খ্রীস্টান শাসিত রাষ্ট্রের সাথে মুসলিম রাজত্বের যদি গুণগত কোন প্রভেদ না-থাকে, তাহলে মুসলিমরূপী মুনাফিকদের চেয়ে সরাসরি বিধর্মীদের হাতেই রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেয়া পার্থিব দিক থেকেও যুক্তিযুক্ত। আর আল্লাহপাক যেহেতু 'আহকামুল হাকিমিন', তাঁর বিচার-তো আরো সূক্ষ্ম এবং পূর্ণরূপে অভ্রান্ত।

অতএব আল্লাহর রহমত ও মদদ যদি পেতে হয়, যদি পরাভূত করতে হয় পৌত্তলিক শক্তিকে, তাহলে কাশ্মীরী মুজাহিদকে প্রমাণ করতে হবে, তারা কোন বিশেষ জাতি ও ভূখণ্ডের সৈনিক নয়, তারা আল্লাহর সৈনিক; তারা আল্লাহর অখণ্ড সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

মরণপণ সংগ্রামে অকুতোভয় মর্দে-মুজাহিদ। অনেককাল আগের কথা, জিউসের মন্দিরে কোন এক পুরোহিত রজ্জুতে এক কঠিন গিঁট দিয়ে রেখেছিলেন; ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, এই গিঁট যে খুলতে পারবে সে হবে দিগ্বিজয়ী। কিন্তু গিঁটটা এমনই গিঁট যে, সবাই নাড়াচাড়া করে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসে। অবশেষে পূর্বদেশে যুদ্ধাভিযানের আগে আলেকজাণ্ডার আসলেন মন্দিরে। তিনি গিঁটটাকে একবার দেখলেন মাত্র; তারপর তরবারির এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে বললেন, এই ধরনের গিঁট এভাবে খুলতে হয়। আলোচনার শুরুতে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের বহু যত্নে ও বহু কৌশলে তৈরী এক অত্যন্ত জটিল গিঁটের কথা বলেছি, যা ছিন্ন করা কাশ্মিরীদের পক্ষে রীতিমত অসম্ভব। কিন্তু কাশ্মিরীরা যদি পুরোপুরি মুসলমান হয়ে ওঠে, তারা যদি অন্য সবকিছুর উপর থেকে ভরসা প্রত্যাহার করে নিয়ে আস্থা স্থাপন করতে পারে আল্লাহর উপর, স্বাধীনতা-পরাধীনতার প্রশ্ন নয়, তারা যদি আল্লাহর অবিভাজ্য প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাকেই জ্ঞান করে জীবনের একমাত্র ব্রত, তাদের সকল ভয়-ভরসা ও তামান্না, বিশ্বাস ও আনুগত্য, সকল আনন্দ অভিলাষ ও মহব্বত যদি আবর্তিত হয় একমাত্র আল্লাহর পথনির্দেশ ও রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করে–অলৌকিক সাফল্যের বার্তা নিয়ে আল্লাহর মদদ অবশ্যই নেমে আসবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য তাঁর প্রিয় সংগ্রামী বান্দাহদের অতীব নিকটবর্তী। এবং সেদিন অবশ্যই কোন খালিদ বিন ওয়ালিদ কি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এসে তরবারির একটি মাত্র আঘাতে রামরাজত্বলিপ্সু ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতবর্ষের সকল চাতুর্য ও দুরভিসন্ধির কঠিন গিঁটকে দ্বিখণ্ডিত করে, কাশ্মিরের আকাশ-বাতাস, নদী, মৃত্তিকা, পর্বত, উপত্যকা প্রকম্পিত করে বলে উঠবেন আল্লাহু আকবার; এবং বলবেন, এই ধরনের গিঁট এভাবেই খুলতে হয়।

বলাই বাহুল্য, এটা কোন কষ্টকল্পিত রূপকথা নয়। মুসলমানদের ইতিহাস আল্লাহপাকের মদদপুষ্ট এই বিজয়েরই ইতিহাস। কাইজার ও কিসরা, রডারিক, দাহির, পৃথ্বিরাজ, লক্ষণ সেন, গৌরগোবিন্দ এই ইতিহাসেরই এক-একটি ভূলুণ্ঠিত সাক্ষী। একেবারে সাম্প্রতিককালেও ইরানের খামেনী, আফগানিস্তানের মোল্লা ওমর, চেচনিয়ায় জওহর দুদায়েভ তাঁদের ঈমানী বীরত্ব দিয়ে সর্বকালের মুসলমানের জন্য বিজয়ের ঐতিহ্য নির্মাণ করেছেন। বহুবার এ-রকম ঘটেছে, অতএব কাশ্মীরের ক্ষেত্রে আরেকবার না-ঘটবার কোন কারণ নেই। যাঁরা বলেন, ইসরাইলসহ পৃথিবীর সব বড় বড় শক্তির সঙ্গেই ভারতের এখন দারুণ সখ্য; তার সৈন্যসংখ্যা, পরাশক্তিসমূহের সঙ্গে তার দৃশ্য-অদৃশ্য বন্ধুত্ব, বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার, নানাসূত্র থেকে বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের অব্যাহত সরবরাহ-সব মিলিয়ে কাশ্মির-তো সামান্য, অন্যতম পরাশক্তি মহাচীনও তাকে সমীহ করে। সন্দেহ নেই, এই তথ্য সঠিক, এবং খালি চোখে এটাই বাস্তবতা। কিন্তু আরেকটি বাস্তবতাও আছে। দু'হাজার বছরের অধিককাল আগে হোরেস (Horace) বলেছিলেন,

www.pathagar.com

'অন্ধ নির্বোধ পশুশক্তি এক সময় আপন ভারেই ভেঙ্গে পড়ে।' শক্তিমদমত্ত ভারত সম্ভবত সেই দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। তাছাড়া সর্বোপরি নিখাদ সত্যটি হলো, আল্লাহর অভিপ্রায়ই চূড়ান্ত। আর আল্লাহর মদদ নেমে আসলে কী-হয়, তার সাম্প্রতিকতম শিক্ষনীয় উদাহরণ সোভিয়েত ইউনিয়ন। রাশিয়া কেবল ভেজা-মার্জারের মত আফগানিস্তান থেকেই বিতাড়িত হয় নি, প্রচণ্ড চাপে তার উদর থেকে বেরিয়ে এসেছে পাঁচ-পাঁচটি মুসলিম রাষ্ট্র। অথচ তার অস্ত্রভাণ্ডার কত সমৃদ্ধ, যা-দেখে এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। আসলে আল্লাহর যা ইচ্ছা, তার প্রতিকূলে কোন শক্তিরই কোন মূল্য নেই। অতএব মুসলমানের বিজয় অবধারিত; কোন শক্তি নেই, এই বিজয়কে প্রতিরোধ করে। শুধু একটিই শর্ত, তাকে মুমেন হতে হবে। আর মুমেনের পরিচয় হলো, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর প্রতি অবিচলিত প্রস্তরকঠিন বিশ্বাস এবং জীবন ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে অবতরণ' (সূরা ছফ, সূরা হুজুরাত)। এই মুমেন হওয়াটাই একমাত্র শর্ত; দ্বিতীয় আর কোন কথা নেই। কারণ আল্লাহপাক বলেন, 'আমি মুমেনদেরকে সাহায্য করি এবং তারা বিজয় লাভ করে' (সূরা ছফ)। কোন সন্দেহ নেই, আল্লাহর অভিপ্রায় কখনো অপূর্ণ থাকে না, এবং তাঁর ওয়াদারও কোন ব্যত্যয় ঘটে না। অতএব কাশ্মির যদি ঈমানের পরীক্ষায় অবিচল দৃঢ়তা নিয়ে তার সংগ্রাম অব্যাহত রাখে-আপাতক্ষুব্ধ আপাত-কণ্টকাকীর্ণ, আপাত-নৈরাশ্যঘন পথের সীমান্তে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে এক অবশ্যম্ভাবী বিজয় ও অব্যর্থ কামিয়াবি।

দৈনিক ইনকিলাব : ৩.৯.'৯৯

www.pathagar.com

লাদিন, উসামা বিন লাদিন

লাদিন নামেই সমধিক পরিচিত; কেউ কেউ অবশ্য লাদেনও বলে, কিন্তু আরবি-উচ্চারণে লাদিনই শুদ্ধ। সে যাই হোক, আসলে লাদিন হলো প্রপিতামহের নাম, পিতার নাম মুহাম্মদ এবং নিজের প্রকৃত নাম উসামা বিন লাদিন। বর্তমান সময়ে যে-কয়েকটি কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুনিদ্রা গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে, বিন লাদিনের বিষয়টি তার অন্যতম। এবং এই মুহূর্তে 'ঈশ্বরের কাছে' আমেরিকার সর্বাপেক্ষা করুণ ও সর্বাধিক জরুরি ফরিয়াদ হলো লাদিনের গ্রেফতার অথবা মৃত্যু। সত্যই বড় কৌতুককর এই ঘটনা! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যার ভূগর্ভস্থ হ্যাঙ্গারে উড্ডয়নের জন্য সর্বদা উশখুশ করছে সহস্র সহস্র অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান, কম্পিউটারে তর্জনিস্পর্শের অপেক্ষা মাত্র, ছুটে যাবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে লক্ষ লক্ষ বিদ্যুৎগতি বোমা ও মারণাস্ত্র, যার তীক্ষ্ণতম শ্যেনদৃষ্টিসম্পন্ন গুপ্তচর সংস্থার ঘ্রাণশক্তি এত তীব্র যে, সারমেয় পর্যন্ত লজ্জা পায়, সেই 'সর্বশক্তিমান' আমেরিকা আজ বিন লাদিনের মত প্রায় নিঃসঙ্গ একজন মানুষকে নিয়ে ভয়ে-আতঙ্কে উন্মাদপ্রায়। সত্যই আল্লাহপাকের কী-অভাবনীয় রহস্য! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে, আসলেই নেকড়ের ভয়ে একাকী কোন মেষ শাবকের মতই ভয়ার্ত, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ এই অপরিহার্য আতঙ্কবশতই আমেরিকা শুধু লাদিনকে ধরে দেবার জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ-পুরস্কারই ঘোষণা করে নি, দেশে দেশে ছড়িয়ে থাকা তার সকল দূতাবাসকেও চব্বিশ ঘন্টা সতর্ক থাকবার নির্দেশ দিয়েছে। বোঝা যায়, আমেরিকার বাহুবল আছে বটে, কিন্তু সততা, চরিত্র ও ইনসাফের মত আমেরিকা তার হিম্মতও পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে। শুনেছি পাগলা গারদে অবস্থানরত রোগীদের দৈহিক স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভালো। সম্ভবত এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম যে, মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হলে শারীরিক পরাক্রম ও বল প্রায় দৈত্যের মত বেড়ে ওঠে। এবং এটাও খুব উপভোগ্য যে, একেবারে ভারসাম্যহীন ও প্রবৃত্তিতাড়িত এই স্বাস্থ্যবান পাগলগুলো যখন তখন যাকে-তাকে বুকেও জড়িয়ে ধরতে পারে, অতর্কিতে আক্রমণও করতে পারে। মানসিক হাসপাতালের এই বদ্ধ-উন্মাদদের কথা উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, এই পাগলদের সঙ্গে বর্তমান-আমেরিকার একটা হুবহু সাদৃশ্য চোখে পড়ে। দা-ভিঞ্চি যে-পরিমাণ ভালোবাসা ও মনোযোগ নিয়ে মোনালিসা এঁকেছিলেন, যুদ্ধের নীলনক্শা অঙ্কনে আমেরিকার প্রেম ও মনোযোগ তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। শত্রু-বন্ধু নির্বাচনে আমেরিকার কোন প্রকৃষ্ট মানদণ্ড নেই; সে-যে কখন কার গলা জড়িয়ে ধরবে ও কখন কাকে আক্রমণ করে বসবে, কিছুই বলা যায় না। এবং তার আক্রমণে আহত-নিহতদের নিয়ে সে একেবারে উন্মাদের মতই ভাবলেশহীন ও নির্বিকার। এজন্য বৈদ্যুতিক-চাবুক ছাড়া এই উন্মাদের মুখোমুখি হওয়া খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু সকলের যেহেতু চাবুক নেই,

www.pathagar.com

উন্মাদকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে সমীহ করাই সমীচীন। পৃথিবী এখন তাই-ই করছে। এ-নিয়ে অনেক কথা বলা যায়, উপস্থাপন করা যায় অনেক তথ্য, কিন্তু এই নিবন্ধের মুখ্য বিষয় যেহেতু উসামা বিন লাদিন, লাদিনের কাছেই ফিরে আসি।

এটা সত্য যে, আমেরিকা-তো বটেই, সমগ্র অমুসলিম শক্তির কাছেই লাদিন অত্যন্ত বিপজ্জনক। সবাই অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে আছে। অন্যেরা যদিও বিশেষ কথা বলছে না, কিন্তু সবারই মনের কথা, লাদিন নিহত হোক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের কোন অন্ধকার কারাগারে অতিবাহিত হোক তার অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল। কিন্তু লাদিনের অপরাধটা কী? কী-দোষে এই মানুষটি আমেরিকার প্রকাশ্য হত্যা-চক্রান্তের লক্ষ্যস্থল? আমেরিকাসহ প্রায় পুরো অমুসলিম বিশ্বই বলবে, শ্মশ্রুমণ্ডিত এই চল্লিশোর্ধ আরব্যযুবক বাহ্যত নিরীহ মনে হলেও, আসলে এক ভয়ংকর সন্ত্রাসী-শার্দুল, লোকটি ঘোরতর মৌলবাদী ও ঠাণ্ডা মাথার খুনী এক বিশ্বত্রাস। তাকে যে-কোন ভাবেই হোক, গ্রেফতার কি হত্যা করা বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমানবতার স্বার্থে খুবই জরুরি। হয়ত তাই; কারণ যে-শক্তিমদমত্ত আমেরিকা এই কথাটা বলছে, তার কণ্ঠরোধ করে কার সাধ্য! বস্তুতই, তার যুক্তি ও বক্তব্য উপেক্ষা বা অস্বীকার করার মত ন্যূনতম শক্তি ও সৎসাহসও আজ আর কোন রাষ্ট্রের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। যাই হোক, এটা অন্য প্রসঙ্গ; যা বলতে চাই তাহলো, লাদিন কি সত্যই সন্ত্রাসী ও খুনী? লাদিন কি সত্যই শান্তি ও মানবতার জন্য হুমকিস্বরূপ? আমেরিকা যাই বলুক অথবা আফগানিস্তানের মোল্লা ওমর যাই বলুন, এবং আমরাও আমাদের মত যাই বলি-না কেন, লাদিনের আসলে 'দোষ' একটা আছে। আর সেই 'দোষটা' হলো, সমগ্র মুসলিম-বিশ্বের মান-মর্যাদার প্রশ্নে, বাইরের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন অস্তিত্বের প্রশ্নে, খ্রীস্টান ইহুদি ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের বিরুদ্ধে তাঁর অনমনীয় ও আপোষহীন ভূমিকা। কোন রাখঢাক নেই, কোন ভয়, দ্বিধা ও সংকোচ নেই, লাদিন তাঁর এই নিরাপোষ ভূমিকার কথা অগ্নিক্ষরা কণ্ঠে ঘোষণাও করেন। বস্তুতই, মুসলিম মিল্লাতের তরক্কির প্রশ্নে তিনি এমন এক আমৃত্যু সংগ্রামী পুরুষ, শাহাদাত যাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা সুমিষ্ট ও প্রিয়তম পানীয়। আমেরিকার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক যে, সালাহউদ্দীন আইয়ুবী ধরনের এই জাতীয় গুরুতর 'অপরাধীকে' সে নিশ্চিন্তে উপেক্ষা করতে পারে না।

কিন্তু লাদিন কি সত্যই গুরুতর? তাঁর অভিপ্রায় কি সত্যই অসমীচীন ও অসংগত কিছু? এই প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হলে, আমাদের বুঝতে হবে, লাদিন কী চান? অন্য কোন অভিলাষ নেই, লাদিন চান, আমেরিকা পৃথিবীর যে-কোন স্থানে যা-ইচ্ছা করুক, আপত্তি নেই; শুধু মুসলিম বিশ্বের প্রতি তার লোভাতুর দৃষ্টিকে সংযত রাখতে হবে। তিনি চান, মুসলিম উম্মাহর সর্বনাশ-সাধনে আমেরিকার সকল অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে। এবং শুধু সউদি আরবে নয়, কুয়েত, ইরাকে নয়, পৃথিবীর যে-কোন মুসলিম রাষ্ট্রেই

www.pathagar.com

আমেরিকা ও তার সহচরদের সকল চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও আগ্রাসন, সকল ছল ও বাহানাকে রুখে দিতে হবে। আমেরিকা-তো বটেই, ইহুদি ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিও আজ যে-বন্ধুত্বের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে, সেই মুখোশও উন্মোচন করতে হবে। লাদিনের কথা, মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে পরিচালিত সকল তাগুতি-অপশক্তিকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য মুসলিম মিল্লাতকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, প্রয়োজনবোধে পেশ করতে হবে রক্তের নজরানা। এই হলো লাদিনের ঘোষণা। কিন্তু এই কথার মধ্যে অপরাধ কোথায়? লাদিন যা বলছেন, সে-তো কোরআন পাকে উপস্থাপিত আল্লাহপাকেরই নিজস্ব ঘোষণা। আল্লাহপাক বলেন, 'তোমরা আমার শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না' (সূরা মুমতাহিনা); বলেন, 'ইহুদি এবং পৌত্তলিকরাই হলো মুসলমানের উগ্রতম দুশমন' (সূরা মায়িদা)। কাজেই লাদিন নতুন কী বললেন; যা বলেন, তা কোরআনেরই হুবহু প্রতিধ্বনি। তাঁকে 'মৌলবাদী', 'সন্ত্রাসী' ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করে কিছু মানুষকে, কিছু মুসলমানকেও সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করা যায়, কিন্তু এই নীচ কৌশলে আমেরিকা ও তার ইহুদি ব্রাহ্মণ্যবাদী-সহচরদের গোপন উদ্দেশ্য কি গোপন রাখা সম্ভব! আর তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেয়া যায় যে, আমেরিকার অভিপ্রায় সর্বদায়ই অত্যন্ত 'মহৎ', তাহলেও এই প্রশ্ন উত্থাপন করা অযৌক্তিক নয় যে, 'অপাপবিদ্ধ' আমেরিকার এই বর্তমান গায়ে-পড়া পরোপকারের 'মহৎ' অভিলাষটি বর্জ-বিশেষ; এবং এই দূষিত বর্জ মুসলিম বিশ্বে নিক্ষেপ করতে বাধা দেয়া কি অন্যায়? লাদিন এই প্রতিরোধই রচনা করতে চায়।

আমেরিকা ও তার সারমেয়-সদৃশ অনুসারীরা অবশ্য বলতে পারে, 'লাদিন যদি সন্ত্রাসীই না-হবে, একান্তভাবে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণই যদি তাঁর কাম্য হয়, তাহলে তিনি তাঁর মাতৃভূমি সউদি আরব থেকে বহিষ্কৃত হবেন কেন'? প্রশ্ন বটে, কিন্তু প্রশ্নটি বালোচিত। আমরাও জানি, লাদিন আরো ভালো জানেন, সউদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বের বহু সরকার আজ এমনভাবে দেশ পরিচালনা করছে, যার সাথে কোরআন-হাদীস, সত্য সুন্দর ও ইনসাফের বলতে গেলে কোন সম্পর্কই নেই। সউদি আরব একটি ধনী দেশ। তরল সোনার কল্যাণে তার নাগরিকদের জীবন দারিদ্র্যমুক্ত বটে, কিন্তু নানাদিক থেকে এই দেশের অবস্থান ইসলামের একেবারে বিপরীত মেরুতে। আল্লাহপাক স্বীয় অনুগ্রহে দান করলেন অফুরন্ত সম্পদ অথচ ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই, সব লুটপাট হয়ে যাচ্ছে অমুসলিমদের হাতে। এবং আরো ভয়াবহ, বাদশাহ-পরিবার আমেরিকাকে যে-পরিমাণে ভয় ও সমীহ করে, আল্লাহকে তা করে না। লাদিনের কাছে এ-সবকিছু অসহ্য; তিনি সরোষে প্রতিবাদ করেন। নিজে রাজা হতে চান না, তিনি দেখতে চান হজরত উমার ফারুক (রাঃ)-এর মত একজন অকুতোভয় খলীফাকে।

www.pathagar.com

অতএব এই লাদিন যদি বর্তমান সউদি শাসকদের কাছে খুবই অসহনীয় হয়ে ওঠেন, সেটা আশ্চর্য নয়। আর লাদিনের যে-অস্থিরতা, সেই অস্থিরতা রাসূল (সাঃ)-এর মধ্যেও ছিল। তিনি বলেছেন, 'আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট নেতৃত্ব সম্পর্কে ভয় পাচ্ছি' (তিরমিযী)। বলাই বাহুল্য, এই পথভ্রষ্ট নেতৃত্ব আজ মুসলিম বিশ্বের একটি দুরারোগ্য উপদংশ। অতএব লাদিন যদি আমেরিকার করুণাপ্রার্থী আত্মবিক্রীত সউদি সরকারের কার্যকলাপকে প্রতিহত করতে চান, 'পরদুঃখকাতর' আমেরিকা যাই বলুক, ইসলাম তাকে অন্যায় বলে না। আর লাদিন যে তাঁর স্বদেশভূমি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন, সেটা মূলত আমেরিকার চাপের কারণেই। এই চাপ বর্তমান সউদি সরকার না উপেক্ষা করতে পারে, না দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করতে পারে। বরং সে এতটাই অক্ষম ও অথর্ব যে, আজ পূর্ণ এক দশক অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, অথচ একবার মুখ ফুটে বলতেও পারছে না, 'প্রিয় আমেরিকা, আমাদের অনেক উপকার হয়েছে, আর নয়, মার্কিন সৈন্য এখন প্রত্যাহার করে নিলে আমরা বাধিত হই'। আসলে ক্যাসিনো-প্লাবিত আটলান্টিক সিটি বা লাসভোগাসে ঘন্টাচুক্তি বক্ষলগ্না সুন্দরীদের নিয়ে জুয়ার আসরে মেতে থাকা মদির যে-জীবন, তার আয়ুষ্কাল সহস্র বৎসরের হলেও সেই জীবনের মূল্য কতটুকু! তার চেয়ে অলস কোন গৃহমার্জারের জীবনও অনেক মূল্যবান। মুসলিম বিশ্বের অনেক রাজা-বাদশাহ এই কথাটি আজ বিস্মৃত হয়েছেন। অতএব এই ধরনের রাজা-বাদশাহদের বিরুদ্ধে লাদিন যদি 'বোবা শয়তানের' মত নীরব না-থেকে সরোষে গর্জন করে ওঠেন, স্বার্থহানির ভয়ে সেই সাহসী কণ্ঠস্বর কিছু মানুষের কাছে যতই অপছন্দনীয় হোক, আল্লাহপাকের কাছে নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কারণ কুরআনুল করীমে ছয়শতাধিক আয়াতে যে-জিহাদের কথা বলা হয়েছে, রাসূল (সাঃ)-ও যে-জিহাদকে বলেছেন ইসলামের শীর্ষদেশ, সে এই জিহাদ; সকল অন্যায়, অসত্য, সকল জুলুম ও বেইনসাফী ও ইসলাম-বৈরিতার বিরুদ্ধে সর্বস্ব নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে-তোলার জিহাদ। এজন্যই লাদিনকে সন্ত্রাসী মৌলবাদী মানববিদ্বেষী ইত্যাদি যে-যাই বলুক, লাদিন আসলে একটি প্রকৃত-ব্যাঘ্রশাবক, একজন খাঁটি মুসলমান, মর্দে মুজাহিদ। ইকবাল বলেছিলেন, 'আলফাজ ওয়া মানি মে তাফওয়াত্ নহি, লেকিন মোল্লা কি আযান অওর মুজাহিদ কি আযান কভি এক নহি'। লাদিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে এক মৃত্যুঞ্জয়ী মুযাহিদের আযান, যে-ধ্বনি আফগানিস্তানের কোন অগম্য গিরিকন্দর থেকে উত্থিত হয়ে আজ সমগ্র বিশ্বে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত।

আমার এই বর্তমান আলোচনা থেকে এটা বোধ হয় ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, আমি একজন লাদিনভক্ত মানুষ। কিন্তু বলা আবশ্যক, লাদিনের প্রতি আমার এই আকর্ষণ মনস্তাত্ত্বিক। বিপরীতের প্রতি মুগ্ধতা মনস্তত্ত্বের একটি সাধারণ নিয়ম। এজন্যই

www.pathagar.com

রুগ্ন ভীরু দুর্বলদেহী মানুষেরাই সাধারণত বক্সিংয়ের বড় সমঝদার। আমি মুসলমান বটে কিন্তু জিহাদকে আমি বড় ভয় পাই। মনে পড়ছে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমার অনেক বন্ধু, আত্মীয় বর্ডার পার হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যখন লড়াই করছে, আমি তখন কলকাতা গল্‌ফ ক্লাব রোডে বুদ্ধদেব বসুর জামাতা, বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্তের গৃহে পদ্যচর্চা করছি ও মাঝে মাঝে কল্পনার বন্দুক দিয়ে খানসেনাদের নিধন করে চলেছি। এই হলো আমার জিহাদী তামান্না। অতএব আমি যদি লাদিনের একজন খাঁটি অনুরাগী হয়ে উঠি, অসঙ্কোচে স্বীকার করবো, সেই অনুরাগ আসলে রোগাপটকা, দুর্বলদেহী দর্শকদের কুস্তিগীরের প্রতি অনুরাগের মতই একটি বিপরীতধর্মী মনস্তত্ত্ব। যাই হোক, লাদিনের কথায় ফিরে আসি। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, লাদিনকে নিয়ে ঢাকায় একটি হাস্যরসাত্মক নাটক প্রায় জমে উঠেছিল। আমাদের এক প্রধান কবিকে হত্যার সংকল্প নিয়ে একদা যামিনীর প্রথম প্রহরে আবির্ভূত হলো দুই যুবক, লাদিন প্রেরিত দুই ভয়ংকর কমান্ডো। ওই কবি অন্য অনেকের মত আমারও প্রিয়। কিন্তু কবির দুর্ভাগ্য, লাদিনেরও দুর্ভাগ্য, নাটকটি জমতে জমতেও ঠিকমত জমলো না। ঘটনাটি না সরকারের কাছে, না জনগণের কাছে, না ইহুদি, খ্রীষ্টান শাসিত মিডিয়ার কাছে কোথাও কোনরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো। শুধু দু'একটি দৈনিক অতি ক্ষণস্থায়ী কিছু বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি করলো মাত্র। আমাদের সমূহ দুর্ভাগ্য, এমন রোমাঞ্চকর এই মেলোড্রামাটি যদি ঠিকমত জমানো সম্ভব হতো, লাদিনের 'হিটলিস্টে অন্তর্ভুক্ত' ওই ইসলাম বিদ্বেষী মেধাবী কবিবর নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতেন। কে জানে এজন্যই এই নাটকের অবতারণা কিনা! তবে এটা সত্য যে, বহুদেশ আজ লাদিনকে ভাঙ্গিয়ে 'দয়ার্দ্রহৃদয়' আমেরিকার কৃপাদৃষ্টি লাভের চেষ্টা করছে, অনেকে সফলও হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ সাম্প্রতিক কারগিল যুদ্ধের কথা বলা যায়। আমেরিকা যে পাকিস্তানের কথায় কিছুই কর্ণপাত না-করে সানন্দে ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়লো, তার অন্যতম কারণ লাদিন। ভারত যে-ভাবেই হোক, বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, পাকিস্তান-তো বটেই, সেই সঙ্গে কারগিল রণাঙ্গনে প্রভঞ্জনের মত হাজির হয়েছে মৌলবাদপুষ্ট ভয়াবহ লাদিন বাহিনী। অতএব এই লাদিন শুধু ইসরাইল-আমেরিকার নয়, ধর্মনিরপেক্ষ সাধু-ভারতেরও এক নির্মম প্রতিশ্রুত দুশমন।

যাই হোক, লাদিন সম্পর্কে যাঁরা যে-ধারণাই পোষণ করুন, একটি বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বিশ্ব মুসলিম-উম্মাহর মর্যাদা ও তরক্কির প্রশ্নে তিনি নিরাপোষ। একটি মানুষের প্রকৃত পরিচয় কী, এটা নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে তার অন্তর্নিহিত গোপন আকাঙ্ক্ষার দর্পণে। অর্থাৎ মানুষটি বাহ্যত যাই হোক, তার গোপনে লালিত অভিপ্রায়ের খবর পেলে তাকে সঠিকরূপে শনাক্ত করা যায়। লাদিন সম্পর্কেও আমরা এই নিয়মে

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তে আসতে পারি। বিন লাদিন কি খ্যাতি ও ক্ষমতার প্রতি দুর্বল? তিনি কি রাজা হতে চান? অথবা পৃথিবীর বহু নেতার মত তিনি কি কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি লুব্ধ? না, এর কোনটাই নয়। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না, খ্যাতি, ক্ষমতা, নাম, যশ অর্থ কি নারী কোনদিকে তাঁর কণামাত্র মনোযোগ আছে। যদি থাকতো, তিনি তাঁর শত শত কোটি ডলারের সম্পদ 'উন্মাদের' মত উড়িয়ে দিতেন না; যদি থাকতো, মাঝে মাঝে তিনিও লাসভেগাসে যেতেন; যদি থাকতো, তাঁর পক্ষে সউদি আরবের নীতিনির্ধারক একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী হতে কোন বাধা ছিল না। এবং লাদিনের মধ্যে একটিও যদি পার্থিব কোন দুর্বলতা থাকতো, সেই রন্ধ্রপথে সরিসৃপের মত প্রবেশ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে সহজেই দংশন করতে সক্ষম হতো, পৃথিবীর অন্য বহু নেতার মত লাদিনকেও বশীভূত করে ফেলতো। কিন্তু না, আল্লাহর জমীনে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অদম্য অভিলাষ ছাড়া তাঁর দ্বিতীয় কোন লক্ষ্যই নেই। জীবন তাঁর কাছে ডলার বা মনিকাদের উষ্ণ সঙ্গসুখ উপভোগের বস্তু নয়, জীবন তাঁর কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ তীব্রতা নিয়ে উৎসর্গের বস্তু। লাদিনের দ্বিতীয় কোন সাধ নেই; তাঁর সমগ্র অন্তর জুড়ে শুধু একটাই লোভ, জীবনের সর্বোচ্চ সাফল্য। কুরআনুল করীমের ভাষায় 'ওয়া রিদওয়ানুম মিনাল্লাহি আকবার জালিকা হুয়াল ফাউজুল আজীম'- আল্লাহর সন্তুষ্টিই জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাফল্য (সূরা তাওবাহ)। অতএব এই লাদিনকে-যে ভয় দেখিয়ে বশ করা যাবে না, এতটুকু লক্ষ্যভ্রষ্টও করা যাবে না, এই কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। এবং এজন্যই আপন স্বার্থ ও 'সম্মান' রক্ষার তাগিদে, আমেরিকা এখন সকল নিয়ম ও শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে লাদিনকে গায়ের জোরে নিশ্চিহ্ন করতে সংকল্পবদ্ধ। কিন্তু এই 'গায়ের জোর' বস্তুটাই একটি নিকৃষ্ট বস্তু; বিশেষ করে নিকৃষ্টজনের শরীরে যদি এই পরাক্রম সঞ্চিত হয়, সেটা খুবই বিপজ্জনক। অনেকে অস্বীকার করলে করতে পারেন, কিন্তু এটা সত্য যে, আমেরিকার কোনদিক থেকেই কোনরূপ মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয় নি। অবশ্য হওয়ার কথাও নয়, কারণ ইয়োরোপের নানা অঞ্চল থেকে বিতাড়িত দস্যু তস্কর, উগ্র অপরিণামদর্শী যুবকদের দ্বারা গঠিত একটি জাতির পক্ষে মোটামুটি নৈতিক মানে উত্তীর্ণ হবার জন্য তিন-চার'শ বছর খুবই অল্প সময়। অতএব যত্রতত্র কারণে-অকারণে হঠকারিতা ও শক্তিপ্রয়োগ ছাড়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের অন্য কোন পথ এই স্বভাব-মস্তান আমেরিকার জানাই নেই। উপরন্তু পাশবিক বিক্রম ও অস্ত্রের একটি ক্ষুধা আছে, একটি ভাষাও আছে। এই ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য অস্ত্রের সর্বদায়ই কিছু মনুষ্যরূপী নিরীহ হরিণশাবকের সন্ধানে মাঝে মাঝেই যেমন মৃগয়ায় নামা আবশ্যক, ভাষা-বিনিময়ের জন্যও চাই কিছু নিরীহ নিরস্ত্র মানবসন্তান। আর এই ধরনের অস্ত্রবাজ মাস্তানদের ঔচিত্যজ্ঞান না-থাক আত্মসম্মানবোধ খুব প্রখর হয়। অর্থাৎ আমেরিকার যে-কোন জবরদখল ও গ্রাম্য মোড়লিপনার বিরুদ্ধে কথা বললে

www.pathagar.com

তার আত্মাভিমানে বড় লাগে। এই হেতু, অপর দেশের ভালোমন্দ নিয়ে অধিক পরিমাণ নাসিকা-প্রবেশ থেকে বিরত থাকার কথা বললে, আমেরিকা সে-অপমান সহজে সহ্য করে না। এই কারণেও লাদিন আমেরিকার কাছে অসহ্য ও সার্বক্ষণিক শিরঃপীড়ার কারণ। কারণ সাম্প্রতিক বিশ্বে সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হলো লাদিন।

লাদিনকে চোখে দেখার সুযোগ হয় নি, ভবিষ্যতেও সেই সম্ভাবনা নেই। তবে ছবি দেখেছি। আরবরা দেখতে এমনিতেই খুব সুন্দর, লাদিন আরো সুন্দর। বিশেষ করে, তাঁর দু'টি গভীর চোখ যুগপৎ এত উজ্জ্বল ও সাহসী এবং মর্মভেদী, একই সঙ্গে অমায়িক কিন্তু এত বেশি রশ্মিচ্ছটায় বিভূতিময় যে, সরাসরি চোখের দিকে চোখ তুলে তাকানোই কঠিন। কোন পাঠক হয়ত আমার এই বর্ণনাকে অতিরিক্ত অনুরাগের অতিরঞ্জিত উক্তি বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। অবশ্যই পারেন, কিন্তু আমার কাছে এরকমই মনে হয়েছে। অনেকদিন আগে, ইরানের ইসলামী বিপ্লবের পরপরই একজন বিশিষ্ট মার্কিন সাংবাদিক কোমে এসেছিলেন ইমাম খোমেনীর সাক্ষাৎকার নিতে। ফিরে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, ইমামের দু'টি চোখ থেকে এমন এক আলো সর্বদা ঠিকরে বেরুচ্ছে যে, তাঁর সঙ্গে সর্বদা চোখ নামিয়ে কথা বলতে হয়। অবশ্য এটা নতুন কথা নয়, সাধারণ দৃষ্টিতে বিস্ময়কর বটে কিন্তু এই রকমই হয়। আল্লাহপাক বলেন, 'ওয়াত্তাকু ফিরাসাতাল মুমিনীন'; বাংলা করলে দাঁড়ায়, তোমরা মুমিনদের দৃষ্টিকে ভয় কর। এবং লাদিন কি খোমেনী, তাঁরা-তো সেই মুমিন যাঁরা আল্লাহর রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহপাকের ঘোষণা, 'তোমরা আল্লাহর রঙে নিজেকে রাঙিয়ে নাও, আল্লাহর চেয়ে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে' (সূরা বাকারা)। এবং এইভাবে যে-মুমেন নিজেকে রঙিন করে তোলেন, তাঁর হাত-চোখ-কান ইত্যাদি সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আল্লাহর হয়ে যায়। অতএব খুব স্বাভাবিক যে, এই আল্লাহওয়ালাদের চোখে নির্ভয়ে ও স্পর্ধাভরে চোখ রাখা কঠিন, কোন কোন সময় অসম্ভবও বটে।

যাই হোক, লাদিন এখনো সম্ভবত আফগানিস্তানেই আছেন। মোল্লা ওমরকে আন্তরিক মোবারকবাদ যে, শত হুমকি সত্ত্বেও তিনি এই সম্মানিত মেহমানকে কারো হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রত্যাখ্যাত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জিদ অবশ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচণ্ড উষ্মা নিয়ে সে এখন দন্তনখরহীন ক্লীব জাতিসংঘকে দিয়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটি সম্পূর্ণ অনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে কৃতকার্য হয়েছে। তা-হোক। মুমেনদের হেফাযতের জন্য আল্লাহপাকই যথেষ্ট। আফগানিস্তান বহুদিন একাদিক্রমে রুশভল্লুকদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, সেই যুদ্ধে লাদিনও ছিলেন। আজ আবার নতুন পরীক্ষা শুরু হলো। এই পরীক্ষাতেও আফগানরা সফলকাম হবে ইনশাআল্লাহ। মুসলমানদের-তো হারাবার কিছু

www.pathagar.com

নেই। পৃথিবী যাকে ক্ষতি ও মুসিবত বলে গণ্য করে, আল্লাহর পথে সেই ক্ষতি ও মুসিবতই মুসলমানের কাছে অপরিমেয় মুনাফা। আল্লাহর পথে সর্বস্ব নজরানা দেয়াই জিন্দিগীর সর্বোচ্চ কামিয়াবি। পৃথিবীর সামনে এই তওহিদী চেতনার শাশ্বত আলোকবর্তিকা আবার নির্ভয়ে তুলে ধরলো আফগানিস্তান ও তার সম্মানিত মেহমান সুখ-দুঃখের অকৃত্রিম বন্ধু উসামা বিন লাদিন।

অবশ্য লাদিনকে নিয়ে আমাদের সকলের প্রতিক্রিয়া এক রকম নয়। আমাদের এক আধা-বুদ্ধিজীবী সহকর্মী বন্ধু আমাকে একদা বললেন, 'কোথায় তোমার লাদিন? সে এখন প্রাণভয়ে কোথায় কোন্ গহীন অরণ্যে কি গিরিগুহায়-যে পালিয়ে আছে, কোন খবর নেই।' আমি বল্লাম, 'তুমি মুসলমান, তোমার এতে খুশি হওয়ার কী আছে? জেনে রাখো, সালাহউদ্দীন কি মুজাদ্দিদ আলফেসানী, নূরুদ্দিন জঙ্গী কি জওহর দুদায়েভ, এরা কখনো মরে না, হারিয়েও যায় না। আরো মনে রেখো, তুমি আমি যত সহজে পালিয়ে থাকার কথা বলছি, আমেরিকা তা বলছে না। কারণ কোন গৃহে একবার ফনা-উত্তোলিত একটি গোখরো ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে আবার কোথায় কোন্ দূর অরণ্যে কি ভূগর্ভে হারিয়ে গেলেও, বহুদিন পর্যন্ত ওই গৃহবাসী সকলের ঘুম হারাম হয়ে যায়।' আর লাদিন তো এক চলমান মুজাহিদ; ইসলামের প্রতিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে সদাজাগ্রত এক শার্দূল। আমাদের যেহেতু ভয় নেই, আমরা নানা কথা বলতে পারি। কিন্তু যারা উসামা বিন লাদিনের লক্ষ্যস্থল, আক্ষরিক অর্থেই তাদের চোখে ঘুম নেই, আমেরিকার-তো একেবারেই নেই। অবশ্য আমেরিকার এই অস্থিরতা সমগ্র পৃথিবীর জন্য কিছুটা দুর্ভাবনারও বিষয়। কারণ এটা দেখা গেছে, ভয়ার্ত প্রতিপক্ষ বেশি-সময় সহিষ্ণুতা ধরে রাখতে পারে না। অতএব লাদিনের প্রতি পুঞ্জীভূত ক্রোধ ও অসূয়া নিয়ে ভয়ার্ত-আমেরিকা হঠাৎ কখনো আফগানিস্তানকে আক্রমণ করেও বসতে পারে। অথচ আমেরিকার এখন উচিত আত্মসংশোধনে প্রবৃত্ত হওয়া; উচিত, পরহিতৈষীর অভিনয় না-করে সত্য সুন্দর ও ইনসাফের অনুরক্ত হওয়ার চেষ্টা করা; উচিত, বিশ্বনেতৃত্বের প্রশ্নে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা; সর্বোপরি উচিত, ইসলাম-বৈরিতা পরিত্যাগ করে একটি ইনসাফ-নির্ভর সুস্থ বাসযোগ্য পৃথিবী নির্মাণের ক্ষেত্রে সবার সঙ্গে মিলেমিশে যথাযোগ্য ভূমিকা রাখা। কিন্তু এ-সকল সদুপদেশ কি আমেরিকার কাছে গ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য হবে? হবে-না। হবে-না তার কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামক পুরো দেশটাই আসলে একটি উন্মাদাশ্রম, একটি পুরোপুরি পাগলের দেশ। পাঠক ভাববেন-না, কথাটা নিতান্তই বিদ্বেষবহ অত্যুক্তি। অত্যুক্তি নয়, এই কথাটাও আক্ষরিক অর্থে সত্য। মোটামুটি জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, শুধু নিউইয়র্ক শহরেই এখন বাস করে দুই লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার বদ্ধ উন্মাদ। কল্পনা করা দুঃসম্ভব, তাহলে পুরো আমেরিকাতে এই সংখ্যা এখন কত!

www.pathagar.com

অতএব এই আমেরিকা যদি সকল নৈতিক-শাসনের পুরোপুরি অবাধ্য হয়ে ওঠে, সেটা আশ্চর্য নয়। শুধু দুঃখ হয় এই ভেবে যে, এই প্রবৃত্তিতাড়িত দুষ্টমতি বালক তার ভবিতব্য জানে না। সে জানে না, সারা পৃথিবী থেকে নানা ছলে ও কৌশলে হাতিয়ে নেয়া লুণ্ঠিত সম্পদ ও গায়ের জোর নিয়ে বেশিদিন টিকে থাকা যায় না। গেলে, রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটতো না, ভেঙ্গে পড়তো-না রাশিয়াও। অতএব লাদিনকে এক অর্থে আমেরিকার সুহৃদই বলা যায়, যিনি এই শক্তিমদমত্ত অদূরদর্শী বালকটিকে সকল চালাকি, মিথ্যা ও নর্তন-কুর্দন থেকে, যে-কোন উপায়ে হোক, বিরত রাখতে চান। আর বিশ্বব্যাপী সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের জন্য বিন লাদিন আল্লাহপাকের একটি বিশেষ নেয়ামত। এই অকুতোভয় মুজাহিদ মুসলমানকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, ইসলাম ছাড়া ধর্তব্য কোন বিধান নেই; কাফের মুশরিকদের করুণাপ্রার্থী হয়ে টিকে থাকা ও বিবরবাসী মূষিকের বেঁচে থাকার মধ্যে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, মুসলমানের জিন্দিগী-যাপনের প্রক্রিয়া ও তাৎপর্যই আলাদা। কারণ আল্লাহপাক এরশাদ করেন, মুমেনের এই পার্থিব জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে তিনি ক্রয় করে নিয়েছেন। অতএব শত্রুকে আঘাত করা ও শত্রুর প্রতিঘাতকে সহাস্যে বরণ করে নেবার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, মুমেনের এই পার্থিব জিন্দিগীর সর্বোচ্চ সার্থকতা।

মৃত্যুর ফয়সালা একমাত্র আল্লাহর হাতে; বিন লাদিন এই কথাটি শুধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন তাই নয়, তিনি তাঁর নিজের জীবনে অলৌকিক অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে এই সত্যটিকে প্রত্যক্ষও করেছেন। মৃত্যু যখন আসবে, আসবে; আমেরিকার চক্রান্ত ও চেষ্টা-তদবিরের উপর তার আসা না-আসা নির্ভর করে না। অতএব আল্লাহর ইচ্ছায় যতদিন জীবিত আছেন, লাদিন তাঁর কাজ করে যাবেন নির্ভয়ে ও নিরুদ্বেগে। ক্লিনটন কি বাদশাহ ফাহাদের রক্তচক্ষু লাদিনের ওষ্ঠে কিছুটা হাসির উদ্রেক করে মাত্র, কিন্তু কারো কথায় কর্ণপাত করা তাঁর কাজ নয়। ১৯৭৯ সাল থেকে তিনি সশরীরে জিহাদের ময়দানে। গালিব কি রবীন্দ্রপ্রেমীদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব, যৌবনের সোনাঝরা দিনগুলো একটি মানুষের শুধু রণে রণেই কেটে গেল! আসলে লাদিন এক আপাদমস্তক আজন্ম মুজাহিদ। তিনি এমন এক পিতার সন্তান, যে-পিতা শুধু ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্য ১২ মিলিয়ন মার্কিন-ডলারই রেখে যান নি, সেই সঙ্গে তাঁর ঔরসজাত ২৫টি ব্যাঘ্রশাবকও ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। বিন লাদিনকে আমেরিকা বুঝতে ভুল করেছে, ভীরুতা ও মোনাফেকীর কারণে বহু মুসলমানও তাঁকে ভুল বোঝে। কিন্তু লাদিনের একটিই কথা, যারা আল্লাহর নূরকে মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, তাদের শবদেহে মুখাগ্নি করাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। এজন্য শেষ কপর্দক ও শেষ রক্তবিন্দু নিয়ে তিনি প্রস্তুত। আমেরিকার বড় ইচ্ছা, ধরাপৃষ্ঠে একটি নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করা। এই নববিধান যে কী-জিনিষ তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে এটা পরিষ্কার যে, ক্রুসেড চলেছিল একাদিক্রমে একশ' সাতাত্তর বৎসর; আমেরিকা তার নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের ছদ্মবেশে ইসলামের বিরুদ্ধে সরবে-নীরবে সেই ক্রুসেডকে আবার প্রজ্জ্বলিত করতে চায়। লাদিন বলছেন, 'এটা হবে না, হতে দেয়া হবে না'। কিন্তু এই কথা কি খুবই অসমীচীন, খুবই অযৌক্তিক? নিশ্চয়ই নয়। কারণ আল্লাহর পথনির্দেশ ও রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শকেই যাঁরা মনে করেন পৃথিবীর সকল রোগের একমাত্র নির্ভুল প্রতিষেধক; যাঁরা মনে করেন, সমগ্র বিশ্ব-মানববংশের জন্য কোরআন এবং হাদীসই একমাত্র বিধান ও একমাত্র হেদায়েত, তাঁরা-কি কোনভাবেই কোন-কারণে আমেরিকার নববিধানকে গ্রহণ বা সমর্থন করতে পারেন? পারেন না। পারলে হয়ত আমেরিকার প্রীতি ও অনুকম্পা লাভ করা সহজ হয়; কিন্তু তাহলে-তো শত-প্রকার যুক্তির জোড়াতালি দিয়েও আর মুসলমান থাকা যায় না। লাদিন একজন প্রকৃত মুসলমান। তিনি পৃথিবীতে চিরকাল থাকবেন না; যথাসময়ে তিনি আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবেন। কিন্তু খুবই প্রীতিকর যে, লাদিনকে ইতোমধ্যেই আল্লাহপাক অক্ষয় অমরত্বের শিরোপা পরিয়ে ভূষিত করেছেন ইতিহাসের এক মহানায়করূপে। জাফর তাইয়ার, খালিদ বিন ওয়ালিদ, মুসান্না, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, সালাহউদ্দীন আইয়ুবী প্রমুখ অমর অবিস্মরণীয় মুজাহিদদের পাশে আর একটি যে-নাম আজ আবার সোনার কালিতে চিরদিনের জন্য লেখা হয়ে গেল ; সেই স্বর্ণপ্রভ নামটি লাদিন, উসামা বিন লাদিন।

পালাবদল : ঈদসংখ্যা, ২০০০

www.pathagar.com

ইসলামের শত্রুমিত্র এবং ইরাক প্রসঙ্গ

ইসলাম ও মুসলমানের উগ্রতম শত্রু হলো মুশরিক ও ইহুদি। কথাটা আমার নয়। আল্লাহপাক স্বয়ং এরশাদ করেছেন, 'লাতাজিদান্না আশাদ্দান্নাসি আদা ওয়াতাল্লিল্লাজিনা আমানুল ইয়াহুদা ওয়াল্লাজিনা আশরাক'-আপনি দেখবেন, মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় সব মানুষের মধ্যে ইহুদি এবং মুশরিকরাই সর্বাধিক উগ্র (সূরা মায়িদা)। এবং আল্লাহপাক এই কথাও বলেছেন, 'ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু লা-তাত্তাখিজু আদুব্বি ওয়া আদুওয়াকুম আউলিয়া' হে মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না (সূরা মুমতাহিনা)। কোন অস্পষ্টতা নেই, কোন ইশারা-ইংগিত নয়, একেবারে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী, অকাট্য নির্দেশ। এই নির্দেশ অমান্য করার অর্থ কোরআন শরীফকেই অমান্য করা; এবং তার পরিণতি-যে খুবই ভয়াবহ, সেই দুঃসংবাদের কথা আল্লাহপাক অসংখ্যবার ঘোষণা করেছেন। ইরাকের বর্তমান দুঃসময়ের প্রেক্ষিতে বিষয়টি উল্লেখ করতে হলো। অবশ্য কেবল ইরাক নয়, সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের জন্যই এই অপরিহার্য পথনির্দেশ অবশ্যমান্য; অন্যথায় আখেরাতের-তো প্রশ্নই ওঠে না, পার্থিব জিন্দিগীতেই জিল্লতি যন্ত্রণা ও দুর্বহ গ্লানির 'মধুর আপ্যায়ন' অবশ্যম্ভাবী।

বাস্তব কারণেই ইরাক-তো বটেই, বিশ্বব্যাপী সমগ্র মুসলিম উম্মাহই আজ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন, কারণ অস্থির ও উত্তপ্তমস্তিষ্ক আমেরিকার মতিগতি আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। কফি আনান এবং চীন-রাশিয়া-ফ্রান্স-এর কথঞ্চিৎ প্রতিবাদের কারণে আমেরিকা যদিও তার স্বভাবসুলভ জিঘাংসা ও বন্যতা চরিতার্থ করতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু শেষপর্যন্ত কী-হয় বলা কঠিন। আল্লাহপাকের কী অভিপ্রায় তিনিই জানেন; হতে পারে, ইরাক আবারও ইহুদি-প্রভাবিত আমেরিকার তীব্রতম লক্ষ্যস্থলে পরিণত হলো। কিন্তু ইরাক-যে বিশ্বরাজনীতির জুয়াখেলায় পরাভূত হয়েছে তা নয়; অথবা ভ্রাতৃপ্রতিম কুয়েত আক্রমণের যে-হঠকারিতা, সে এখন তারই তিক্ত ফসল ঘরে তুলছে, সেটাও নয়-প্রকৃত কারণ হলো, আল্লাহপাকের পরিষ্কার নিষেধ সত্ত্বেও ইরাক তার 'জানি দোস্ত' হিসেবে গ্রহণ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। এবং এই 'বন্ধুর' জন্যই সে ইরানের সঙ্গে দীর্ঘকাল একটি নিরর্থক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল; আর এই 'বন্ধুর' গোপন উৎসাহবশতই সে কুয়েত অধিকারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। সে বুঝতেই পারে নি, তার অকৃত্রিম বন্ধু আসলে এক ছদ্মবেশী আততায়ী। অতএব ইরাকের উপর যে-কঠিন জিল্লতি ও যন্ত্রণা ও অকথ্য বিপর্যয় নেমে এসেছে; এবং আরো অধিক পরিমাণে নেমে আসবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তার একমাত্র হেতু আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি ঘোরতর উপেক্ষা ও অবজ্ঞা। এবং এই ধরনের দুর্মতির কী গুরুতর পরিণতি ঘটে, বর্তমান ইরাক তারই এক শোচনীয় দৃষ্টান্ত। আর একথাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আল্লাহর নির্দেশাবলী সজ্ঞানে লংঘন করে নিজের পছন্দ ও আপাত-সুবিধাজনক কূটনীতি-গ্রহণ এমন এক গুরুতর

www.pathagar.com

অপরাধ যে, হজরত বড়পীর সাহেব (রঃ)-এর পবিত্র মাযার জিয়ারত করে বা পবিত্র কালেমাখচিত পতাকা উত্তোলিত রেখে, সেই অপরাধজনিত গ্লানির কোন উপশম ঘটে না। উল্লেখযোগ্য, খলীফা মুতাসিমবিল্লাহর সময় হালাকু খানের নৃশংস আক্রমণের পর থেকে অদ্যাবধি ইরাক বিশেষ কোন দুর্যোগ ও লাঞ্ছনার শিকার হয় নি। বরং দজলা-ফোরাতের অববাহিকায় একদিকে শ্যামল সবুজ শস্যক্ষেত্র, অন্যদিকে ভূগর্ভে সঞ্চিত সাগরসদৃশ তৈলরাশির অগাধ-অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে ইরাক ছিল এক সুখের স্বর্গরাজ্য। অথচ দুঃখের কথা, আল্লাহপাকের এই অপার নেয়ামত, এই অপার অনুগ্রহের জন্য ইরাকের মধ্যে কৃতজ্ঞতার কোন প্রকাশ ছিল না। অথচ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর মোকাবিলায় যে-মুসলমান চিহ্নিত কাফের-মুশরিকদেরকে সুহৃদ ও শুভাকাঙ্ক্ষীরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহর না-শোকরি নিয়ে কামনা করে রাশিয়া আমেরিকার বন্ধুত্ব, তারাই-তো সূরা নাহল-এ ঘোষিত এই আয়াতের লক্ষ্যস্থল, 'ফা আজা কাহাল্লাহু লিবাছাল জুই ওয়াল খাউফি বিমা কানু ইয়াছনাউন'-আল্লাহ তাদের উপর (নাশোকরকারীদের) শাস্তি চাপিয়ে দিলেন এবং পরিয়ে দিলেন ক্ষুধা ও ভয়ের পোষাক তাদের কার্যকলাপের জন্য (সূরা নাহল)। দীর্ঘ আট বছরের অব্যাহত অবরোধ, অপমান, ক্ষুধা-ব্যাধি ও ভয়ের লেবাস-পরিহিত ইরাককে দেখে বোঝা যায়, আল্লাহর শাস্তি সত্যই কত অকাট্য, কত অবধারিত। সন্দেহ নেই, বিশ্বরঙ্গমঞ্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অতি নোংরা ও অত্যন্ত কুটিল চরিত্রের এক খলনায়ক। কিন্তু তাকে দোষ দেব না; কারণ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ-মুসিবতের আগমন সম্ভবই নয় (সূরা তাগাবুন)। ইরাক যে-মুসিবতে এখন আক্রান্ত, এই পরিণতি তার নিজস্ব উপার্জন। কারণ 'নাছুল্লাহা ফানাছিয়াহুম'-তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছে (সূরা তাওবাহ)। নাহলে আল্লাহপাক যাদের সঙ্গে আছেন, সমগ্র পৃথিবীর সাহস কী যে, তাদের দিকে চোখ তুলে তাকায়!

অবশ্য সুখের কথা, ইরাকের ধীরে ধীরে বোধোদয় ঘটেছে। অনেক মূল্য দিয়ে হলেও সে এখন বুঝেছে, আল্লাহর শত্রুদের সাথে সখ্যস্থাপন আসলে আত্মহত্যারই নামান্তর; এবং এই ধরনের সখ্য আল্লাহ-নির্ধারিত ইসলামী-কূটনীতির এক বিপজ্জনক বরখেলাপ। মওলানা রূহুল আমীন খান ইরাক ভ্রমণশেষে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুদিন পূর্বে লিখেছিলেন-সহস্র বাধা ও বৈরিতাসত্ত্বেও ইরাক আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সব ক্ষয়-ক্ষতির চিহ্ন মুছে গিয়ে সে এখন আগের চেয়েও সুন্দর, সমগ্র ইরাক এখন আত্মশক্তিতে বলীয়ান ও স্বাবলম্বী, ইরাকের প্রতিটি মানুষ এখন এক-একজন তওহিদী সিপাহসালার। এই দুর্জয় ঈমানী-চেতনা যদি অব্যাহত থাকে, শত ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যেও যদি ইরাক তার জীবন ও জীবনাদর্শের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)কে আঁকড়ে ধরে থাকতে ব্যর্থ না-হয়, ক্লিনটন ও টনি ব্লেয়ার-তো সামান্য, সমগ্র বিশ্বের সম্মিলিত শক্তিও ইরাকের কেশাগ্র স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। এই লক্ষণ

www.pathagar.com

ইতোমধ্যেই যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের ভূমিকা ও মতামত এখন ইরাকের অনুকূলে; মিশর, আরবসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এখন মার্কিনী উন্মাদনার বিপক্ষে দণ্ডায়মান। এমতাবস্থায় শুধু ইসরাইল ও পোষা-সারমেয় সদৃশ বৃটেনকে নিয়ে আমেরিকা খুব-একটা সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারছে না। রিচার্ড বাটলারও খুব আশাহত, বিশ্বব্যাপী ইসলাম-বিদ্বেষীদেরও আশাভঙ্গ ঘটেছে। অবশ্য এটাও সত্য যে, ক্লিনটন যেহেতু একজন কুখ্যাত, নির্লজ্জ বিশ্বলম্পট, তার মধ্যে সদর্থক সাহসের অভাব থাকলেও, বিবেকহীন হঠকারিতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সে যে-কোন মুহূর্তে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত আক্রমণ করেও বসতে পারে। এবং এই আশঙ্কা অমূলক-তো নয়ই বরং খুবই প্রবল; কারণ বেশ্যাসক্তি ও লাম্পট্যের যে-অমোচনীয় অক্ষয় কলঙ্কচিহ্ন ক্লিনটনের চরিত্রে স্থায়ীভাবে খোদিত হয়েছে, ক্লিনটন সেই চিহ্ন কিছুটা হলেও গৌণ করে তুলতে চায়। সম্ভবত এই লক্ষ্য-অর্জনে ক্লিনটন এখন পৃথিবীবক্ষে ট্রুমানের মত দ্বিতীয় একটি হিরোশিমা-ম্যাচাকার মঞ্চস্থ করতে সংকল্পবদ্ধ। আর ইরাক এই ক্রূর-সংকল্পেরই সহজ লক্ষ্যস্থল। অতএব কী হয় না-হয় বলা মুশকিল।

কিন্তু আশার কথা, ইরাক যদি আল্লাহকেই একমাত্র সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণকরত পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে যে-কোনরকম কোরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকে, ক্ষতি যাই হোক, ইরাকের ইজ্জত আল্লাহপাক অবশ্যই রক্ষা করবেন। কারণ তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, 'ফা ইয়াদনাল্লাজীনা আমানু আলা আদুব্‌বিহিম ফা আছবাহু জাহিরীন'-আমি মুমেনদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য দান করি এবং তারা জয়যুক্ত হয় (সূরা ছফ)। আল্লাহপাকের কোন তাড়াহুড়া নেই; তিনি যথাসময়ে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পৃথিবী একদিন অবশ্যই দেখতে পাবে, সুদীর্ঘ ছয় হাজার বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বহু নবী, রাসূল, সাহাবা (রাঃ) ও অলি-আউলিয়াদের স্মৃতিধন্য ও সর্বোপরি ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত পুণ্যস্নাত-পুণ্যভূমি ইরাক, এবং ইয়োরোপ থেকে বহিষ্কৃত বিতাড়িত দস্যুতস্করদের দ্বারা গঠিত আমেরিকা এক নয়। অতএব টোমা হক আর বিমান সজ্জিত যুদ্ধজাহাজ পারস্য উপসাগরে যতই বদ্ধ উন্মাদের মত আস্ফালন করুক, ইরাকের কোন ভয় নেই, বিশ্বব্যাপী মুসলিম মিল্লাতেরও উদ্বেগের কোন হেতু নেই। আল্লাহপাক বলেন, 'আল্লাহু ওয়ালিউল্লাজীনা আমানু ইউখরিজুহুম মিনাজ্‌জুলুমাতি ইলান্‌নুর'-আল্লাহপাক মুমেনদের বন্ধু এবং তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান (সূরা বাকারা)। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি পূর্ণ-নির্ভরতায় প্রত্যয়দীপ্ত ইরাক সেই নূর, সেই আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়ের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। আর আমেরিকা-যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কোথায় কোন্ জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, 'মহামতি' ক্লিনটন ও মনিকা-পলা জোন্‌সের অকথ্য উপাখ্যান থেকেই তা অনুধাবন করা সহজ। এতটাই সহজ যে, এমনকি আমাদের অন্ধচক্ষু বুদ্ধিবিক্রেতা বুদ্ধিজীবীরাও আমেরিকার আত্মবিধ্বংসী হঠকারিতা নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত।

পালাবদল : ডিসেম্বর ২য় পক্ষ, '৯৮

www.pathagar.com

এক সংশপ্তক শার্দূলের কাহিনী

আমাদের এই পার্থিব জীবন এক অতি বিশাল ও অনিঃশেষ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা মাত্র। এই জীবন তবু-যে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ, পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে কী লেখা হবে, তা এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকালিপির উপরই নির্ভরশীল। শুধু ভূমিকাটুকু লেখার দায়িত্বই আমাদের; অবশিষ্টাংশ লিখে দেবেন অন্য এক অদৃশ্য কিন্তু সর্বনিয়ন্তা ও সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী এক ন্যায়পরায়ণ মহাবিচারক। এজন্যই ইসলামে জীবনের চেয়েও লক্ষ কোটি গুণ বড় ও গুরুত্বপূর্ণ হলো জীবনের লক্ষ্য। এবং এই লক্ষ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই, হজরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রাণাধিক পুত্রের গলায় শাণিত তরবারি চালাতে কণামাত্র বিচলিত হন নি; হজরত ঈসা (আঃ) মাত্র বারোজন হাওয়ারি নিয়ে পথভ্রষ্ট ইহুদি-দুশমনদের মোকাবিলায় নিজেকে তুলে ধরতে একটি কদমও পশ্চাদপসরণ করেন নি। এই লক্ষ্য সামনে ছিল বলেই, হজরত আমীর হামজা (রাঃ) শত্রুর বর্শাঘাতে হাসিমুখে শাহাদাত বরণ করেছেন, হাজার হাজার সাহাবী বুকের উত্তপ্ত রক্তে হাসতে হাসতে সিক্ত করেছেন জিহাদের প্রান্তর, তারিক ছুটে গিয়েছেন স্পেনে, মুহম্মদ বিন কাসিম ছুটে এসেছেন সিন্ধুতে, গাজী সালাহ্‌দীন প্রভঞ্জনের মত ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন খ্রীষ্টান শক্তির উদ্ধত মস্তক। এবং আজও দেখি, এই একই লক্ষ্যের পানে ধাবিত হয়েই ফিলিস্তিনে-কাশ্মিরে আলজিরিয়া-তুরস্কে শাহাদাতের তীব্র তামান্না নিয়ে আত্মোৎসর্গে বলীয়ান লক্ষ লক্ষ তওহিদী মুজাহিদ। সত্যই কী-এক অবিনশ্বর লক্ষ্যের দিকেই-না ইসলাম হাতছানি দিয়ে আমন্ত্রণ জানায়; যে-কারণে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে পুনঃ পুনঃ জেগে ওঠে মুসান্না ও সাদ বিন ওয়াক্কাস, নূরুদ্দিন জঙ্গী, ইউসুফ তাশনীন, জওহর দুদায়েভ, ওসামা বিন লাদিনের মত হাজার হাজার অকুতোভয় অগ্নিপুরুষ, যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি, ইসলামের তরক্কি এবং মহানবী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ থেকে প্রবাহিত মহানদীর যে-তওহিদী স্রোতধারা, তার প্রবহমানতাকে হৃৎপিণ্ডের উষ্ণ রক্ত দিয়ে হলেও দুর্বারভাবে অনিরুদ্ধ রাখা। এই লক্ষ্যই মুসলমানের একমাত্র লক্ষ্য; এবং এই লক্ষ্যের পতাকা উড্ডীন রাখাই তার ইহজীবনের একমাত্র ব্রত। বলাই বাহুল্য, এজন্যই মুসলমানের জীবন সততই এক সংগ্রামবিক্ষুব্ধ কন্টক ও সমস্যাকীর্ণ জিহাদী জীবন ; কাফের-মুশরিক-মুনাফিকদের সর্বাত্মক বৈরিতার মোকাবিলায় এক সংশপ্তক মুজাহিদের জীবন। মুসলমান কখনো খোদাদ্রোহী শক্তির সঙ্গে আপোষ করে না; সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে হলেও, সে তার সংগ্রামকে অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর। সে পশ্চাদপসরণ করে না, সে গ্রাহ্য করে-না কোন পরাশক্তির ভ্রূকুটি; কারণ বিত্তবৈভব, নির্ঝঞ্ঝাট সিংহাসন তার কাম্য নয়, তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম আকাঙ্ক্ষা লড়াইয়ের ময়দান থেকে নিরঙ্কুশ বিজয় নিয়ে প্রত্যাবর্তন অথবা শাহাদাত।

অতএব আজ যখন দেখি, দুই প্রবল পরাশক্তির বিরুদ্ধে সাদ্দাম ও তার স্বদেশবাসী এক অবিচল দৃঢ়তা নিয়ে সংগ্রামরত, বড় আনন্দ হয়। মহাকাল আপন গতিতে বহমান;

www.pathagar.com

জীবন ও সম্পদের যে-ক্ষতি তা স্থায়ী নয়, বিলম্বে-অবিলম্বে একদিন তার নিরাময় ঘটবে। কিন্তু সাদ্দাম হোসেন সমগ্র ইরাকবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আজ মুসলিম উম্মাহ্‌র নিদ্রাতুর ধমনীতে জ্বালিয়ে দিলেন যে-অবিনশ্বর তওহিদের মৃত্যুভয়হীন অনির্বাণ আলোর প্রেরণা, এই ইতিহাস রোজ কেয়ামত পর্যন্ত চিরঞ্জীব হয়ে থাকবে। লুই ফারাহ খান যথার্থই বলেছেন, বিশ্ববিস্তৃত সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের জন্য আল্লাহপাক আজ ইরাক ও সাদ্দাম হোসেনকে মনোনীত করে নিয়েছেন। আসলেও তাই; তাগুতি-শক্তির বিরুদ্ধে পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে মুজাহিদের আজান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করবার এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সাদ্দাম হোসেনের স্কন্ধে। তিনি এই দায়িত্বই পালন করে চলেছেন অকুতোভয়ে। মুগ্ধ হয়ে লক্ষ করি, সাদ্দামের চোখেমুখে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে রোম সম্রাটের মোকাবিলায় যুদ্ধরত দুঃসাহসী খালিদ বিন ওয়ালিদ ও কাদেসিয়ার প্রান্তরে শত্রুব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে ছুটে-যাওয়া অশ্বারোহী মুসান্নার মুখচ্ছবি। রিচার্ড বাটলার ক্লিনটনের এক পোষা সারমেয়, সে ইরাকের সর্বত্র মারণাস্ত্রের গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়ায়। কিন্তু এই সারমেয়টির নাসিকাশক্তি যত প্রখরই হোক, তার পক্ষে কিছু খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কারণ ইরাকের যে-মারণাস্ত্র, তা কোন গোপন ভূগর্ভে কি প্রাসাদে লুক্কায়িত রাখার বস্তু নয়। সেই মারণাস্ত্র নিহিত রয়েছে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম ও তাঁর স্বদেশবাসীর বুকের অভ্যন্তরে, যার নাম ঈমান। কাফের, মুশরিক, মুনাফিকদের ধারণার অতীত যে, আল্লাহর প্রতি অখণ্ড ঈমান ও আনুগত্যের অবিনাশী বর্ম যে-মুসলমানের অলংকার, তার পদযুগল কখনো কম্পিত হয় না, মৃত্যু তার চরণের ভৃত্য, শাহাদাতের পেয়ালা তার আকণ্ঠ তৃষ্ণার যোগ্যতম পানীয়। সাদ্দামের কোন শঙ্কা নেই, কোন সংশয় নেই; তিনি আমৃত্যু বৃটেন-আমেরিকার বিরুদ্ধে রণসাজে সজ্জিত এক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মুজাহিদ। তিনি জানেন, 'ইন্নাল্লাহা-আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুছাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ'-মুমেনের এই-যে নশ্বর পার্থিব জীবন ও সম্পদ, তা জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে বিক্রয় হয়ে গেছে (সূরা তাওবাহ)।

কেউ কেউ অবশ্য বলেন, ইরাক আজ কঠিন এক বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত, যা-থেকে উদ্ধার পাওয়া বড় দুরূহ। না, মুসলমানের বিশ্বাস অন্য কথা বলে। এটা একটা সাময়িক মুসিবত মাত্র। কারণ আলকোরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, 'ধৈর্য ও সংগ্রামের পরীক্ষায় প্রশ্নাতীতভাবে উত্তীর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত পরীক্ষা অব্যাহত থাকবে' (সূরা মুহাম্মদ)। সাদ্দাম হোসেন এই পরীক্ষাতেই অবতীর্ণ হয়েছেন। এবং এটা দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বিরুদ্ধশক্তির মোকাবিলায় তিনি এখন প্রায় জয়ের দ্বারপ্রান্তে সমুপস্থিত। 'নো ফ্লাই জোনের' অবরোধ ভেঙ্গে পড়ছে, মুসলিম দেশগুলো তো বটেই, বৃটেন, ইসরাইল, অস্ট্রেলিয়ার মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দু'চারটে গৃহপালিত ক্রীতদাস ছাড়া, সমগ্র বিশ্ব এখন ইরাকের পক্ষে। আর ওদিকে ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া থেকে রিপাবলিকানদের

www.pathagar.com

দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো, মার্কিনী রাজনীতির চালিকাশক্তি ইসরাইলীদের সন্তোষবিধান ও দ্বিতীয় একটি হিরোশিমা-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অতিশয় ঘৃণ্য লাম্পট্যের কলঙ্ক-উপাখ্যান কিছুটা হলেও আড়াল করবার যে-এক কুশলি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ক্লিনটন, তা-যে কত অসার তা প্রমাণিত হয়েছে। ক্লিনটন দক্ষ তীরন্দাজ বটে, কিন্তু তার সবগুলো তীরই আনাড়ীর মত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। ক্লিনটনপ্রেমীদের কষ্ট হবে কিন্তু সত্য কথা হলো, ক্লিনটন জন্মগতভাবেই অভিশপ্ত, দুশ্চরিত্র ও মারাত্মকভাবে ভারসাম্যহীন। তিনি-যে আপন পিতাকে আড়াল করে বিপিতাকে স্বীয় নামের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছেন, এতেই বোঝা যায় তাঁর আত্মসম্ভ্রমবোধ কত অগভীর ও লঘু।

অতএব এই রুচিহীন, মিথ্যাচারী ও বহুগামী নারী-মাংসাশীর নিকট থেকে বেশি কিছু আশা করাই বোকামি। সোভিয়েত ইউনিয়নে কম্যুনিজম ভূলুণ্ঠিত হওয়ার পর একজন মার্কিনী লেখক বলেছিলেন-এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, কম্যুনিজমের মত একটি নোংরা গুরুভার, এমন একটি জগদ্দল পাথরকে এতদিন একটি দেশ ও জাতি মাথায় তুলে রেখেছিল কী-করে? সারা পৃথিবীতো বটেই, খুব শীঘ্র মার্কিনীরাই বলবে, ক্লিনটনের মত একজন অতি-নোংরা দুশ্চরিত্র, লম্পট কী-করে আমেরিকার শিরোভূষণ হয়ে একাধিকবার অধিষ্ঠিত হলো? থাক এসব কথা; কারণ ক্লিনটনের মেধা ও চাতুর্যের যোগফল হলো প্রতারণা, যা তাকে শুধু পথে বসায়-নি, নরকের এক ঘৃণ্য কীট হিসেবেও তাকে তুলে ধরেছে। এই অপরিণামদর্শী মনিকা-মুগ্ধ কাপুরুষের সাহস ও আস্ফালন যে সত্যই কত অন্তঃসারশূন্য, হিলারীর যথোচিত প্রহার ও চপেটাঘাতে ক্লিনটনের বিক্ষত মুখমণ্ডলই তার নির্ভুল সাক্ষ্য। আসলে তার আস্ফালন হলো, ইবলিসের ফাঁদে আটকে-পড়া এক ভীতসন্ত্রস্ত মূষিকের আর্তনাদ। ক্লিনটনকে নিয়ে অধিক কিছু বলবার নেই; ক্লিনটনই বোধ হয় বর্তমান শতাব্দীর সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিত্ব, নিন্দার্থে ম্যান অব দ্য সেঞ্চুরি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম সম্পূর্ণ এক ভিন্ন উদাহরণ। অপার বিস্ময়ে সাদ্দাম হোসেনকে অবলোকন করি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর এক অকুতোভয় মহানায়করূপে, তওহিদের দীপ্ত প্রেরণায় যাঁর মেঘমন্দ্রিত আওয়াজ কাফের-মুশরিক খ্রীষ্টান ইহুদি-পৌত্তলিকচক্রের আজ সার্বক্ষণিক আতঙ্ক। সাদ্দাম হোসেন আহত বটে কিন্তু তিনি এক সংশপ্তক পরাক্রান্ত শার্দূল। কতিপয় নিদ্রাতুর রাজা-বাদশাহ ও ধনাঢ্য মার্জারদের পদচারণায় 'লাসবোগাস' কি আটলান্টিক সিটির ক্যাসিনো-মাহফিল যতই জমজমাট হয়ে উঠুক, কেউ কেউ যত প্রসন্নমনেই পশ্চিমাদের দাসত্ব বরণ করে নিক, এটা সত্য যে, বিশ্বমঞ্চে ইসলামের বিজয় অত্যাসন্ন।

মুসলিম মিল্লাত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের অমিতবিক্রম সিপাহসালার হয়ে একদিন ইমাম মাহদি আসবেন। অবশ্যই আসবেন; কারণ এটা কোন কল্পনা কি দিবাস্বপ্ন নয়, এই অকাট্য সুসংবাদ নিঃসৃত হয়েছে রাসূল

www.pathagar.com

(সাঃ)-এর পবিত্র জবান থেকে। এবং সেই কাঙ্ক্ষিত ইমাম মাহদিরই এক অগ্রিম বার্তাবহরূপে বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে পেলাম সাদ্দাম হোসেনকে। তওহিদী প্রেরণায় আপাদমস্তক উজ্জীবিত এক ধর্মপ্রাণ পিতার ঔরসে এক নেকবখ্‌ত জননীর গর্ভজাত এই সুসন্তান, যিনি সকল ভয় ও ভ্রূকুটিকে তুচ্ছজ্ঞানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে সদা জাগরুক, যাঁর সম্মুখে-পশ্চাতে-চতুর্দিকে জ্বল জ্বল করে জেগে থাকে অবিনশ্বর কালেমা তওহিদ। এবং এজন্যই শুধু স্বদেশবাসীর কাছে নয়, সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের কাছেই তিনি প্রিয়পাত্র। মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছে এর চেয়ে প্রীতিকর ও আনন্দময় দৃশ্য আর কী হতে পারে যে, শ্বেতহস্তীতে উপবিষ্ট একালের রুস্তম পালোয়ানেরা আবার সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছে মুসান্না সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের বিরুদ্ধে কাদেসিয়ার প্রান্তরে! ইতিহাসের কী অভিনব পুনরাবৃত্তি! মুমেনের শাহাদাত আল্লাহর কাছে বড় প্রিয় বস্তু; কিন্তু আল্লাহ্ কখনো কোন কারণেই কোন মুমেনকে অপদস্থ করেন না। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, বাগদাদের অনুকূলে বিশ্ব-কূটনীতির চমকপ্রদ পার্শ্বপরিবর্তন আল্লাহপাকের এই অভিপ্রায়েরই অগ্রিম সংকেত। অনুমান করি, ইরাকের জন্য সুবেহ্ সাদেক সমাগতপ্রায়। একবিংশ শতাব্দীর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে, আল্লাহর দ্বীন-বিজয়ের পয়গাম নিয়ে আবির্ভূত মুসলিম উম্মাহর এই মহানায়ক নির্ভীক সিপাহসালার প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে জানাই হৃদয় নিঃসৃত ভালোবাসাসহ আন্তরিক সালাম, লাখো সালাম।

দৈনিক ইনকিলাব : ৫.২.৯৯

www.pathagar.com

নারী স্বাধীনতা ও বিবেকভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবী সমাচার

কিছুদিন হলো, টিভিতে আমাদের এক বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী সহস্রাব্দকে স্বাগত জানিয়ে দেশের ভগিনী-জননীদের উদ্দেশ্য করে উদাত্তকণ্ঠে বললেন, আগামী শতাব্দী হবে নারীদের শতাব্দী। এবং এ-বিষয়ে তাঁর আস্থা এতটাই প্রবল ও অটুট যে, তিনি নারী-সমাজের কাছে অগ্রিম কিছু করুণা ও অনুকম্পাও প্রার্থনা করলেন। অর্থাৎ দীর্ঘ-নিগ্রহের কারণে সৃষ্ট উত্তপ্ত অন্তর্দাহ থেকে নারীরা যেন পুরুষদের প্রতি জীঘাংসু ও প্রতিশোধপরায়ণ না-হয়ে ওঠেন, সেই মিনতিও ব্যক্ত করলেন বুদ্ধিজীবী মহোদয়। তাঁর বিশ্বাস ও স্বপ্ন আগামী শতাব্দীতে কখন, কতটা বাস্তবে ধরা দেবে, সে-বিষয়ে মন্তব্য করা দুরূহ। তবে এটা সত্য যে, সবাই স্ব স্ব অভিপ্রায় অনুযায়ী ভবিষ্যৎকে নিজের মত করে দেখতে ভালোবাসেন। সোভিয়েত ইউনিয়নও এক সময় বলতো, আগামীদিনের ইতিহাস হবে সর্বহারাদের বিজয়ের ইতিহাস। আলেকজাণ্ডার কিছু দেশ জয় করার পর এই দুঃখ ব্যক্ত করেছিলেন যে, তাঁর মত বীরের জন্য পৃথিবীটা খুবই ছোট; কারণ তাঁর ও তাঁর টগবগে অশ্বটির সামনে ভূপৃষ্ঠে জয় করার মত বিশেষ আর কোন ভূমি অবশিষ্ট নেই। কিন্তু পার্শ্বচর অতি-নগণ্য এক সিপাহী-আততায়ীর নিকট থেকে তিনি যে-সুশিক্ষা লাভ করলেন, তাতে মৃত্যুমুহূর্তে বোধ হয় এটুকু বোধোদয় অন্তত ঘটেছিল যে, পৃথিবীটা ছোট-বড় যাই হোক, তার রহস্য বড় দুর্জ্ঞেয়। অনেকটা এই রকমই দম্ভোক্তি ব্যক্ত করেছিলেন আর্কিমিডিস। তিনি বলেছিলেন, একটি লিভার ও পৃথিবীর বাইরে দাঁড়াবার মত একটুখানি জায়গা যদি তাঁকে দেয়া হয়, তিনি একাকী পুরো পৃথিবীটাকে যথেচ্ছ উত্তোলিত করবেন। অনুমান করি, জীবনের অস্তবেলায় আর্কিমিডিসও হয়ত অনুধাবন করেছিলেন, পৃথিবীটা ছোট বটে কিন্তু অসংখ্য আর্কিমিডিসের সম্মিলিত বুদ্ধি ও বিক্রমের তুলনায় অনেক বড়। আধুনিক কবিতার গুরু বোদলেয়ারের চোখে পৃথিবী ছিল খুবই বিশ্রী ও কুৎসিত; আসলে এটা ছিল তাঁর নিজস্ব দুরারোগ্য উপদংশজনিত ভয়াল আত্মদর্শন। বলাই বাহুল্য, এ-রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই; অনেক মানুষ আসলে নিজের তৃষিত ইচ্ছা ও স্বার্থের অনুকূলে পৃথিবীকে কল্পনা করতে ভালোবাসে। অতএব আমাদের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোক যদি এই আশা করেন যে, একবিংশ শতাব্দী হবে নারীদের শতাব্দী, তাহলে সেই আশা অলীক হলেও তাঁকে খুব-একটা দোষ দেয়া যায় না। কারণ নারীদের প্রতি যাঁরা মাত্রাতিরিক্ত অনুরাগী, তাঁরা কবিও বটে। আর কবিদের কাজ ও কথা-বলার প্রক্রিয়াই হলো, নিজেকে পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে না-দিয়ে, পৃথিবীকেই নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত করে আনা। কবিরা স্বভাবতই ভাবাবেগে ডুবে থাকতে ভালোবাসেন; তাঁদের কথা সর্বদায়ই এক অপার্থিব তুরীয়লোক থেকে অবতীর্ণ। আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'কেবল পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই কবিদের অনুসরণ করে, কবিরা নানা উপত্যকায় বিচরণ করে উদ্‌ভ্রান্তের মত, তাদের কথার সঙ্গে কর্মের কোন মিল নেই' (সূরা শুয়ারা)।

www.pathagar.com

যাই হোক, বর্তমান আলোচক ব্যক্তিগতভাবে নারীবিদ্বেষীও নয়, নারীর মর্যাদাদানে এতটুকু পরান্মুখও নয়। শুধু এটুকু প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই যে, প্রকৃত কল্যাণ ও প্রকৃত মর্যাদার প্রশ্নে আধুনিক পৃথিবী নারীকে কি সত্যই লাভবান করেছে, না বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত? বর্তমান সময়ে নারী ও শিশু-পাচারের কাজে এক শ্রেণীর ভদ্রবেশী নারী-পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। নানা প্রলোভন দেখিয়ে তারা এই শিকার সংগ্রহ করে। তারপর এই সংগৃহীত শিকার তারা পণ্যরূপে তুলে দেয় দূর-বিদেশের কোন গণিকালয়ে অথবা নরদেহ-নরকংকাল সন্ধানী নৃশংস কোন ক্রেতার খেদমতে। ঠিক এই রকমই, নারী-অধিকার, নারী-স্বাধীনতার যারা প্রবক্তা, তাদের কাজ হলো নারীকে পণ্য হিসেবে পৃথিবীর বাজার-উপযোগী করে তোলা। পার্থক্য শুধু এটুকু, একদল পাচারকারী বলে নিন্দিত, অপরদল মুক্তবুদ্ধি, উদার নারীদরদী বুদ্ধিজীবী হিসেবে অভিনন্দিত।

ইয়োরোপ-আমেরিকার দিকে চেয়ে দেখলে এটা বোঝা কিছুমাত্র কষ্টকর নয় যে, নারী স্বাধীনতা আধুনিক পৃথিবীর একটি বিশাল ব্যাদিত অভিশাপের নাম। নারীর অধিকার দানের কথা বলে নারীকে তারা পথে বসিয়েছে। নারী এমন এক করুণ পণ্যে এখন পরিণত যে, রেডিও-টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে সে নিজেই নিজেকে খুচরো ব্যবসায়ীর মত আগ্রহী ক্রেতাদের হাতে প্রতিদিন তুলে তুলে দিচ্ছে, দিতে বাধ্য হচ্ছে। লজ্জা মানব সভ্যতার একটি অতি মূল্যবান সম্পদ। অথচ এই লজ্জার ছিটেফোঁটাও এখন আর মার্কিনী-নারীদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই; থাকলে ক্লিনটন কি তার আপন যৌনাঙ্গ তার নর্মসহচরীদের দ্বারা মুখমেহনে (Oral Sex) উদ্রিক্ত করার কথা ভাবতে পারতো; আর যৌনবান্ধবীরাই কি এই নোংরা ও কুৎসিত প্রস্তাবে সম্মত হতো? অবশ্য এতদসত্ত্বেও নির্লজ্জতাকে কিয়ৎপরিমানে ক্ষমার চোখে দেখা যায়। কারণ নির্লজ্জতা ইতর মানুষের একটি কুৎসিত আবেগমাত্র। এই বেহায়া-আবেগ একসময় প্রশমিত হয়; এবং বহু কিছু হারিয়ে লজ্জা-সম্ভ্রমবোধ একসময় কিছুটা হলেও আবার স্ব-স্থানে ফিরে আসে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মার্কিনী-নির্লজ্জতা শুধু ইতর আবেগ ও অভ্যাসের বস্তু নয়; নির্লজ্জতা সেখানে ব্যবসায়ের একটি মূলধন। অর্থাৎ নানা নামে, নানা কৌশলে নগ্নতা, সম্ভ্রমহীনতা ও বেহায়াপনার যে-বিশাল বাজার গড়ে উঠেছে, মুনাফা ও বহু মানুষের জীবন-জীবিকার প্রশ্নে, জেনারেল মোটর্স কোম্পানীর তুলনায় তা কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবী এই স্বপ্নই দেখছেন। কিন্তু এই স্বপ্ন কিছু পক্বকেশ অপক্ব কবি-বুদ্ধিজীবীর কাছে রোমাঞ্চকর মনে হলেও, নারীদের নিজের জন্য খুবই বিপজ্জনক। কত-যে বিপজ্জনক, তা পশ্চিমা জগতের দিকে এক নজর তাকালেই পরিষ্কার হয়ে যায়। যে-নারীর জন্য ছিল সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, স্বামী-সন্তান নিয়ে এক নিরাপদ গৃহের আশ্রয়, সেই নারী এখন পণ্যবিশেষ; সে এখন ডলার ও ডলার-মালিকদের হাতে হাতে ঘূর্ণায়মান উদ্‌ভ্রান্ত ঘোটকী। আফসোস, এরই নাম নারী-স্বাধীনতা!

www.pathagar.com

আসলে পৃথিবী যাকে নারী স্বাধীনতা বলছে, সেটা বস্তুত লাম্পট্যেরই এক সুভাষিত অন্য নাম। ফ্লোরিডার সাগর সৈকতে কিংবা আটলান্টিক সিটির ক্যাসিনো-মাহফিলে নেচে গেয়ে ও পুরুষকে সঙ্গসুখ দানকরত কিছু ডলার ইনকাম করার নাম যদি স্বাধীনতা হয়, ওই রকমের উপার্জন আমাদের দেশে নাচ দেখিয়ে অনেক বানরও করে। না বলে উপায় নেই, ইয়োরোপ-আমেরিকা আমাদের নারীকে যে স্বাধীনতার অলংকার পরাতে চায় এবং যাকে সাগ্রহে গ্রহণ করতে আমরাও অনেকে আজ বদ্ধপরিকর, নারী-স্বাধীনতা নামক সেই বস্তুটি খুবই ভয়ংকর একটি জিনিষ। ইতোমধ্যে প্রমাণিত, এই স্বাধীনতা কেবল নারীদের জন্যই একটি কুৎসিত অবমাননাকর বস্তু নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার জন্যই একটি ভয়াবহ অভিশাপ। সাম্প্রতিক একটি নির্ভরযোগ্য জরিপ থেকে জানা যায়, শুধু নিউইয়র্কেই এখন আড়াই লক্ষ বদ্ধ উন্মাদের বাস। কিন্তু এই উন্মাদগুলো আকাশ থেকে নাজিল হয় নি; এরা ওই সকল রমণী-উদর থেকে ভূমিষ্ঠ, যারা বহুনন্দিত নারী স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক, যারা সংসার-সম্ভ্রম, ইজ্জত-আব্রু লজ্জা শালীনতা নিরাপত্তা সবকিছু হারিয়ে আজ ভিখারীদের মত সর্বহারা। তথাকথিত স্বাধীনতার কারণে এই নারীরাই শুধু ভারসাম্যহীন প্রগলভ জীবে পরিণত হয় নি, তাদের গর্ভজাত সন্তানেরাও যে মারাত্মকরূপে মানসিক বৈক্লব্যের শিকার, নিউইয়র্ক শহরের জরিপ রিপোর্ট থেকে আমরা অতিসহজেই তা অনুধাবন করতে পারি। অতএব পুরো পৃথিবীটাকে আমরা যদি ভয়ংকর একটি উন্মাদাগারে পরিণত করতে না চাই, আর কিছু না-হোক, অন্তত আমরা নিজেও যদি চাই আত্মরক্ষা করতে; আমাদের উচিত হবে ইসলামের অনুশাসন মেনে নিয়ে নারীকে নারীর যথাস্থানে অধিষ্ঠিত রাখা, নারীর সম্ভ্রম ও মর্যাদার প্রতি যত্নবান হওয়া। অবশ্য ইসলামের নাম শুনলেই যাদের মধ্যে শারীরিক-মানসিক উগ্র বিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, আল্লাহর বিশেষ রহমত ছাড়া তাদের মধ্যে বোধোদয় ঘটানো অসম্ভব। কারণ এরাই তারা, যাদের সম্পর্কে আল্লাহপাক বলেন, 'ফা ইন্নাহা লাতামাল আবছারু ওয়ালাকি তামাল কুলুবুল্লাতি ফিছ্ছুদুর'-আসলে চোখ-তো অন্ধ হয় না। অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয় (সূরা হজ্ব)।

যাই হোক, নারী স্বাধীনতা-যে কী অপূর্ব জিনিষ, অস্থির অব্যবস্থিত পশ্চিমা-সমাজ আজ-তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করছে। আল্লাহর নির্ধারিত জীবনচক্রের বিরোধিতা করার ফলাফল যে-কত ভয়াবহ, সে-কথা আমেরিকার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। আমরা বহুদিন বড় নিরাপদে ছিলাম; কিন্তু আজ এক ভয়াবহ দুঃসময়ের পদধ্বনি আমাদের দেশেও একটু একটু শোনা যাচ্ছে। আমাদেরও কিছু বিবেকভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবী আজ নারী-স্বাধীনতার দরদী প্রবক্তারূপে আবির্ভূত হয়েছে। তাদের স্বপ্ন ও প্রচেষ্টা আমাদের এই জমীন ও জনপদে কতটা সফল হবে, অনুমান করা কষ্টকর। তবে এ-প্রসঙ্গে সবার জ্ঞাতার্থে শুধু এটুকু নিবেদন করা যায় যে, দেশে দেশে এই জাতীয় অনেক

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবী আজ অবতরণ করেছে প্রকৃতপক্ষে Pimp-এর ভূমিকায়, অর্থাৎ ব্যভিচারী পুরুষদের দালাল ও দূতরূপে। এবং এজন্যই অনুষ্ঠিত হয় সুন্দরী প্রতিযোগিতা; এজন্যই নানা ধরনের অনুষ্ঠানের নামে দুর্জয় হয়ে ওঠে বেপরোয়া বেহায়াপনা। ভবিষ্যতে কী হবে আল্লাহপাক জানেন; এই মুহূর্তে যেটুকু বলা যায়, তাহলো নারীবিলাসী পিম্পদের মুখোশ এখন অনেকটাই উন্মোচিত হয়েছে। কিছু নারী এই নারীঘাতকদের সহযোগী বটে কিন্তু অধিকাংশ নারীই আজ এটা সম্যক অনুধাবন করে যে, এদের বাঁশি শুনে পথে নামলে শেষ পর্যন্ত যেখানে যেতে হবে, সেই স্বাধীনতার জগৎটি আসলে একটি বিশুদ্ধ নরক। আর এই নরকটিও আক্ষরিক অর্থে গণিকালয়ের মতই, যেখানে একবার প্রবেশ করলে আর প্রস্থান করা যায় না। সকলের জীবনবোধ একরকম নয়; পৃথিবীর কাছে সকলের দাবীও একরকম নয়। তবু একটি জায়গায় অন্তত আমরা স্বচ্ছন্দে মিলিত হতে পারি; সেই জায়গাটি হলো, ইসলাম ও প্রাচ্যের বহুশতাব্দী লালিত সুস্থ-সুরক্ষিত পারিবারিক ঐতিহ্যের কল্যাণময় উত্তরাধিকার। এখানে দাঁড়িয়ে আজ আমরা সবাই বলতে পারি, পশ্চিমের সব উপহারই গ্রহণযোগ্য নয়। আনবিক বোমা, এইডস ইত্যাদিও পাশ্চাত্যেরই উপহার। নারী-অধিকারের মোড়কে যে-সওগাত আমাদের কাছে এসেছে, তা এইড্‌সের চেয়েও ভয়ংকর। ন্যূনতম কাণ্ডজ্ঞান ও দূরদৃষ্টি যদি থাকে, তাহলে এটা অনুধাবন করা আদৌ দুরূহ নয় যে, একবিংশ শতাব্দী যদি সত্য সত্যই রিরংসু পুরুষদের কাঙ্ক্ষিত নারী-শতাব্দী হয়ে ওঠে, তাহলে এই শতাব্দী হবে সেঞ্চুরী-প্রতিষ্ঠাতা রেকর্ড-ভাঙ্গা, রেকর্ড-গড়া ধর্ষকদেরও শতাব্দী, পৃথিবী পরিণত হবে নররূপী বন্যজন্তুদের মনোরম অভয়ারণ্যে। আমাদের বদনসীব; একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এমন একটি কুৎসিত সর্বনাশা পৃথিবীর জন্যই আজ আকণ্ঠ পিপাসার্ত।

দৈনিক ইনকিলাব : ৪. ২. ২০০০

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষা-সংকোচন নীতি: ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির কুহেলিকা

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং ইসলামের সাথে সম্পর্ক নেই, এই ধরনের কোন বই এখন আর আমি পড়ি না। আগে পড়েছি; চর্যাপদ থেকে একেবারে অতি সাম্প্রতিক জয় গোস্বামী, বুঝি না-বুঝি অনেক বিদেশী সাহিত্য, অনেক ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই, অনেক মনীষীর অনেক জীবনকথা ইত্যাদি অনেক কিছুই আমার স্বল্প মেধা ও অপ্রখর স্মৃতিশক্তি নিয়ে আগে পাঠ করেছি। এমনকি খুব যত্ন করে বুদ্ধদেবের অনুবাদে রিল্‌কে পড়েছি, বোদলেয়ার পড়েছি, পাস্তারনাকের ড: জিভাগো পড়েছি; এবং বিস্ময়কর যে, রুশ কবিতাও এমনভাবে পড়লাম, যে-অধীত বিদ্যার প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে না-পেরে দীর্ঘ ভূমিকাসহ অনেকগুলো কবিতার অনুবাদ নিয়ে একটি বই-ই লিখে ফেললাম (বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত কবিতা)। আরো বিস্ময়কর যে, আমার পাঠ্যতালিকা থেকে এমনকি অর্ধশিক্ষিত আরজ আলি মাতুব্বরও বহির্ভূত ছিল না। এবং সসঙ্কোচেই বলি, এই পাঠগ্রহণ থেকে আমার মধ্যে এক ধরনের স্থূল ও নির্বোধ এবং নিরর্থক অহমিকাও জন্মেছিল। যাই হোক, বহু যত্নে, বহু কষ্টে ও অর্থব্যয়ে সংগৃহীত এসব বই আর এখন নেই। অসাবধানতাবশত অধিকাংশই উঁই পোকার হাতে নিঃশব্দে ধ্বংস হয়ে গেছে। সামান্য কিছু কিছু এখনো যদিও অক্ষত আছে, আমার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। উল্লেখ করা আবশ্যক, উঁইপোকা যা-করেছে তা-তো করেছেই, এতদসঙ্গে আমার স্মৃতিগৃহ থেকেও আমার সমস্ত বিদ্যা প্রায় সবই অজ্ঞাতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। অবস্থা এত করুণ যে, আমার নিজের গান, যা সহস্রবার গেয়েছি তাও সঠিকভাবে মনে আসে না; এবং জীবনে অসংখ্যবার উদ্ধৃতি দিয়েছি, এ-রকম লেখক ও গ্রন্থের নামও স্মৃতিপট থেকে প্রায় পুরোপুরিই অপসৃত হয়েছে। জাগতিক বিবেচনায় এটা একটা ভয়াবহ বিপর্যয়ই বটে! কিন্তু এ-রকম হলো কেন? বই-তো গেলই, যেটুক-যা মস্তিষ্কে সঞ্চয় করেছিলাম, তাও গেল।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'যার হৃদয়ে কোরআন শরীফের কোন অংশই নেই, সে একটি পরিত্যক্ত গৃহসদৃশ'। পরিত্যক্ত গৃহ অর্থ জনমানবহীন পোড়ো বাড়ি। যেহেতু মানুষ বাস করে না, স্বাভাবিক নিয়মেই এই ধরনের গৃহ হয়ে ওঠে নোংরা আবর্জনাপূর্ণ, আগাছা ও জঙ্গলাকীর্ণ, হয়ে ওঠে মূষিক-সরিসৃপ-শৃগাল ইত্যাদি বন্যজন্তুর নিরাপদ লীলাক্ষেত্র। কিন্তু একটি-মানুষও যদি কখনো এই পোড়ো বাড়িতে অবস্থানের নিমিত্ত ফিরে আসে, ওইসব জন্তু জঞ্জাল ও উপদ্রব এমনিতেই পরিষ্কার হয়ে যায়। রাসূল (সাঃ) এই কথাটাই বড় সুন্দর করে বলেছেন, অন্তরে যদি কুরআনুল কারীমের একটি দু'টি পংক্তিও প্রবেশ করে, অন্যসব কুফরি-কালাম, নিরর্থক ও বিভ্রান্তিকর বিদ্যাবত্তা পলায়ন করতে বাধ্য হয়। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতাও এই কথাই বলে। যেদিন থেকে আমি কোরআন-হাদীস, রাসূল (সাঃ)-এর জীবন ও জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি,

www.pathagar.com

ইসলামকে আল্লাহপাকের একমাত্র মনোনীত দ্বীন হিসেবে মেনে নিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা শুরু করেছি, মার্কস, মাও সে তুংয়ের 'মানবকল্যাণের' ব্যবস্থাপত্র, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপূজা, সার্ত্রে কি রাসেলের বহু-মূল্যবান দার্শনিক তত্ত্ব, প্লেটো, এরিস্টটল সাবা-মুআল্লাকা, রাধাকৃষ্ণের বিরহগীতি, লতা মুঙ্গেশকরের গান, রবিশঙ্করের সেতার বাদন, সাগরিকার সুচিত্রা সেন সবকিছু দিনের চাঁদের মত ফিকে ও নিষ্প্রভ হয়ে গেল। হতেই হবে, কারণ অন্ধকারই হলো এদের উজ্জ্বলতার মূল অবলম্বন, অন্তঃসারহীন নিরর্থকতাই হলো এদের অর্থ ও তাৎপর্য, ক্রমাগত অধঃপাতই হলো এদের গগনচুম্বী সাফল্যের কলরব। কিন্তু আল কোরআন ও রাসূল (সাঃ) যেহেতু আল্লাহপাক প্রেরিত নূর ও রহমতের এক অপার মহাসমুদ্র, এই আলো ও কল্যাণের স্পর্শমাত্র সকল কুহক, সকল ইবলিসী-বিদ্যার মৃত্যু ও বিদায় অবশ্যম্ভাবী। এজন্য শয়তানের প্রথম আক্রমণই হলো আল কোরআনের বিরুদ্ধে, রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে এবং ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে।

এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন ছিল এজন্য যে, সমগ্র মানববংশের জন্য আল কোরআন এমন একটা অখণ্ড নূর, যা সকল ইবলিসী-জঞ্জালকে পুরোপুরি বিতাড়িত করে দেয়। এজন্য ইবলিস ও তার অনুগত সহচরদের কাছে কোরআন শরীফের চেয়ে অধিক বিপজ্জনক আর কিছু নেই। অতএব এই 'বিপজ্জনক' বস্তুটিকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখা ও তার চর্চাকে প্রতিরুদ্ধ করা শয়তানের একটি 'পবিত্র' ও সার্বক্ষণিক কর্ম। আর এই কাজে যদি শয়তান আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারে, সেটাই হবে তার সর্বোচ্চ সাফল্য; কারণ ইবলিসের অপ্রতিহত অগ্রগতি ও তৎপরতায় এখন বিশেষ আর কোন বাধা থাকে না। এবং এই হেতুই, শয়তানের কাছে আপাদমস্তক বিক্রয় হয়ে-যাওয়া কিছু কুখ্যাত বুদ্ধিজীবী ইসলামের শাশ্বত-অবিনশ্বর চেতনাকে 'মৌলবাদ' বলুক আর যাই বলুক, লক্ষ্য একটাই—দেশ থেকে, সম্ভব হলে পুরো পৃথিবী থেকে কোরআন-হাদীসকে নিঃশেষে অদৃশ্য করে দেয়া। এবং এজন্যই আজ যখন এতকিছু থাকতে মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, আমি অন্তত বিস্মিত হই না। হই-না এজন্য যে, ইবলিসের-তো এটাই কাজ। কিন্তু কোরআনপাকের ঘোষণা অনুযায়ী ইবলিস ও তার অনুগত কিংকরদের বুদ্ধি যেহেতু খুব বেশি নয় এবং তাদের চক্রান্তও দুর্বল, তাদের চালাকি ও 'সুপরামর্শের' অন্ত:সারশূন্যতা বেশি সময় গোপন থাকে না। অনেক মাদ্রাসায় ছাত্রসংখ্যা আশানুরূপ নয়, পাঠাগার দরিদ্র, মাদ্রাসা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ-যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, 'মৌলবাদী' শিক্ষা আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে একেবারেই শুধু নিষ্ফল সময় ও অর্থ এবং শ্রমক্ষয় মাত্র-এই ধরনের কিছু 'অকাট্য কল্যাণকর' যুক্তি মাদ্রাসা-বন্ধের জন্য 'খুবই উপকারী' পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। মূল চক্রান্তের এটাই আপাতমধুর সারাংশ। অবশ্য আলেম-উলামা ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রবল প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মুখে 'মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা বন্ধের

www.pathagar.com

কোন দুরভিসন্ধি নাই' বলে সংশ্লিষ্ট পরাক্রমশালী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন বটে কিন্তু কুযুক্তিগুলি প্রত্যাহৃত হয় নি। আল্লাহপাক আলিমুল গায়িব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অন্তরের খবর আল্লাহপাকই জানেন। আমি শুধু বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান এই 'অখণ্ডনীয় নির্মল' যুক্তিসমূহের যে কী-ভয়ঙ্কর কুৎসিত রূপ ও কী-ধরনের ছেলেমানুষি দ্বারা এই যুক্তিগুলো রচিত, সে-বিষয়ে কিছু আরজ করতে চাই।

অনেক মাদ্রাসায় যেহেতু ছাত্র সংখ্যা আশানুরূপ নয়, অতএব সেই সকল প্রতিষ্ঠান সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার বহির্ভূত থাকাই বাঞ্ছনীয়। যুক্তিই বটে! কিন্তু এই মনোরম যুক্তির যাঁরা প্রণেতা ও উপস্থাপক, তাঁদের কাছে সবিনয়ে এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি- সহায়তা ও আনুকূল্য এবং পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে যে-অগ্রাধিকার, তা-কি প্রয়োজন ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিরূপিত হবে, নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা? সংখ্যাই যদি হয় সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্তগ্রহণের মানদণ্ড, তাহলে কবি কি বিজ্ঞানী কি মানবপ্রেমী চিন্তাবিদদের তুলনায় শুধু এই ঢাকা শহরেই পকেটমারের সংখ্যা অনেক বেশি, অতএব তারাই সর্বোচ্চ আনুকূল্য লাভের ন্যায্য দাবীদার। আসলে সংখ্যাগত গরিষ্ঠতা গণতন্ত্রের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত হলেও, সর্বক্ষেত্রে ও সর্বদা এই শর্ত মান্যযোগ্য নয়। ইসলামী শিক্ষা যদি গর্হিত ও অনাবশ্যক বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে কোন কথা নেই; কিন্তু দেশ ও সমাজ, জাতি ও জনগণের জন্য এই শিক্ষা যদি উপকারী ও প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে শুধু ছাত্রসংখ্যার অপ্রতুলতার অজুহাতে মাদ্রাসার উপর থেকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করে নেয়া খুবই অসমীচীন ও অযৌক্তিক। এতদসঙ্গে দরিদ্র-পাঠাগার ও পুস্তকাদির সংখ্যাল্পতা যদি কোন গুরুতর কারণ হয়, সে-বিষয়টিও আমাদের ভেবে দেখা কর্তব্য। সত্য যে, অধিকাংশ মাদ্রাসাতেই উপযুক্ত মানের লাইব্রেরী নেই; কিন্তু থাকবে-না কেন? বছরে এই দরিদ্র দেশেও শত রকমের জন্ম মৃত্যুর মহোৎসব, গীত ও নৃত্যবাদ্যের বিশাল বিশাল জলসা, কোটি কোটি টাকার খেলাধূলা, নানা নামে, নানা অছিলায় প্রায়শই নিরর্থক বিদেশ ভ্রমণে লক্ষ লক্ষ ডলারের 'সদ্ব্যবহার', মিলে-কলে-কারখানায় হাজার হাজার কোটি টাকার ভর্তূকি, ব্যাংকে হাজার হাজার কোটি টাকার অনাদায়ী খেলাপী ঋণ-এসব কোনকিছুই যদি সরকারকে বিচলিত না-করে, এবং তা পূর্বাপর সরল ও সম্মানজনক ভাবে অব্যাহত থাকে, তাহলে ন্যূনতম সদিচ্ছা থাকলে এসব খরচের (অপব্যয় বলাই যুক্তিযুক্ত) এক লক্ষাংশ দিয়ে সকল মাদ্রাসাকে উপযুক্তভাবে পাঠাগার-সজ্জিত করা আদৌ দুরূহ নয়। বস্তুত, কর্তৃপক্ষ আরোপিত এই শর্তটিও ইনসাফ-নির্ভর নয়। তৃতীয়ত এবং চূড়ান্তভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে যা বলা হয় তাহলো, এই ধরনের মৌলবাদী শিক্ষা দিয়ে কোন কাজ-তো হয়ই না, বরং শুধু এক অকর্মণ্য বেকারের মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে। আমরা যাই বলি, এই বক্তব্যটি কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যই-তো মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রী গ্রহীতাদের চাকরি কোথায়?

www.pathagar.com

তাদেরকে কাজে লাগানোর মত জায়গা কোথায়? অতএব এই দু:সহ, দুর্বহ বেকারত্বের কথা মনে রেখে কোন দায়িত্বশীল সরকার ইসলামী শিক্ষা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এটাই-তো 'সময়ের যৌক্তিক দাবী'। কর্তৃপক্ষের এই সদিচ্ছা ও সদ্বিবেচনা সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবো না, করা সংগতও নয়; বরং বলবো, এই জাতীয় আন্তরিক দায়িত্ববোধ খুবই প্রশংসনীয়।

কিন্তু এই প্রেক্ষিতে সবকিছু মেনে নিয়ে খুব ক্ষীণকণ্ঠে হলেও, একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি : অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কী অবস্থা? বেকারত্বের প্রশ্নে, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর যে-লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বহির্গত হচ্ছে, তাদের প্রকৃত অবস্থা কেমন? দুর্বিসহ বেকারত্বের চাপে তাদের একটি বিরাট অংশ বাধ্য হয়ে মাস্তান, চাঁদা ও টেণ্ডারবাজ, ফেনসিডিল-হেরোইনসেবীতে কি পরিণত হচ্ছে না? আর অতি নগণ্যসংখ্যক ভাগ্যবান, যারা প্রতিভা কি তদবির কি বিশাল অঙ্কের উৎকোচ প্রদানের বিনিময়ে চাকরি লাভ করছে, তারা কি অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে আদৌ সচেতন? যতদূর জানি, অতি নগণ্য ব্যতিক্রম ছাড়া, চাকরিতে যোগদানের প্রথম পুণ্যদিবস থেকেই তাদের একমাত্র লক্ষ্য উৎকোচ উৎকোচ এবং উৎকোচ। এদের দ্বারা মানুষের ও দেশের কোন উপকার-তো হয়ই না, বরং দুর্ভোগ বাড়ে, জুলুম প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব চাকরি আপাতদৃষ্টিতে চাকরি বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব হলো অর্থ-আত্মসাতের এক-একটি গভীর গহ্বর, অপ্রতিবাদযোগ্য লুণ্ঠন ও দস্যুতা। অনেকে ভালো আছেন, অনেকের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও হালাল-হারামের বিবেচনা আছে, মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার অনুভূতি আছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা কত? নির্ভুল পরিসংখ্যান জানা নেই, তবে আমার দীর্ঘ চাকুরি-জীবনের অভিজ্ঞতা ও নানা নির্ভরযোগ্য খবরাখবরের ভিত্তিতে বলতে পারি, এই ধরনের ঘুষ না-খাওয়া, সরকারী-বেসরকারী অর্থ তসরুপ না-করা, রাষ্ট্র ও জনগণের হক বিনষ্ট না-করা, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি দায়িত্বনিষ্ঠ 'বদ্ধউন্মাদের' সংখ্যা তিন শতাংশের অধিক হবে না। অতএব সাতানব্বই শতাংশের যা-কাজ, সে-তো বেকারত্বের চেয়েও বহুগুণ ভয়ংকর। আসলে মাসান্তে মাইনে পাওয়াটাই যদি বেকারত্বের সমাধান হয়, তাহলে আমাদের একজন বিদগ্ধ সাংবাদিক বন্ধু 'কলকাতা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী জ্যোতির্ময় দত্ত একদা যা লিখেছিলেন, সেটাই একটি মোক্ষম পন্থা। তিনি বলেছিলেন, সারাদেশে শহরে শহরে লক্ষ লক্ষ মূত্রাগার স্থাপনকরত, সেখানে পাহারাদার হিসেবে দু'জন করে ব্যক্তিকে চাকুরির নিয়োগপত্র প্রদান করলে বেকারসমস্যা বহুলাংশে লাঘব হতে পারে। কথাটি এভাবে বললাম এই কারণে যে, বস্তুত আমরা যাদেরকে চাকরিজীবী বলি, তাদের দ্বারা রাষ্ট্র আদৌ উপকৃত হচ্ছে না, তারা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের ভাগ্যবান পোষ্য মাত্র। শুধু পোষ্য নয়, সরকারী ক্ষমতা ও অর্থ ও সম্পদের তাঁরা এমনই 'হেফাযতকারী' যে, রাষ্ট্রীয় কোষাগার এবং জনগণের সকল আমানত তাদের কাছে এখন বিশুদ্ধ গনীমতের মাল।

www.pathagar.com

অতএব এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা একটা বেকারত্বের 'কারখানাই' বটে। এবং এই কারখানায় যত দ্রুত সম্ভব তালা ঝুলিয়ে লক-আউট ঘোষণার চেয়ে 'উত্তম ও সমীচীন' পদপেক্ষ আর কী হতে পারে! কিন্তু এই প্রেক্ষিতেও বর্তমান এই না-লায়েক আলোচকের দু'টি কথা আছে। প্রথমত, চসার কি মার্লো কি শেক্সপিয়র, বঙ্কিম কি টেকচাঁদ ঠাকুর পড়লে যদি বেকার থাকতে না-হয়, উমার ফারুক (রাঃ) শেখ সাদী (রঃ), মওলানা রুমি কি মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রঃ) পড়লে বেকার থাকতে হবে কেন? 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' পড়লে চাকরি পাওয়া যাবে অথচ পবিত্র বোখারি শরীফ পাঠের কোন মূল্য হবে না, এটা কী-ধরনের বিবেচনা? প্লেটো, ট্রটস্কির রাষ্ট্রদর্শন পাঠ করলে তিনি পণ্ডিত, আর মহানবী (সাঃ) বা খলীফা উমারের নিখুঁত রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়টি হলো অপাংক্তেয় মোল্লাতন্ত্র। বদনসীব! ইবলিস আসলে এভাবেই মানুষকে আত্মহননে প্রলুব্ধ করে, আত্মভ্রষ্টতা ও আত্মবিস্মৃতির প্ররোচনা জোগায়। দ্বিতীয়ত, এই একটি কথা নিশ্চয়ই উপেক্ষার যোগ্য নয় যে, আমাদের প্রণীত সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যসূচী যত জ্ঞানগর্ভ ও মহামূল্যবানই হোক, যত মনীষীপ্রতিম শিক্ষকই শিক্ষাদান করুন, যত সুসজ্জিতই হোক পাঠকক্ষ ও পাঠাগার, সকল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আজ এক-একটি ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র। শুধু রণক্ষেত্র নয়, সন্ত্রাস ও ধর্ষণ ও চাঁদাবাজির এক-একটি অতি নিরাপদ অভয়ারণ্য। অথচ এ-তুলনায় মাদ্রাসায় যারা শিক্ষাগ্রহণ করছে, যাঁরা শিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁদের আচার-আখলাক, নীতি ও মনুষ্যত্বনিষ্ঠা কত বেশি উঁচু ও উজ্জ্বল! সত্যই বড় আফসোসের কথা, নৈতিক বিপর্যয়ের কারণে আজ যখন সারা পৃথিবীতেই হাহাকার, আজ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বল্গাহীন অশ্বটিও ধর্মের কাছে, 'ঈশ্বরের' কাছে ফিরে আসবার জন্য ব্যাকুল, তখন আমাদের এই পঁচাশি শতাংশ ধর্মভীরু মুসলমানের দেশে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর পথনির্দেশকে তুলে ধরার জন্য ছোট ছোট জোনাকির মত যে-মাদ্রাসাগুলো এখনো জ্বলছে, তাকে নিভিয়ে দেবার এই 'মহৎ' অভিলাষ আসলেই বড় রহস্যময় ও বিস্ময়কর।

অথচ এরকম-তো হওয়ার কথা নয়। নেপথ্যে কোন দূরাগত দুরভিসন্ধি নেই তো? সম্ভবত আছে। আল্লাহপাক ভালো জানেন, না-থাকতেও পারে। তবে এটা সত্য যে, আমরা ভুলে যাই, কিন্তু আমাদের শত্রুরা প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাদের চোখে বার বার ভেসে ওঠে বক্ষবিদারক বহু স্মৃতি। তারা ভালো করেই জানে, শুধু এই কোরআন-হাদীসের শিক্ষা-শক্তির কাছেই একদিন ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল প্রবল প্রতাপান্বিত কিসরা ও কাইজারের মনি মানিক্যখচিত মুকুট; আবির্ভূত হয়েছিলেন এক-একজন অপ্রতিরোধ্য খালিদ বিন ওয়ালিদ, তারিক বিন জিয়াদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম। এবং এটা-তো ভুলে যাওয়ার মত বেশি দূরের কথা নয় যে, এই কোরআন-হাদীসের বিধান ও সংবিধানের আলোকেই অর্ধেক বিশ্ব শাসিত ও পরিচালিত হয়েছে সহস্র বৎসর ধরে

www.pathagar.com

একাদিক্রমে। ডব্লিউ হান্টার তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে মুসলমানকে আক্রোশবশত 'সন্ত্রাসী' বলে অভিহিত করেছেন বটে, কিন্তু বার বার একথাও ব্যক্ত করেছেন যে, শুধু কোরআন-হাদীস পড়া মুসলমানের জন্যই বৃটিশদের রাজ্যশাসন সুখময় ও নির্বিঘ্ন হতে পারে নি। আমরা ভুলে যাই, কিন্তু আবার উল্লেখ করি, আমাদের শত্রু-দুশমনদের স্মৃতিশক্তি বড় প্রখর; তারা একবর্ণও বিস্মৃত হয় নি অধীত ইতিহাস। অতএব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বলি আর ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের কথাই বলি, সকলের সকল আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হলো কোরআন এবং হাদীস। আসলে যে-যাই বলুক, এটাই বাস্তব যে, কুসীদজীবী ইহুদিদের বিশ্বব্যাপী তৎপরতা, অশ্লীল সংস্কৃতির প্রসার, রাখীবন্ধন উলুধ্বনি যৌনতা, শোষণ ও ত্রাস, এসব যদি অব্যাহত রাখতে হয়, কোরআন-হাদীসের চর্চাকেন্দ্রগুলো উৎখাত করা অতীব জরুরি। কারণ এখান থেকে যে ইল্‌ম ছড়িয়ে পড়ে, ইসলামের একান্ত অনুগত যে-আলেম তৈরী হয়, সেই ইল্‌ম ও আলেমের পার্থিব মূল্য কম-বেশি যাই হোক, তাঁদেরকে ভয় কিংবা লোভের খাঁচায় আবদ্ধ করা কঠিন। তাঁরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর কাছে অঙ্গীকার বদ্ধ, তাঁদের পথনির্দেশক কম্পাস হলো আল কোরআন এবং আল হাদীস। আল্লাহর ভয় ছাড়া তাঁদের অন্তরে দ্বিতীয় কোন ভয় নেই, তাঁরা অকুতোভয় এবং ইতিহাসও এই কথাই বলে। ইসলামের সেই একেবারে প্রথমকাল থেকে অদ্যাবধি, আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে যাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে অব্যাহত রেখেছেন, শয়তানী-শক্তির সকল ভ্রূকুটি ও চক্রান্তকে জীবন দিয়ে যাঁরা প্রতিহত করেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন কোরআন-হাদীসের আলেম, ছিলেন আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর মুহাব্বতে ইসলামের জন্য প্রাণোৎসর্গকারী এক একজন মর্দে মুজাহিদ। অতএব এই ধরনের আলেম-উলামা তৈরীর 'কারখানা', এই মাদ্রাসাসমূহ যদি ইসলামবৈরী তাগুতি-শক্তির কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এবং মাদ্রাসা বন্ধের সকল ব্যবস্থা তারা পরিপক্ক করে তোলে, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এবং এটাও আশ্চর্যের নয় যে, পীর-দরবেশদের নিয়ে, সুফি, আবেদ, আরেফ-আউলিয়াকে নিয়ে অথবা কোন মাযার-খানকাহ, দোয়া-দরুদের মাহ-ফিল নিয়ে কারো মধ্যে কোন উৎকণ্ঠা নেই; সকল আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হলো আলেম ও আলেমদের জন্মস্থান মাদ্রাসা।

অবশ্য এটা স্বাভাবিকও বটে। পীর-আউলিয়াদের নিয়ে সমস্যা খুবই কম। তাঁদের যা-কিছু সবক্ সবই অপার্থিব, সেখানে জীবন ও জগতের কোন কথা নেই; তাঁদের সব সবক্‌ই মৃত্তিকার নিম্নভাগ কবর ও মৃত্যুপরবর্তী উর্ধাকাশ নিয়ে আবর্তিত। অথচ আলেমদের কথাবার্তাই অন্যরকম; এঁদের উৎখাত করা না-গেলে, ইবলিসের পক্ষে কোন চক্রান্তই সফল করে তোলা সম্ভব নয়! আসলে এজন্যই ইসলামে আলেমদের এত মর্যাদা! রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের একজন সাধারণ মানুষ এবং আমার মধ্যে

www.pathagar.com

যে-পার্থক্য, একজন আবেদ ও আলেমের মধ্যে ততখানি পার্থক্য। ধর্মজ্ঞানে সুপন্ডিত কোন ব্যক্তি শয়তানের কাছে হাজার জন আবেদের চেয়েও কঠিন ও ভয়াবহ বলে বিবেচিত হয়' (তিরমিযী শরীফ)। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এই এরশাদও করেছেন, 'সর্বোত্তম কালাম হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বাধিক কল্যাণময় বিধান হচ্ছে তাই, যা মুহম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত' (বোখারি শরীফ)। অতএব এই সর্বোত্তম কালাম ও সর্বোত্তম বিধান থেকেই যদি মুসলমানকে মাহরুম করা না-গেল, তাহলে ইবলিস ও তার অনুসারীদের সবই-তো পণ্ডশ্রম। কিন্তু সমূহ 'দুঃখের' কথা, কাফেরদের কিংকরসদৃশ কিছু মুসলমান যতই আত্মঘাতী প্রবণতায় প্রবৃত্ত হোক, যতই তুমুল হয়ে উঠুক মুশরিক-মুনাফিকদের চতুর চক্রান্ত, মাদ্রাসা শিক্ষা শুধু এদেশে কেন, কোনকালে কোন দেশেই বন্ধ হবে না। এমনকি বৃটেন-আমেরিকাতেও নয়, এমনকি ভারতবর্ষেও নয়। অনুমান করি, আমাদের অনেক মানবহিতৈষী বুদ্ধিজীবী মনে অত্যন্ত কষ্ট পাবেন, কিন্তু কথাটা আমার নয়। রাসূল (সাঃ) স্বয়ং এরশাদ করেছেন, 'ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় অক্ষত থাকবে; দ্বীনের সুরক্ষা ও বিজয়ের লক্ষ্যে উম্মতের একটি অংশ নিয়োজিত থাকবে জিহাদে'। আল্লাহপাকও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন-কাফেররা আল্লাহর নূরকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু তা অসম্ভব; কাফেরদের জন্য বেদনাদায়ক, আল্লাহপাক তাঁর নূরকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন (সূরা ছফ)। অতএব মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ বা সংকোচনের নেপথ্যে কার কী ভূমিকা জানি না, জানার কোন কৌতূহলও নাই, শুধু এটুকু উল্লেখ করতে চাই—আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে, দেশের শতকরা পঁচাশি শতাংশ মানুষের ধর্মপ্রীতির বিরুদ্ধে, কোন যুদ্ধ ঘোষণা খুবই অবিমৃশ্য হঠকারিতার পরিচয় বহন করে। আর এর সঙ্গে যদি জুলুমের কোনরূপ সংশ্রব থাকে, তাহলে-তো মনে রাখা খুবই জরুরি, মযলুমের ফরিয়াদ আল্লাহ কখনো অগ্রাহ্য করেন না। এবং এ-কথাও সর্বদা স্মরণ রাখা কল্যাণকর যে, আল্লাহর রহমতের মত আল্লাহর গযবও অত্যন্ত নিকটবর্তী। 'ইন্না বাতশা রাব্বিকা লা শাদীদ' তোমার প্রতিপালকের প্রহার বড়ই কঠিন (সূরা বুরুজ)। আর এ-বিষয়ে আমাদের কারো অসতর্ক হবার কোন অবকাশ নেই, কারণ 'ইন্না রাব্বাকা লাবিল মিরসাদ' তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (সূরা ফাজর)। অতএব মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ কি সঙ্কোচনের এই নীতি, এই আত্মঘাতী পদক্ষেপ, এই বালোচিত হঠকারিতা পরিহার করা, জাতির জন্য-তো বটেই, আমাদের নিজের জন্যও উপকারী। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

দৈনিক ইনকিলাব : ৫.১১.৯৯

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষা : আমাদের বদনসীব

বাংলাদেশের-তো বটেই, সারা পৃথিবীর শিক্ষাব্যবস্থারই আজ আমূল পরিবর্তন দরকার। দরকার এইজন্য যে, পৃথিবীব্যাপী বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রায় পুরোটাই এখন ইবলিসের পরিকল্পনা ও অভিপ্রায় দ্বারা চালিত। এবং এটা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নয় যে, বর্তমান সময়ে সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার, গবেষণা ও গ্রন্থরাজি সব নিয়ে যে-এক বিশাল শিক্ষাযজ্ঞ, তা প্রায় পুরোপুরিই শয়তানের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এইজন্যই পৃথিবী শিক্ষার নামে যে-তালিম দিচ্ছে, তা-থেকে বড় ও খাঁটি মানুষতো দূরের কথা, মোটামুটি সাধারণ মানসম্পন্ন মানুষও তৈরী হচ্ছে না। বলাই বাহুল্য, শুধু লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি অসাধু উৎকোচজীবী আত্মম্ভরী স্বার্থান্ধ তৈরী হচ্ছে; তৈরী হচ্ছে সংকীর্ণমনা মানববিদ্বেষী পদ-ক্ষমতা ও সম্পদলোভী এক শ্রেণীর বেপরোয়া প্রতিহিংসাপরায়ন অপরিণামদর্শী দ্বিপদ জন্তু। অর্থাৎ দেশে দেশে এখন প্রকৃত মানবপ্রেম-সমৃদ্ধ সৎ ও সত্যবাদী ও উন্নতমনা, অন্যায়ের মোকাবিলায় সাহসী ও নীতিনিষ্ঠ মানুষ ক্রমেই বিরল থেকে বিরলতর হয়ে উঠছে। আফসোস, ইবলিস এমন শক্তভাবেই পুরো পৃথিবীটাকে বেঁধে ফেলেছে যে, প্রচলিত বর্তমান-শিক্ষার গুণে ও মাহাত্ম্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসছে শুধু উঁচু-উঁচু উপাধিধারী শঠ ও প্রবঞ্চক, স্বার্থপর দায়িত্বহীন ও লাম্পট্যলুব্ধ জানোয়ারদের অব্যাহত কাফেলা। এবং আপাদমস্তক জান্তব-স্বভাবের এই শিক্ষিত মানবরূপী পশুদের দ্বারাই যেহেতু পৃথিবী শাসিত ও পরিচালিত হচ্ছে, পৃথিবীর পক্ষে জ্বলন্ত জাহান্নামে পরিণত হওয়াটাই স্বাভাবিক, এবং তাই-ই হয়েছে। এইজন্যই রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'কুশিক্ষিত ব্যক্তিই, সর্বনিকৃষ্ট'; এবং এইকথাও বলেছেন, 'এমন একদিন আসবে, যেদিন আকাশের নীচে আলেমরাই (অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তিরাই) হবে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব'। দেশ ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে এই ধারণা আর পরিহার করা যায়-না যে, রাসূল (সাঃ)-এর এরশাদকৃত সেই ভয়াবহ দুঃসময় পুরোপুরিই অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু এই জটিল দুঃসময় থেকে নিষ্ক্রমণের উপায় কী? অবশ্য এই কথার আগে এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া আবশ্যক যে, আমরা সত্য সত্যই বর্তমান এই ব্যর্থ ও অনাবশ্যক ও আত্মঘাতী শিক্ষা থেকে পরিত্রাণ পেতে ইচ্ছুক কিনা। আলোচনার সুবিধার্থে ধরেই নিলাম, আমরা ইচ্ছুক। যদি ইচ্ছুক হই তাহলে, এটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার, এই সর্বনাশ থেকে উত্তরণের যে-ব্যবস্থাপত্র, তা যতই কঠিন ও অপছন্দনীয় হোক, আমরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত কিনা। অবশ্য এটা সত্য যে, বর্তমানের এই কুফলদায়িনী অনিষ্টকর শিক্ষাব্যবস্থা সকলের কাছেই দুর্ভাবনার বস্তু নয়, কারো কারো কাছে খুব প্রীতিকরও বটে। তারা চায় না, এই অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটুক, কারণ অশিক্ষা-কুশিক্ষার জাহেলিয়াত তাদের তাৎক্ষণিক বৈষয়িক মুনাফার বিশেষ সহায়ক। অতএব ক্ষতি ও ব্যর্থতা ও অন্তঃসারশূন্যতা যত প্রকটই হোক, বর্তমান-শিক্ষার বাইরে-অভ্যন্তরে

www.pathagar.com

যে-গাঢ় অন্ধকার বিরাজমান, তাকে সর্বশক্তি দিয়ে অক্ষত রাখা তাদের অস্তিত্বের প্রশ্নেই অত্যন্ত জরুরি। এরা মুখে যাই বলুক, অন্ধকার এদের জীবিকা, অন্ধকার এদের উপরে উঠার সিঁড়ি, অন্ধকার এদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। অতএব এই ধরনের কিছু মানুষ কিছুতেই চায় না, শিক্ষাব্যবস্থার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে-পড়া যে-কঠিন কুষ্ঠরোগ আজ সমগ্র মানবসভ্যতাকেই গ্রাস করতে উদ্যত, তার অবসান হোক। স্বাভাবিক নিয়মে চাইতে পারেও না, কারণ কোন চিকিৎসকই চায় না, পৃথিবী থেকে রোগ-ব্যাধি নির্মূল হয়ে যাক; বরং যেহেতু রোগই তার উপজীবিকা, রোগের ক্রমবিস্তারই তার কাম্য। অনেকটা এইরকমই, ভুল ও অসৎশিক্ষাই যাদের সার্বিক স্বার্থের অনুকূল ও অবলম্বন, তাদের কাছে প্রকৃত শিক্ষা এতই অসহ্য ও আত্মস্বার্থবিরোধী যে, এক্ষেত্রে বাধা দান করাই তাদের কাজ। এবং প্রয়োজন হলে, এই কুৎসিত অন্ধকারকে টিকিয়ে রাখতে তারা আমৃত্যু জিহাদ করতেও প্রস্তুত। আল-কোরআনে এদেরকেই বলা হয়েছে 'হিজবুশ্ শয়তান' শয়তানের বাহিনী, 'যারা ক্রয় করে নিয়েছে হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহি এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি'। এবং অতীব দুঃখের কথা, এরা সংখ্যায় নগন্য হলেও, শিক্ষা সংস্কৃতি আজ এই কতিপয় দুষ্টজনেরই নিয়ন্ত্রনাধীন। অতএব খুব শীঘ্রই-যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তার উপদংশ থেকে নিরাময় হয়ে উঠবে, এমন আশা করা যায় না। না-যাক, সে-নিয়ে আমাদের পেরেশানির কিছু নেই। আমাদের কাজ শিক্ষার ভেতরে-বাইরে যে-রোগ বাসা বেঁধেছে তার পরিচয় তুলে ধরা এবং নিরাময়ের সঠিক ব্যবস্থাপত্র পেশ করা।

প্রকৃত সমস্যা হলো, ইবলিসের প্ররোচনাবশতই হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, মানুষ এখনো বুঝতেই পারে-নি এবং বুঝতে চায়-ও না যে, কোন্ শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ তৈরী করে, কোন্ শিক্ষা যথার্থই কল্যাণধর্মী এবং কোন্টা তা নয়। এবং এই শিক্ষাক্ষেত্রেও, অন্যান্য সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের মতই, স্থায়ী ও শাশ্বত কল্যাণের পরিবর্তে মুখ্য হয়ে ওঠে তাৎক্ষণিক লাভালাভের প্রশ্ন। সূরা বাকারা-তে দেখা যায়, ব্যাবিলনে এক সময় শয়তান মানুষের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটানোর মত যাদুবিদ্যার প্রসার ঘটিয়েছিল। তখন শয়তানের বহু বশংবদের কাছে এই যাদুও একটা শিক্ষারূপেই গণ্য হতো। মদ্য-প্রস্তুতিকরণও আজ এক 'বিরাট শিক্ষা'; কারণ কোটি কোটি মানুষ এই মদিরার শুধু একনিষ্ঠ ভক্ত ও ভোক্তাই নয়, কোটি কোটি মানুষের জীবিকাও এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। উল্লেখযোগ্য, দুই হাজার সালকে সামনে রেখে ফ্রান্সে তিন কোটি বোতল শ্যাম্পেন প্রস্তুত করা হয়েছে, যার এক-একটি বোতলের মূল্য বিশ হাজার ডলার। অভাবনীয়! পৃথিবীতে শুধু মদের পশ্চাতেই কত হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার ফুৎকারে উড়ে যাচ্ছে! এটাও শিক্ষা! পৃথিবীতে-যে কোটি কোটি বিলিয়ন ডলারের মারণাস্ত্র তৈরী হয়েছে ও হচ্ছে, তার লক্ষ্যস্থল নিশ্চয়ই কোন সাগরবক্ষ বা জনহীন সাহারা মরুভূমি নয়, অবশ্যই কোন-না-কোন ঘন বসতিপূর্ণ নগর বা রাজধানী। এই মানববিধ্বংসী গর্হিত মারণাস্ত্র-নির্মাণ ও তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞানার্জনও একটি শিক্ষা। এ-

www.pathagar.com

তো একটি দুটি উদাহরণ মাত্র। আসলে এইভাবে শিক্ষার নামে যা পুরো পৃথিবী দখল করে আছে, তা পুরোটাই শক্তি ও অর্থের অপচয়, পুরোটাই আত্মঘাতী কৌতুক এবং পুরোটাই এক ধরনের মানববিনাশী দস্যুতা। অথচ পৃথিবীর কী বদনসীব, এটাও শিক্ষা!

অনুমান করি, পাঠক ইতোমধ্যেই অধীর ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। তাঁরা জানতে চান, এ-থেকে নিষ্ক্রমণের উপায়টা কী এবং কী-সেই ব্যবস্থাপত্র, যা এই দুর্মর শিক্ষাসমস্যা থেকে মানববংশকে উদ্ধার করতে পারে? সেটাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়, কিন্তু সে-কথায় পরে আসছি। পরে, কারণ ইবলিসের যারা অনুগত বশংবদ তাদেরও অনেক যুক্তি আছে, অনেক কথাও আছে। ইবলিসের বাধ্য-অনুগত কিংকরেরা চীৎকার করে বলতে পারে, আধুনিক শিক্ষাজাত বিজ্ঞানের যে-অগ্রগতি ও গগণচুম্বী সাফল্য, পৃথিবীর মানুষ তার-যে ষোল আনা ফলভোগ করছে এবং আরামে-আয়েসে আছে, একথা কি অস্বীকার্য? এই শিক্ষা কি মানুষকে এক বিরাট বৈভবের অধিকারী করে নি? জীবনকে করে-নি সহজ ও সুগম ও উপভোগ্য? স্বীকার করতেই হবে, নিন্দা-মন্দ যাই করি, এই শিক্ষা মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে, অঢেল সুখ অঢেল আনন্দ বিত্তবৈভব অনেক কিছু। শুধু পরিতাপের বিষয়, নি:শেষে ছিনিয়ে নিয়েছে বিবেক ও দায়িত্ববোধ ও নৈতিক-আকুলতা। শারীরিক আরামই জীবনের লক্ষ্য নয়, বৈভবের মধ্যে সুখে-থাকাও নয়। ক্লিনটনের কুকুরও বড় পোস্টে চাকুরি করে, রাজকীয় ঈর্ষণীয় জীবন যাপন করে; তাই বলে এই সুখী-সারমেয়টি কি মানুষের মর্যাদা পাবে! মানবসভ্যতা আজ শিক্ষার গুণে এই সংকটেই নিপতিত।

যাই হোক, শিক্ষা কী, শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত, 'শিক্ষার হেরফের' ইত্যাদি নিয়ে পৃথিবীর সেই সুদূরকালের প্লেটো এ্যারিস্টটল সক্রেটিস থেকে একেবারে বর্তমান সময়ের বার্ট্রাণ্ড রাসেল রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু মনীষী বহু কথা বলেছেন। সে-সব কথা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে-সকল সুপরামর্শের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যাবত্তা ও সদিচ্ছার পরিচয় থাকলেও, তা-থেকে খুব-একটা ফললাভ করা যায় নি। নীট্‌শের শিক্ষা নিয়ে তৈরী হয়েছে হিটলার, মার্কস ও ডারউইনের সবক নিয়ে তৈরী হয়েছে মানবরক্তপিপাসু নাস্তিক্যবাদী লেনিন, তৈরী হয়েছে হার্ভার্ড অক্সফোর্ড থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত রিরংসু কাম-কাতর ক্লিনটন, কিন্তু মানুষ তৈরী হয় নি।

এখন দেখতে চাই, এ-বিষয়ে আল্লাহপাক কী বলেন। আল্লাহ বলেন, 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজী খালাক' পাঠ করো সর্বস্রষ্টা তোমার প্রভুর নামে; 'খালাকাল ইনসানা মিন আলাক' যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (তুচ্ছ) জমাট (একবিন্দু) রক্তপিন্ড থেকে; 'ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম' পাঠ করো, তিনি মহাপরাক্রমশালী মহাসম্মানিত; 'আল্লাজী আল্লামা বিল কালাম, আল্লামাল ইনসানা মাআলাম ইয়ালাম' যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষ যা জানতো না (সূরা আলাক)। শিক্ষাগ্রহণের

www.pathagar.com

শুরুতেই তিনটি বিষয় এখানে আল্লাহপাক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, যা মানুষের জন্য শিক্ষার প্রাথমিক পূর্বশর্ত। এক. পড়তে হবে, কিন্তু পড়তে হবে মহান প্রতিপালকের কথা মনে রেখে। দুই, মনে রাখতে হবে, মানুষ এক অতি তুচ্ছ উপকরণ থেকে সৃষ্ট অর্থাৎ আত্মম্ভরিতার আদৌ কোন স্থান নেই; তিন, মানুষের কোন জ্ঞানই তার নিজস্ব নয়, সবই সেই মহাপরাক্রমশালী প্রভুরই একান্ত অনুগ্রহের দান। বিধর্মী অমুসলিমদের যাই হোক, মুসলমান আজ এই শর্ত পুরোপুরি বিস্মৃত হয়েছে। তার শিক্ষাগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে আল্লাহর কোন নাম-গন্ধ নেই; কত তুচ্ছ বস্তু থেকে তার জন্ম, সেই বিবেচনা থেকে তার-যে অহমিকা পরিত্যাগ করার কথা, সেটাও নেই; আর জ্ঞান ও ইল্‌ম-যে একান্তভাবে আল্লাহরই অনুগ্রহ, সেই বোধ-তো একেবারেই নেই। অতএব আল্লাহর নাম ও মহিমা-বিস্মৃত, দুর্বিনীত, আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে উদাসীন এই মুসলিম জাতির সকল শিক্ষা যদি নিরঙ্কুশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, সেটাই স্বাভাবিক।

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা হলো তওহিদ ও রেসালাত ও আখেরাত। এই তিনটি বিষয় ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই রাসূল (সাঃ) তাঁর সাহাবীদেরকে এমন সুশিক্ষিত করে তুললেন, পরিণত করলেন এমন এক-একটি হীরকখন্ডে, যা সর্বকালের এক বিস্ময়, যে-কোন মানদণ্ডে চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্বের যাঁরা অধিকারী। শৌর্যে-সাহসে, সততা-পবিত্রতায়, সর্বমানবিক প্রেম ও মমতায়, পূর্ণ দায়িত্ববোধ ও নির্লোভ জীবনাচারে, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও মনুষ্যত্বনিষ্ঠায় এমন একদল স্বর্ণপ্রভ মানুষ তৈরী হলো, যাঁদের সততা ও ইনসাফ ও হিম্মতের সামনে অর্ধেক পৃথিবী সভয়ে-সবিনয়ে মাথা নত করে দিল। এটা কোন আবেগতাড়িত অত্যুক্তি নয়, এটা ইতিহাস। কিন্তু এই অভাবনীয় সাফল্যের মূল শক্তিকেন্দ্রটি কোথায়? বলাই বাহুল্য, অন্য কোন শিক্ষা নয়, অন্য কোন রহস্য নয়, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)এর প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য এবং আখেরাতের ভয়ই এই অভাবিত সাফল্যের একমাত্র শক্তিকেন্দ্র। অতএব স্বদেশ বিদেশ সকলের কথাই বলছি, মুসলমান যদি তার শিক্ষাব্যবস্থাকে কার্যকর করতে চায়, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)এর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখেই তা করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট করতে হবে আল কোরআন ও আল হাদীসের মর্মবাণী ও প্রেরণা। ইবলিস ও তার বিদ্যাবিনোদ-সহচরদের বাধা ও কুপ্ররোচনামুক্ত হয়ে এটা করতেই হবে। অন্যথায়, সেঞ্চুরি-সেলিব্রেটকারী অনেক যশস্বী ধর্ষক তৈরী হবে, দেশপ্রেমের আড়ালে বৃটেন-আমেরিকায় বিলাসবহুল বাড়ী-ক্রয়ের মত অনেক নেতা ও মন্ত্রী-মিনিস্টার তৈরী হবে, লীভ-টুগেদার ও নারী স্বাধীনতার অকৃত্রিম প্রবক্তা অনেক কবি তৈরী হবে, তৈরী হবে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত পাঁচ তারকা হোটেলে বসবাসকারী অনেক সারমেয়, অনেক নিশিকুটুম্ব, মানবরূপী অনেক গন্ধমূষিক, কিন্তু ভুলক্রমেও একটি মানুষ তৈরী হবে না।

দারুস সালাম : শিক্ষা সংখ্যা-২০০০

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম : একটি দু:খ-সুখের উপাখ্যান

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রপ্রভাবিত বাংলা কবিতায় তিনি একটি নতুন সম্ভাবনাময় পথের সন্ধান দিয়েছেন, এটা একটা বড় অবদান। প্রকৃতি ও প্রেম নিয়ে আবর্তিত বাংলা কবিতার বিষয়বস্তু ও প্রাণসত্তায় নজরুল ইসলামই প্রথম সুস্পষ্টরূপে যুক্ত করলেন সর্বমানবিক দুঃখ ও হাহাকারের এক বেদনাদীর্ণ সাহস ও রাগ-অনুরাগের চিত্র। নজরুলের এটাও একটা বড় অবদান, যা বাংলা কবিতাকে তার অনেকদিনের অভ্যস্ত বলয় থেকে বাইরের এক বড় ময়দানে এসে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। কাব্যসমালোচক বিদগ্ধজনেরা ভালো বলতে পারবেন, এইরকম আরো অনেকভাবে অনেক দিক থেকে বাংলা কবিতা নজরুল ইসলামের সরাসরি অবদানে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ। অতএব তাঁর কাছে বাংলা-কবিতাপ্রেমী পাঠকদের ঋণ-যে অনেক, এ-বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই। ধারণা করি এবং বিশ্বাসও করি, উপযুক্তভাবে অনুদিত হলে নজরুলের কবিতা বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই বিপুল সমাদর লাভ করতে পারে। এই কথাটা খুব জরুরি, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, এদিকে আমাদের মনোযোগ অত্যন্ত শিথিল। অবশ্য 'সূক্ষ্ম রসবোধসম্পন্ন' কোনো কোনো পাঠক ও সমালোচক নজরুল কাব্যে শিল্প-সুষমা ও নান্দনিকতার বেশ ঘাটতি দেখতে পান। দেখতেই পারেন; কারণ পাঠকের বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা ও রুচিভেদে কাব্যবিচারের মানদণ্ডে অনেক প্রভেদ ও বিক্ষেপ সৃষ্টি হয়। অতএব এই কবি ও তাঁর কবিতা নিয়ে বহু মানুষের যেমন সীমাহীন অনুরাগ আছে, কারো কারো অনেক অনুযোগও আছে। এটা ভালো। কারণ, এতে প্রমাণিত হয়, নজরুলের কবিতা সততই সপ্রাণ, এবং সততই পাঠকচিত্তে ক্রিয়া-বিক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম।

যাই হোক, কবি হিসাবে নজরুল ইসলাম আমার কাছে এখন অসম্ভব প্রিয়। আগে এই ভালোবাসা এতটা প্রবল ছিল না। হতে পারে, আমার অনেক প্রিয় কবির উপর থেকে মনোযোগ প্রত্যাহার করার ফলেই বর্তমান সময়ে নজরুলের প্রতি আমার আকর্ষণ ও দুর্বলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি এখন ইসলামের সুস্পষ্ট হেদায়েতকে সামনে রেখে জীবনকে দেখতে চাই, কবিতাকেও। কেউ কেউ বলতে পারেন, এটা মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। তা বলুক; আমি এখন এই বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত যে, কোরআন ও সুন্নাহ'র সুনির্ধারিত পথনির্দেশকে অস্বীকার করা সমূহ ক্ষতিকর। অতএব কবিতা-বিচারের যে-মাপকাঠি আমি বহুকাল ধরে মান্য ও অনুসরণ করেছি, এখন আমার কাছে তা খুবই লঘু ও নিরর্থক ও খুবই গর্হিত বলে মনে হয়।

আমাদের জীবন যেমন মহত্তর কোনো লক্ষ্যের অভিসারী না-হয়ে শুধু সংকীর্ণ স্বার্থ ও পার্থিবতাকে যদি আঁকড়ে থাকে, তাহলে সেটা আদর্শ জীবন নয়। এই ধরনের

www.pathagar.com

জীবনের সঙ্গে চতুষ্পদ প্রাণীর যাপিত-জীবনের মধ্যে আসলে বড় কোনো প্রভেদ নেই। কবিতাও এই রকমই। প্রসাদগুণ যতই উচ্চাঙ্গের হোক, কবিতা যদি আমাদের পার্থিবতার উর্ধে উঠতে না-পারে, শাশ্বত কোনো বিশ্বাস ও কল্যাণ ও পরম কোনো সত্যের দিকে আহ্বান না-জানায়, তাহলে ওই কবিতার বেশি-একটা মূল্য দেয়া ঠিক নয়, উচিতও নয়। পৃথিবীর সৌখিন কাব্যরসিকেরা যত উচ্চ মূল্যই দান করুন, কবিতার নামে এই ধরনের নিরর্থক শব্দ-সাধনাকে ইবলিস-প্রভাবিত একটি অতিশয় নিকৃষ্ট কাজ বলে ইসলাম ঘোষণা করে।

অতএব কবি হলেই কবি নয়; কবির কাছে আমাদের প্রত্যাশা, তিনি হবেন প্রকৃত সত্য ও কল্যাণ ও সুন্দরের নকীব। আর সত্য কী-জিনিষ, সর্বমানবিক কল্যাণ ও সৌন্দর্য কোথায় নিহিত, তার একমাত্র নির্ভুল জবাব যেহেতু ইসলাম, ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো কবিতা আসলে শয়তানেরই কণ্ঠস্বর। এইজন্যই আল্লাহপাক এই সাবধানবাণী ঘোষণা করেন, 'ওয়া শুয়ারাউ ইয়াত্তাবিউহুমুল গাবুন' কেবল পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই কবিদেরকে অনুসরণ করে (সূরা শুয়ারা)। এবং একই সুরায় আল্লাহপাক এইকথাও বলেছেন, 'হাল উনাব্বিউকুম আলা মান তানায্যালুশ শায়াতীন, তানায্যালু আলা কুল্লি আফ্ফাকীন আছীম, ইয়ুল কুনাস্ সামাআ ওয়া আকছারুহুম কাজীবুন'- আমি কি বলবো, শয়তান কাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে? শয়তান আসে অসৎ ও মিথ্যাবাদীর কাছে। এসে আজগুবি মিথ্যা পৌঁছে দেয়; এবং তারা (কবিরা) অধিকাংশই ডাহা মিথ্যাবাদী (সূরা শুয়ারা)। এবং এইজন্যই, 'ওয়া আন্নাহুম ইয়াকুলুনা মালা ইয়াফআলুন' তাদের কথার সাথে কাজের কোনো সংগতি নেই (সূরা শুয়ারা)। অতএব কবি ও কবিতার কথা শুনলেই আমরা-যে উৎফুল্ল হয়ে উঠি, তা অহেতুক; বরং যেহেতু এখানে শয়তানের সরাসরি ও সহজ অনুপ্রবেশ ঘটে, অপেক্ষাকৃত একটু বেশিই সাবধান হওয়া ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অন্তত মুমেনদের কাছে এটাই ইসলামের দাবি।

নজরুল ইসলাম-যে আমার প্রিয় কবিদের অন্যতম তার কারণ, তাঁর অন্য বহু কবিতা ও গান যা-ই হোক বা যেমনই হোক, এমন কিছু কবিতা ও গান আছে, যা ইসলামের মূল বার্তার অত্যন্ত অনুগত। এইসব গানে ও কবিতায় এমন একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত, যা তওহিদ ও রেসালাত ও আখেরাতের প্রতি একটি নিখাদ বিশ্বাসের অভিব্যক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান কোথা সে-মুসলমান' অথবা 'বক্ষে আমার কাবার ছবি চক্ষে মোহাম্মদ রাসুল। শিরোপরি মোর খোদার আরশ গাই তারি গান পথ বেভুল'। বাংলাভাষায় তওহিদের এমন বুলন্দ আওয়াজ নজরুলের আগে কখনো শোনা যায় নি, পরেও যায়নি। অদ্যাবধি এক্ষেত্রে তিনি একক ও অনন্য। 'দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন-ই-ইসলামী লাল মশাল' অথবা 'বাজিছে দামামা বাঁধ-রে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান' অথবা 'খয়বরজয়ী আলী হায়দার জাগো জাগো আরবার, দাও দুশমন

www.pathagar.com

দুর্গবিদারী দুধারী জুলফিকার'-এই সকল উচ্চারণ যে কী-বিদ্যুৎবাহী ও মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য কী-পরিমানে চৈতন্য-সঞ্চারক, তা কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এটুকু বলাই যথেষ্ট, মুসলমানের যে-ধনাঢ্য উত্তরাধিকার, যে-ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সেদিকে এমন অসামান্য মনোযোগ, ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রতি অকুণ্ঠ তামান্না নিয়ে এমন অকুণ্ঠ আহ্বান, বাংলা গানে ও কবিতায় নজরুলের আগে ও পরে আর কখনো শ্রুত হয় নি। আর রাসূল (সাঃ)এর প্রতি দুর্বার আকর্ষণ ও মুহাব্বত নিয়ে যে-সকল গান ও কবিতা নজরুল রচনা করেছেন, তার মধ্যে শিল্পগুণ যা-দরকার তা-তো আছেই, বলিষ্ঠ ঈমানী-চেতনার অন্ধকার-জয়ী নূরও আছে। এবং এইসব গানের মহিমা এমন অপরাজেয়, যা বহুকাল বাঙ্গালী মুসলমানের মনপ্রাণকে জান্নাতী-সৌরভে ভরপুর করে রাখবে। 'মোহাম্মদ নাম যতই জপি ততই মধুর লাগে। নামে এত মধু থাকে কে জানিত আগে' অথবা 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায় আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়' অথবা 'মোহাম্মদ নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে, তাই কি-রে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে।' একটি-দুটি নয়। এ-রকম অনেক গান আছে, অনেক কবিতা আছে, যেখানে মুসলমান নিজেকে চিনতে পারে, নজরুলকেও চিনতে পারে ইসলামী পুনর্জাগরনের একজন নকীব হিসাবে।

যাই হোক, নজরুল ইসলামের সব ইসলামী গান ও কবিতা থেকে এটা সম্যক অনুধাবন করা যায় যে, তিনি ছিলেন যুগপৎ সুফীদের মরমী-প্রেরণা ও মুজাহিদের জিহাদী-চেতনার এক সমন্বিত কবিকণ্ঠ। হতবাক হয়ে ভাবি, নজরুল না-আসলে বাংলাভাষী মুসলিম-উম্মাহ এই ধরনের গান ও কবিতার শাশ্বত সওগাত থেকে চিরকাল মাহরুমই থেকে যেতো। 'চিরকাল' বলছি এইজন্য যে, নজরুল নির্বাক হয়ে যাবার পর এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও বহুদিন অতিবাহিত হলো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এমন গান ও কবিতা আমরা পেলাম না, যা নজরুল ইসলামের ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারে। কবিতায় ফররুখ আহমদ অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছেন, কিন্তু গানের ক্ষেত্রটি একেবারে পুরোপুরিই উষর ও অনুর্বর। কিছু কিছু ইসলামী সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে ও এখনো হচ্ছে সত্য, কিন্তু সেই সব সৃষ্টি কথা সুর ও অন্তঃপ্রেরণায় এত দুর্বল ও তরল ও প্রতিভাহীন, যা প্রায়শ পাঠক-শ্রোতার কাছে বিশেষ কষ্টেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদিক থেকে নজরুল আমাদের জন্য আল্লাহপাকের একটি খাস নেয়ামত। তুলনা করবো না, নানা কারণে তুলনা করা সংগতও হবে না; শুধু বুঝবার সুবিধার্থে উল্লেখ করছি, উর্দূভাষী মুসলমানের কাছে ইকবাল যে-কারণে বিকল্পহীন, ইসলামপ্রিয় বাঙ্গালী মুসলমানের কাছে নজরুল অনেকটা ইকবালের মতোই যুগপৎ একজন বন্ধু ও শিক্ষক ও দ্বীনের একজন সাহসী নকীব। এমন নকীব, যাঁর কণ্ঠস্বর অনেক দূষিত কুৎসিত হৈচৈ-য়ের মধ্যেও বহুকাল অক্ষত ও অবিকৃত থাকবে।

www.pathagar.com

অবশ্য নজরুলের যে-ঈমানী অভিজ্ঞান, যে-তওহিদী অভিব্যক্তি, শ্রেণীবিশেষের কাছে তা খুবই কষ্টদায়ক। বিশেষ করে মুশরিকদের দ্বারা প্রভাবিত পৌত্তলিকতা-প্রিয় মুরতাদ-মুনাফিকদের বিবেচনায় নজরুল একজন অত্যন্ত 'মৌলবাদী' ও 'সাম্প্রদায়িক' ধরনের কবি। এবং এই নিরিখে নজরুলকে যারা বড় বলে মানে, তারা আরো বড় মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক। প্রকৃতপক্ষে অনেক বেঈমান ধরনের উদভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী এমন আছে, যারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও উদার-অসাম্প্রদায়িকতার কলরব তুলে নজরুল ইসলামকে পরিহার করা আবশ্যক জ্ঞান করে। এবং নজরুলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কারো কারো বিচারে এতটাই 'অভ্রান্ত' যে, নজরুল-রচিত অসংখ্য কালজয়ী শ্যামাসঙ্গীতের উদাহরণ সত্ত্বেও, তাদের ক্রোধ ও উষ্মা কিছুমাত্র প্রশমিত হয় না। তাদের একই কথা, তিনি কেন লিখলেন, 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই, যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই'; কেন লিখলেন, 'কোথা-সে আযাদ কোথা-সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান, আল্লাহ ছাড়া করে না কারেও ভয় কোথা সেই প্রাণ'। এ-সব কথা-তো রীতিমত সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের পরিপন্থী। এ-সব-তো একেবারে শহীদ হাসানুল বান্না ও শহীদ সৈয়দ কুতুবের আপোষহীন আওয়াজের প্রতিধ্বনি। এর চেয়ে হামাস ও হিজবুল্লাহর বিপ্লবী তারানাও অনেক বেশি সহনীয়। সত্যই ভয়াবহ অপরাধই বটে। কারণ 'গুরুদেব'-এর লেখা থেকে জানা 'উচিত', কবিতা কি গান পাখি ও চন্দ্রিমার মত এক ধরনের নিরপরাধ উপকরণ; তার সঙ্গে সুলতান মাহমুদের টগবগে অশ্বের বেপরোয়া ক্ষুরধ্বনি মিশিয়ে ফেলা ঠিক হয়নি। বাঙ্গালী মুসলমান বড়-জোর টিনের তলোয়ার নিয়ে সার্কাস বা যাত্রাদলে নামতে পারে, তার কাছে প্রকৃত তরবারির স্বপ্ন তুলে ধরা ও তার মধ্যে শাহাদাতের তামান্না জাগিয়ে তোলা 'খুবই গর্হিত একটি অপরাধ'।

নজরুলের আরো একটি 'অপরাধ' আছে। তিনি রবীন্দ্র-প্রতিদ্বন্দ্বী; অন্তত নজরুল-বিদ্বেষীরা এরকমই ধারণা করেন। নিঃসন্দেহে এটাও 'অপরাধ'। বাংলাদেশে ও বাংলাভাষায় কবি হয়ে উঠতে বাধা নেই, কিন্তু কারো জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রপ্রভাবকে স্বল্পমাত্রায়ও নিষ্প্রভ করতে পারে, এটা অসহ্য। এটা কিছুতেই প্রশ্রয়যোগ্য নয়। অতএব গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে নানা কৌশলে নজরুল-চর্চায় প্রতিরোধ-রচনা কেউ কেউ তাদের জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্ম বলে বিবেচনা করেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র দেবতাজ্ঞানে যারা পূজা করে, তাদের আশঙ্কা একেবারে অমূলকও নয়; কারণ নজরুলের কবিতা ও গানের চর্চা যথোচিত মাত্রায় পৃষ্ঠপোষকতা পেলে ও প্রসার ঘটলে রবীন্দ্রভক্তি অনেকাংশে হ্রাস পাওয়া একেবারে অবধারিত। কারণ, অন্তত নজরুলের সুরের ঐশ্বর্য এ-রকম গভীর ও দিগন্তবিস্তারী, যা রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরের প্রভাবকে কিছু পরিমাণে হলেও নিষ্ক্রিয় করে দিতে সক্ষম। আমার এই বক্তব্য-যে

www.pathagar.com

একেবারেই উপেক্ষার যোগ্য অত্যুক্তি নয়, সে-কথা প্রমাণার্থে দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করি।

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় স্বমুখে একদা আমাকে বলেছিলেন, গ্রামোফোন কোম্পানী শ্রোতার কাছে অপ্রিয় করে তুলবার একটি কুৎসিত দুরভিসন্ধি নিয়ে তাঁকে নজরুলগীতি রেকর্ড করতে বাধ্য করে। কিন্তু কী অভাবনীয় ব্যাপার, ফল হলো সম্পূর্ণ বিপরীত! 'নয়ন ভরা জল' এবং 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব' গান দু'টি এমন আশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করলো, যা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রায়শ বলতেন, 'নজরুলের গানকে পুনর্জীবন দান করেছি বলে লোকে আমাকে প্রশংসা করে; আসলে নজরুলই আমাকে বাঁচিয়েছে। নজরুলের গান না-থাকলে আমার জন্য গাওয়ার উপযোগী কোন গানই ছিল না।' অন্ধ অনুরাগের কথা নয়, বস্তুতই নজরুলের গান যে-কত ঐশ্বর্যময়, সঠিক প্রচার পেলে এই গান-যে কী-সর্বপ্লাবী বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে, মানবেন্দ্র-সতীনাথের অকপট বর্ণনা থেকে তা কিছুটা অনুধাবন করা যায়। অপর একটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। এতদ্দেশীয় আমাদের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সুবীর নন্দীর একটি সাক্ষাৎকার একদা টিভি-তে প্রচারিত হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন সুজিৎ মোস্তফা। সুবীর বললেন, নজরুলের গান এত বেশি ক্লাসিক ঐশ্বর্যে ভরপুর ও ঋদ্ধ যে, একটি গান নিয়েই একজন শিল্পী বহু-সময় ধরে বহুভাবে তার কণ্ঠ ও হৃদয়কে নানা বর্ণে গন্ধে মেলে ধরতে পারে। সুবীর গেয়েও দেখালেন যে, নজরুল সঙ্গীত সত্যই কত ঐশ্বর্যময়। কিন্তু সুবীর নিজে কেন তাঁর শিল্পীসত্তার বিকাশ ও প্রসারণের ক্ষেত্রে নজরুল সঙ্গীতকে একান্তভাবে গ্রহণ করলেন না? সুবীর জবাবে বললেন, 'তীব্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এটা সম্ভব নয়; কারণ নজরুল সঙ্গীতের প্রতি খাঁটি প্রেম ও পৃষ্ঠপোষকতা এত কম যে, কোন শিল্পীর পক্ষে এই সঙ্গীতকে আশ্রয় করে টিকে থাকা অসম্ভব'। এবং সুবীর বিষন্ন কণ্ঠে এই কথাও বললেন যে, এই অনুচিত অনীহা ও বৈরিতার প্রকৃত হেতু কী, তিনি তা জানেন না। সুবীর জানেন না কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি, পূর্বে-উল্লিখিত দু'টি কারণই এই অনুচিত-অসূয়ার প্রকৃত হেতু। প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যাদের করতলগত, তারা অধিকাংশই এটা চায় না যে, নজরুলের তওহিদী বিশ্বাস ও জিহাদী-তামান্নার যে-অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি, তা লোকসমক্ষে বার বার ফিরে ফিরে আসুক। তারা চায় না, এই মানুষটি বার বার উদিত হোক আমাদের মানসপটে। দ্বিতীয়ত, তারা এটাও চায় না যে, নজরুলের কারণে রবীন্দ্রপ্রভাব এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হোক। অতএব জাতীয় কবির শিরোভূষণে শোভিত নজরুল ইসলাম আজ এক নিপুণ ও অব্যাহত সাংস্কৃতিক-চক্রান্তের শিকার। আশঙ্কা হয়, এই মতলবী সংস্কৃতিজীবীদের প্রতাপ যদি অক্ষুন্ন থাকে, তাহলে শুধু নজরুল নয়, তাদের দাপটে পুরো মুসলিম সংস্কৃতিই ব্রাহ্মণ্যবাদী শিরকের কুৎসিত অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পারে। না-বললেও চলে কিন্তু বলাই ভালো। সাতচল্লিশ সালে

www.pathagar.com

দেশ বিভক্ত হয়েছিল, সেই বিভক্তি এখনো বিরাজমান। তারপর একাত্তরে ভারতবর্ষের 'অতীব পরোপকারী' সৈন্যদলের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন। এই দু'টি গুরুতর 'ভুলের' যারা আজ প্রতিবিধানকামী, নজরুল তাদের কাছে বোধগম্য কারণেই একটি দুঃখজনক উপদংশ।

নজরুলকে নিয়ে কিছু দুঃখ ও মনস্তাপ এবং অভিযোগ আমাদেরও আছে। আমাদের মানে, আমরা যারা ইসলামকেই একমাত্র সত্য বলে জানি, আমরা যারা আখেরাতকে বিস্মৃত হয়ে শুধু জাগতিক সাফল্যকেই অগ্রাধিকার দিতে ভয় পাই। নজরুলের অত্যুচ্চ কাব্যশক্তি ও প্রতিভা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু এই শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে অন্য অনেকে যাই বলুক, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এটা একান্তভাবেই আল্লাহপাকের দান ও অনুগ্রহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর উন্মাতাল সময়ে বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য নজরুল ইসলামের মত একজন অকুতোভয় অমিতপ্রতিভাবান কবির বড় প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজন নজরুল ইসলাম অনেকখানি পূরণও করেছেন। কিন্তু বিশেষ দুঃখের সঙ্গে ব্যক্ত করতে হয়, তওহিদী-জনতার মুখপাত্র হিসেবে ঈমান ও আকীদার প্রশ্নে তাঁর যে-কঠিন ও সুদৃঢ় ভূমিকা রক্ষার কথা ছিল, বৈরী মুশরেকী শক্তির মোকাবিলায় তাঁর যে-নির্ধারিত দায়িত্ব ছিল, তিনি তা অনেকটাই অবহেলা করেছেন। এবং স্বীকার না-করে উপায় নেই, দুঃখজনকভাবে নিদারুণ চিত্তবিক্ষেপের শিকার হয়েছেন নজরুল। সত্য যে, তিনি লিখেছেন 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' কিন্তু এই কথাও সত্য যে, তিনিই আবার সম-পরিমাণ কি সমধিক অনুরাগ নিয়ে লিখেছেন, 'আমার কালো মায়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন'। একটি দু'টি নয়, এই রকম আরো অসংখ্য গান। বিশিষ্ট নজরুল-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলামের কাছে শুনেছি, ইসলামী সঙ্গীতের তুলনায় নজরুলের শ্যামা-কীর্তন ইত্যাদি ধরনের হিন্দুয়ানী গানের সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক। শুধু সংখ্যাগত গরিষ্ঠতা নয়, আমরা কষ্ট পাই তাঁর ঈমান ও আকীদার বিপর্যয়ের কারণে । বলাই বাহুল্য, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সম্পূর্ণ বিপরীত ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে পুরোপুরি শিরকে আচ্ছন্ন হয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার এমন গর্হিত অপব্যবহার মুসলিম মিল্লাতের জন্য একটি স্থায়ী কষ্টের কারণ।

অবশ্য দুরন্ত দুর্বার যৌবনাবেগ এবং সেই সঙ্গে সমসাময়িক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দাবী ও আকর্ষণের প্রেক্ষিতে নজরুলের অসহায়ত্ব আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়; কারণ এটা ভুলে যাওয়া একটা বড় ধরনের পাপ যে, মুসলিম উম্মাহর তরক্কির প্রশ্নে যখন কোন ভার কারো উপর অর্পিত হয়, তা-থেকে পশ্চাদপসরণ ও পার্শ্বপরিবর্তনের কোন পথ আর খোলা থাকে না। সর্বক্ষণ স্মরণে রাখা জরুরি, এটা শৌখিন কবিত্ব নয়, এটা একটা সার্বক্ষণিক গুরুদায়িত্ব। এই কথা ভুলে গেলে সাবা কি উবাই-ধরনের মুনাফিক মুসলমানেরা খুব খুশি হয়, কিন্তু আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

আল্লাহপাক কারো উপর সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করেন না। কিন্তু যাকে প্রতিভাবান করে আল্লাহ প্রেরণ করেন, তাকে অবশ্যই সকল ভার, সকল দায়িত্ব পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করে যেতে হয়। এক্ষেত্রে অনু-পরিমাণ শৈথিল্য প্রদর্শনেরও কোন সুযোগ নেই। আর শুধু গানই লেখেন-নি, সবচেয়ে কষ্টের কথা, নজরুল তাঁর বিশ্বাসও বিপন্ন করে তুলেছিলেন। ইবলিস তাঁকে এতদূর বিভ্রান্ত করেছিল যে, তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি মুসলমান; না-হলে যোগসাধনা কালী সাধনায় আত্মনিয়োগ করা কি কোন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব! এই আত্মঘাতী দুর্বুদ্ধি যেখান থেকেই আসুক, কবি হোক বৈজ্ঞানিক হোক, রাষ্ট্রনায়ক হোক, এই ধরনের ঈমানী-বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষা করা সবার জন্যই সর্বাধিক জরুরি, একেবারে ফরজে-আইন। এবং এই জরুরি বিষয়টি কেউ যাতে ভুলক্রমেও বিস্মৃত না-হয়, আল্লাহপাক সাবধান করে দিয়েছেন, 'ইজাল লা আজাকনাকা দীফাল হাইয়াতি ওয়া দীফাল মামাতি ছুম্মা লাতাজীদু লাকা আলাইনা নাছীরা' অর্থাৎ, যদি এরূপ হতো (কাফের-মুশরিকদের সাথে সখ্যস্থাপন) তাহলে আমি তোমাকে জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় দ্বিগুণ শাস্তির ব্যবস্থা করতাম; তারপর আমার মোকাবিলায় তোমার কোন সাহায্যকারী মিলতো না (সূরা বনি ইসরাইল)। কী কঠোর সতর্কবাণী, মুসলমানের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি! বলতে কষ্ট হয়, কালীভক্ত হয়ে শিরকের সাথে সখ্যস্থাপন করে নজরুল ইসলাম আপন জীবনে এই শাস্তিকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

নজরুল ইসলামের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক। সন্দেহ নেই, তিনি সে-প্রত্যাশা বহুলাংশে পূরণও করেছেন। আমরা তাঁর কাছে আকণ্ঠ ঋণী, এবং আমরা তাঁকে সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসি। বার বার উল্লেখ করি, তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই; কারণ তিনি যদিও আরো অনেক দিতে পারতেন, কিন্তু যা-পেয়েছি তা অনেক, তার মূল্যও অনেক। মহান আল্লাহপাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে এক অমর লেখনী হাতে দিয়ে নজরুলকে আমাদের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে পেয়ে অনেক পেয়েছি। কিন্তু আল্লাহপাক যিনি 'আহকামুল হাকিমীন', তিনি কী বলেন? আল্লাহপাক তাঁর প্রিয়তম রাসূল (সাঃ)কে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেন, 'ওয়া লাউ তাকাব্বালা আলাইনা বাদাল আকাবীল। লা আখাজনা মিনহু বিল ইয়ামীন। ছুম্মা লাকাতানা মিনহুল ওয়াতীন'। অর্থাৎ, আমাদের উপর কোনো কথা বানিয়ে বলতো, আমি তার দক্ষিণ হস্ত পাকড়াও করতাম, তারপর তার গ্রীবাস্থিত ধমনী কর্তন করে দিতাম (সূরা আল হাক্কাহ)। এই যদি রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, আমরা নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারি, আল্লাহ'র নির্ধারিত বিধানকে সজ্ঞানে অবজ্ঞা করার শাস্তি কত ভয়াবহ!

নজরুল তাঁর জীবনের প্রায় অর্ধাংশ, দীর্ঘ তেত্রিশ বছর আমৃত্যু একাদিক্রমে জীবন্মৃত অবস্থায় নির্বাক ছিলেন। চোখ দু'টি ছিল ভাষাময় এবং অধরও নীরবে নীরবে বাঙ্ময় হয়ে উঠতো। অনেকে বলেন, চেতনা ও বোধ কখনোই পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যায়-নি,

www.pathagar.com

শুধু তাঁর বাকশক্তিটাই চিরকালের মতো রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই দুর্বহ নিয়তির কী ব্যাখ্যা? কেউ কেউ গ্রীক-ট্র্যাজেডির অনুসরণে বলতে পারেন, এটা এক অপ্রতিরোধ্য destiny। আবার কেউ হয়ত শেক্সপীয়রের নাটক সামনে রেখে বলবেন, এই ট্র্যাজেডি গোপন আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত নজরুলের স্বসৃষ্ট কিন্তু অনতিক্রম্য। কিন্তু এ-সব কোনো ব্যাখ্যাই সঠিক নয়। আমরা যা মনে করি এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করি তা'হলো, আল্লাহপাক তাঁকে থামিয়ে দিয়েছেন। আসলে নজরুল ইসলাম, যে-কোনো কারণেই হোক, একটি গুরুতর ভুল ও গর্হিত জীবনদর্শনে বিশ্বাস রাখতে শুরু করেছিলেন। সমসাময়িক অনেকে তাঁকে কঠোরভাবে শাসন করতে চেয়েছেন, কিন্তু 'বেপরোয়া দিলখোলা' এই বয়স্ক-শিশুটি সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন-নি।

ইসলাম দর্শন পত্রিকায় মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ লিখেছিলেন, 'এমন অনেক পাষণ্ডই পৃথিবীতে জন্মিয়াছে এবং শেষটা নিকৃষ্ট জীবের মতই মরিয়া স্বীয় পাপলীলার অবসান করিয়াছে। .... এইরূপ ধর্মদ্রোহী কু-বিশ্বাসীকে মুসলমান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না'। নাজির আহমদ চৌধুরী 'মাসিক মোহাম্মদী'তে লিখেছিলেন, 'রক্তাম্বরধারিণী অসুরনাশিনী খলখলহাসিনী শঙ্করী মা'র শতমুখে জয়-জয়াকার করিতে বা তারিণী দশ-প্রহরণধারিণী দুর্গা দুর্গতিনাশিনীর আগমনী গান গাহিতে তোমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। এ কেমন বিদ্রোহ তোমার? বস্তুত তিনি এছলামের তাওহীদকে দুনিয়ার পিঠ হইতে মুছিয়া ফেলিয়া হিন্দুবঙ্গের নিম্নশ্রেণীর পৌত্তলিক ভাবকে সেই স্থানে বসাইয়া দিতে চান। .... সুতরাং বর্তমান যুগে তিনি যে ইসলামের সর্বপ্রধান শত্রু তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই'। 'মোসলেম দর্পণ' পত্রিকায় 'ইসলাম বৈরী মুসলমান কবি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লেখা হয়, 'কবির ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইসলামের এইরূপ অবমাননা করিলে খোদার গজব সত্বরই নাজিল হইবে।' এস ওয়াজেদ আলী বার-এট-ল লিখেছিলেন, 'এই সেদিনের 'নবশক্তি'-তে দেখলুম কাজী সাহেব দুর্গতিনাশিনী, দশপ্রহরণধারিণী, দশভূজা মা'র এক বন্দনা গেয়েছেন। সে বন্দনায় নব-ভারতের নব-পূজারীদল কাজী সাহেবের মুখ দিয়ে বলেছেন, 'চাই না মা তোর শুভেদ আশীষ। চাই শুধু ঐ চরণতল'। ... তারপর কবির রক্তাম্বরধারিণী মা'র বন্দনার কথাও পাঠক শুনেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কবির এই অপূর্ব কালচার সমন্বয়ের আদর্শ বাঞ্ছনীয় কিনা আর সম্ভবপর কিনা।'

এ-রকম অনেকেই অনেক কথা তখন লিখেছিলেন, বলেছিলেন। কিন্তু কবি কর্ণপাত করেন নি। অবশ্য কর্ণপাত করার কথাও নয়। কারণ ইসলামের মোকাবেলায় 'সর্বমানবতাবাদ', 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'সর্ব-ধর্মসমন্বয়বাদিতা' এসব সুভাষিত চতুর ঈমান-সংহারী আহ্বান ও হাতছানি এখন যেমন আছে, তখনো ছিল। অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে ও অসতর্কতাবশত নজরুল বুঝতেই পারেন-নি, অশুভ শক্তির মায়াবি আকর্ষণে তিনি কোথায় কোন্‌দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছেন। এবং সত্বরই তিনি এমন

www.pathagar.com

এক বিপজ্জনক অবস্থানে পৌঁছলেন, যেখান থেকে বলতে শুরু করলেন, 'I am the greatest yogi in India', 'শ্রী অরবিন্দ সূক্ষ্মদেহে এসে আমার কাছে আধঘন্টা বসেছিলেন' 'আমি আল্লাহকে দেখেছি' ইত্যাদি ধরনের সম্পূর্ণ কুফ্‌রি ও মুশরিকী কথাবার্তা। অনেকে তখনই ধারণা করেছিলেন, ভেতরে কোথাও প্রচণ্ড গোলমাল শুরু হয়ে গেছে।

নজরুল ইসলামের যে-রোগ, অনেকে তার অনেক রকম কারণের কথা বলেছেন। লুম্বিনী মানসিক হাসপাতালের চিকিৎসকেরা এমনকি সিফিলিস বলেও নিশ্চিত ধারণা দিয়েছেন। কিন্তু আমরা বলি, আল্লাহপাক তাঁকে থামিয়ে দিলেন। অবশ্য এই কথায় অনেকে গুরুতর মনঃক্ষুন্ন হবেন। তা হোন, কিছু করার নেই। কিন্তু একটি কথা সত্য যে, তাঁরা ব্যথিত হবেন নজরুলের প্রতি অনুরাগবশত নয়, ইসলামের প্রতি বিরাগবশত। উল্লেখযোগ্য, এই ধরনের মৌসুমি ও মতলবী অনুরাগীদের দ্বারাই নজরুল সর্বদা পরিবৃত ছিলেন, যাঁরা তাঁর নিরাময়ের আর কোনরূপ সম্ভাবনা নেই, এ-বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সুনিশ্চিত না-হয়ে একবার নজরুলকে দেখতেও যান-নি। শুধু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও সৈয়দ বদরুদ্দোজা ছিলেন ব্যতিক্রম। সুফী জুলফিকার হায়দার-এর 'হায় তমসায়' লেখাটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, কী করুণ, কী অকথ্য অবমাননাকর সেই দিনগুলো, যখন আস্তে আস্তে এক গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে নজরুল হারিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর সচেতন জগৎ এক গভীর অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

কেউ মনে না-করেন, বর্তমান নিবন্ধকারও এক শ্রেণীর নজরুল-বিদ্বেষী। না, এমন ভাবলে আমার প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হবে। আগেও বলেছি, আবারও বলি, বাংলাভাষায় এমন কোনো কবি নেই, যাকে আমি নজরুলের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। এবং এ-কথা সত্য বলেই, নজরুলের তেত্রিশ বছরের অবরুদ্ধ কণ্ঠ, তাঁর অব্যক্ত দুর্বহ যন্ত্রণা আমাকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে। আমাদের কাছে তাঁর কোনো অপরাধ নেই, আমরাই বরং অপরাধী; কারণ তাঁর সুস্থাবস্থায় আমাদের যা-দেবার ছিল, তা খুব অল্পই দিয়েছি। নজরুলের যা-কিছু অপরাধ তা একমাত্র আল্লাহ'র কাছে। লেটোর দলের এই বালকটিকে, রুটির দোকানে ফাই-ফরমাশ খাটা এই দুঃখী ভবিষ্যৎহীন কিশোরটিকে আল্লাহপাক কোথায় কোন্ অত্যুচ্চ শীর্ষদেশেই-না তুলে দিয়েছিলেন! অভাবনীয়, কল্পনারও অতীত! এমন মানুষ কি কখনো আল্লাহকে ভুলে যেতে পারে, থিকথিকে শির্‌কের মধ্যে ডুবে গিয়ে হতে পারে কালী ও যোগসাধক! অতএব দ্বিতীয়ার্ধের যে-দীর্ঘ নির্বাক দিনগুলো, সেই দৃষ্টান্তহীন মুসিবত নজরুলের জীবনে নেমে এসেছিল আল্লাহর অভিপ্রায়ক্রমেই। 'মা আছাবা মিম মুছিবাতীন ইল্লা বিইজনিল্লাহ্' আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন মুসিবত আসে না (সূরা তাগাবুন)। এ-কথা অস্বীকার করলে আল্লাহ ও তাঁর এরশাদকৃত কোরআনের বাণীকেই অস্বীকার করা হয়। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে এই ধরনের দুর্মতি থেকে হেফাযত করুন।

www.pathagar.com

আসলে নজরুল থেকে এটা আরেকবার প্রমাণিত হলো, আল্লাহ'র কাছে কারো জন্যই কোন আলাদা মানদণ্ড নেই; এবং 'ওয়াল্লাহু খাবীরুম বিমা তা'মালুন' কারো কোনো কাজই আল্লাহর অজ্ঞাত নয়, হিসেবের বাইরে নয়। আল্লাহপাকের নেয়ামত ও অনুগ্রহ আমাদের উপর সহস্র ধারায় নিয়ত বর্ষিত হচ্ছে, এ-ও যেমন সত্য, সীমা-লঙ্ঘনের দায়ে যে-কোনো মুহূর্তে গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারি, সে-ও একইরকম সত্য। তবু এটুকু বিশ্বাস করতে চাই, বাংলাভাষী মুসলিম-উম্মাহর জন্য নজরুলের যে-অক্ষয় অবদান, সেই একটি কারণে আল্লাহপাক তাঁকে মার্জনা করেছেন। এবং করেছেন বলেই সম্ভবত নজরুলকে দিয়ে পার্থিব জীবনেই সবটুকু প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিলেন। ধারণা হয়, আল্লাহপাক নজরুলকে ভালোবেসে কষ্ট দিয়েছেন এবং কষ্ট দিয়ে ভালোবেসেছেন। আশা করা যায়, নজরুলের আখেরাত বিনষ্ট হয় নি। এবং এই আশাও করা যায়, আল্লাহ'র প্রীতিভাজন বান্দাহদের দলভুক্ত হয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন আল্লাহপাকের ক্ষমা ও অনুগ্রহের নিবিড় আশ্রয়ে। অনেকে অনেকভাবে নজরুলকে স্মরণ করে, নিবেদন করে শ্রদ্ধার্ঘ। আমাদের সে-সবে বিশ্বাস নেই। আমরা শুধু এই দোয়া করি, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের এই বন্ধুকে আপনার অসীম করুণায় পারলৌকিক জিন্দিগীর কামিয়াবি দান করুন। তার হয়ত অনেক ত্রুটি, কিন্তু এই বাংলার জমীনে আপনার তওহিদের কথা তার মতো আর কেউ বুলন্দ-আওয়াজে উচ্চারণ করে নি। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি জানেন, যত কু-কথাই উচ্চারণ করুক, সেটা তার মনের কথা নয়; তার বক্ষের অভ্যন্তরে সদা জাগরুক ছিল তওহিদের আমানত। আপনি তাঁর রূহের মাগফেরাত দান করুন!

পাক্ষিক পালাবদল : জুলাই ১ম, ২য় ও আগষ্ট ১ম পক্ষ, ২০০০

www.pathagar.com

আমাদের ভাষাপ্রেম : এক রহস্যময় দুঃস্বপ্ন

সত্যকথা উচ্চারণ করা এমনিতেই অত্যন্ত কঠিন। তদুপরি আবেগ যেহেতু সর্বদায়ই দৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধিকে অল্পাধিক আচ্ছন্ন করে রাখে, আবেগে অনুরাগে ও সফেন উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ ফেব্রুয়ারিতে মোহগ্রস্ত অবস্থায় আমাদের ভাষাপ্রেম নিয়ে কিছু বলা, একটু বেশিই কঠিন। এজন্য ফেব্রুয়ারি-উত্তর এই সময়টিকে আমি বেছে নিয়েছি। আশা করা যায়, ইতোমধ্যে উচ্ছ্বাস অনেকটা স্তিমিত হয়েছে; এবং দেশব্যাপী ভরাকোটাল ভাষাপ্রেমের জোয়ার কিছুটা হলেও ভাটার টানে প্রশমিতও হয়েছে। আশা করি, এই স্তিমিত-প্রশমিত অবস্থায় নির্মোহ মন নিয়ে এখন বুঝি কিছু লেখা যায়।

খুবই সত্য যে, একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের আবেগ ও অনুরাগের সঙ্গে এমন গভীর ও সদর্থক তাৎপর্য নিয়ে জড়িত, যা অস্বীকার করা অসম্ভব। অসম্ভব এই কারণে যে, মাতৃভাষা যেহেতু আমাদের আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম, একুশে ফেব্রুয়ারির কাছে আমাদের অনিঃশেষ ঋণ নিয়ে কোনরূপ কোন বিতর্ক নেই, থাকা সংগতও নয়। এবং আমাদের এই ভাষাপ্রেম এত অকৃত্রিম, ঘন ও বৈপ্লবিক যে, ভাষাদিবসের অন্তর্গত শক্তি ও প্রেরণা নিয়েই আমরা অর্জন করেছি আমাদের হেমপ্রভ স্বাধীনতা। অতএব একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের অস্তিত্বের সমার্থক, আমাদের অপরাজেয় প্রেম ও সাহসের এক অক্ষয় উপাখ্যান। এবং এই বিষয়টি আমাদের স্নায়ু ও শোণিত ও হৃদযন্ত্রের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, বাংলাভাষা ও একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে কারো মধ্যেই কোন সংশয় কি অবিশ্বাস কি দ্বিতীয়-বিবেচনা নেই; এমনকি তথাকথিত 'কট্টর হরকতুল জিহাদের সদস্যদের' মধ্যেও নেই, সর্বভারতীয় হিন্দীর মহাসমুদ্রে হারিয়ে-যেতে অভিলাষী কোন কুশলি বুদ্ধিজীবীরও নেই।

সে যাই হোক, ভাষা কি ভাষা-দিবসের মহিমা বর্তমান আলোচনার উপজীব্য নয়; কারণ এই মাহাত্ম্য নিরঙ্কুশভাবেই সর্বজনস্বীকৃত ও মতভেদহীন। অতএব এই সর্বসম্মত গৌরব ও গরিমা নিয়ে বার বার উল্লসিত হওয়া অনাবশ্যক-তো বটেই, এক ধরনের কর্তব্যবিমুখ আলস্যলালিত মূঢ়তাও বটে। বরং কোথাও কোন সংকটের কারণ ঘটলে, সে-বিষয়ে দৃষ্টিপাত করাই সমীচীন ও বাঞ্ছনীয়। যতদূর বুঝি, প্রকৃত প্রেম এই রকমই দাবী করে। বর্তমান নিবন্ধকার যা-বলতে চান তাহলো, শ্বাসপ্রশ্বাস কি রক্তপ্রবাহের মত ভাষাপ্রেমও আমাদের একটি নীরব কিন্তু প্রাণদায়িনী সম্পদ। কোথাও কোন বিঘ্ন কি গোলযোগ দেখা না-দিলে যেমন ফুসফুস কি হৃৎপিণ্ড নিয়ে সরব হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, ভাষাপ্রেমও একই রকম। ভালোবাসায় বড় রকমের কোন ফাঁকি ও ফাঁক সৃষ্টি না-হলে, এ-নিয়ে মুখর হবার আবশ্যকতা নেই। সাধারণত সেই পুরুষই প্রকাশ্যে স্ত্রীর বৈধ-অবৈধ সকল আদেশ সাষ্টাঙ্গে ও বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করতে অক্লান্ত, যার অন্য

www.pathagar.com

কোথাও গোপন ভালোবাসা আছে। সাধারণত সন্তানের প্রতি মায়ের চেয়ে মাতৃস্বসাদের দরদই অধিক উথলে ওঠে। অতএব যখন দেখি, ভাষা ও ভাষার মহিমা নিয়ে আমরা স্বাভাবিকের তুলনায় একটু অধিক বাঙ্ময় ও দিগ্বিদিকশূন্য, বুঝতে পারি আমাদের দরদ জননীর হৃদয়ার্তি নয়, মাসীর কুম্ভিরাশ্রু মাত্র। বুঝতে পারি, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যপ্রীতির মধ্যে যথেষ্টই শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়েছে। আসলেই, কেউ স্বীকার করুক না-করুক, এটাই সত্য যে, মাতৃভাষার প্রশ্নে আমাদের বুকের ফাঁকি আমরা এখন মুখের কথকতা দিয়ে আড়াল করবার চেষ্টা করছি। এবং এটাও সত্য যে, কোন ফাঁকিই যেহেতু ফাঁকি দিয়ে নিরাময় করা যায় না, আমাদের প্রেম ও প্রণয়ের কপটতা এখন আর কোন প্রলেপেই অকৃত্রিম বলে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবু স্বার্থান্ধ কপট ভাষাপ্রেমীদের চেষ্টা ও চিৎকারের কোন বিরাম নেই। আর একুশে ফেব্রুয়ারি কি পঁচিশে বৈশাখ কি বাংলা নববর্ষ উপস্থিত হওয়া মাত্র আমরা হতবাক হয়ে লক্ষ করি, এই চিৎকারই শুধু গগনবিদারি হয়ে ওঠে না, ভাষা নিয়ে আমাদের সূক্ষ্ম কারচুপি ও শাঠ্য-ষড়যন্ত্রও আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে।

কাউকে অপ্রস্তুত করা বর্তমান নিবন্ধকারের উদ্দেশ্য নয়; শুধু সবিনয়ে একটি প্রশ্ন পেশ করতে চাই যে, আমাদের যাঁরা প্রথম শ্রেণীর ভাষাপ্রেমী, বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য যাঁরা প্রায় 'সর্বস্বত্যাগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ', যাঁদের ইহজীবনের একমাত্র ব্রতই হলো বাংলাভাষার সসম্মান প্রতিষ্ঠা—তাঁরা কি সত্যই ভাষাকে ভালোবাসেন, নাকি তাঁরা গোপন কোন অসৎ অভিপ্রায় দ্বারা চালিত? তাঁরা সত্য সত্যই ভাষার সেবক নাকি ভাষাই তাঁদের সেবক? তাঁরা প্রকৃতই সংস্কৃতিপ্রেমী, নাকি সংস্কৃতির পৃষ্ঠদেশে সওয়ার কোন সংস্কৃতিভুক চতুর ভাষা-ব্যবসায়ী? কে কী জবাব দেবেন জানি না, তবে বর্তমান আলোচকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, আমাদের অধিকাংশ কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, এমনকি বহুবিখ্যাত বিবৃতিদক্ষ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যাঁরা সাহিত্যসভায় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে উপবেশন করতে করতে খুবই পরিশ্রান্ত, তাঁরা কেউ প্রেমিক-তো নয়ই, বরং তাঁরা বাংলাভাষাকে অকথ্যরূপে অবজ্ঞাই করেন। আমার একটি তথ্যানুগ গবেষণা আছে। এই সকল মুখর ভাষাপ্রেমী ও সংস্কৃতি-দরদির মধ্যে এমন কেউই নেই, যাঁর পুত্রকন্যা এমনকি জামাতা পুত্রবধূ কাউকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পড়াশুনা করেছেন বলে পেয়েছি। সত্যই, কী-অদ্ভুত ও অকথ্য অমার্জনীয় স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত আমাদের এই ভাষা ও সংস্কৃতির 'অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষীবৃন্দ'! আসলে আপামর বাঙ্গালীর মত আবহমান বাংলা ভাষাও ধুরন্ধর কিছু স্বার্থশিকারীদেরই অবাধ ও নিরাপদ মৃগয়াক্ষেত্র!

অবশ্য জীবন-জীবিকা ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে কোন জোর-জবরদস্তি নেই, থাকা উচিতও নয়। অর্থাৎ কেউ যদি মনে করেন, বাংলাভাষার প্রতি সপ্রেম ও সার্বক্ষণিক

www.pathagar.com

দুর্বলতাহেতু সময় ও শ্রমব্যয় পার্থিব উন্নতির প্রশ্নে সহায়ক-তো নয়ই, বরং বাধা, তাহলে তাকে দোষ দেয়া সমীচীন নয়। কেউ যদি মনে করেন, বাংলা পড়লে ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন; মনে করেন, বাংলাভাষার জন্য অশ্রু বিসর্জন করা যায় কিন্তু জীবনে গ্রহণ করা যায় না, তাহলে তাকেও দোষ দেয়া সমীচীন নয়। তিনি যা-বোঝেন, বাস্তবতা তাঁকে যে-কথা বলে, তিনি সেভাবেই সিদ্ধান্ত নেবেন। অতএব যিনি আপন পুত্রকন্যা, জামাতা, পুত্রবধূর কাউকে ভুলক্রমেও বাংলা-পড়া রবীন্দ্রপ্রেমীরূপে দেখতে না-চান, সে-বিষয়ে তিনি অবশ্যই স্বাধীন ও প্রভাবমুক্ত। কিন্তু এতদ্‌সঙ্গে এই একটি প্রশ্নও উত্থাপন করা জরুরি যে, আমাদের ভাষাপ্রেমীরা আপন সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-পরিজনের ক্ষেত্রে, যে-বাংলাভাষাকে পরিহার করাই উত্তম ও যথাযথ বিবেচনা করেন, সেই ভাষাকে নিয়ে সফেন উচ্ছ্বাস ও আকুলতা প্রকাশের কোনরূপ নৈতিক অধিকার কি তাদের থাকে? নিশ্চয়ই থাকে না; কারণ আমি যা বিশ্বাস করি না, তা-নিয়ে প্রচারে মেতে ওঠা নিঃসন্দেহে একটি নিকৃষ্ট ধরনের নৈতিক অপরাধ। তবু এই কাজটি তারা কেন করেন? নেপথ্যে কোন অহিতকর দুরভিসন্ধি নেই তো? স্বল্পসংখ্যক চতুর মানুষ নিজেদের আধিপত্য কায়েম রাখতে ভাষাপ্রেমকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে না-তো? সন্দেহ অমূলক নয়; কারণ বস্তুতই কারো কাছে এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই।

জ্ঞানী ও অভিজ্ঞজনেরা যেমন বলেন, 'দেশপ্রেম দুর্বৃত্তদের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল'; একইভাবে আমরাও বলতে বাধ্য হই, আমাদের ভাষা ও ঐতিহ্যপ্রীতির যে-রূপ, তা প্রকৃতপক্ষে শঠতাসৃষ্ট এক লোক-দেখানো দরদের বাতাবরণ, যার অন্তর্ভাগে বিরাজ করছে এক বিষময় কুৎসিত কপটতা। এবং এই হেতুই মাতৃভাষা ও লোকজ-জীবন প্রণালীর প্রতি 'গভীর অনুরাগবশত' একুশে ফেব্রুয়ারি পঁচিশে বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ দিনে আমরা মাটির শান্‌কিতে পান্তাভাত নিয়ে যদিও উন্মত্ত হয়ে উঠি, পাজামা-পানজাবিতে হয়ে উঠি শোভমান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরোটাই অভিনয়, পুরোটাই থিকথিকে শঠতা। এবং এই হেতুই দিনগুলো পুলকে-কোলাহলে অতিবাহিত হওয়া মাত্র আবার সেই ইংরাজী, আবার সেই কিন্ডারগার্টেন-টোয়েফল, আবার সন্তান-সন্ততিকে বিদেশে শিক্ষাদানের সেই প্রাণপাত তৎপরতা। একটিই প্রশ্ন, সাধারণ মানুষকে ভাষার নামে অনগ্রসর ও নিশ্চল রেখে নিজেদের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ও নিষ্কন্টক রাখার এই নির্মম চালাকির মধ্যে সত্যই কি কোন প্রেম আছে? আসলে রাজনীতি ও দেশপ্রেমের নামে, গণতন্ত্র, সাম্যবাদ কি মুক্ত-অর্থনীতি, মানবাধিকার কি নারী-স্বাধীনতা ইত্যাদি নামের মহিমায় বিশ্ববিস্তৃত মানববংশের যেমন উপকার হয় নি, শুধু একটি বিশেষ শ্রেণীই লাভবান হয়েছে; ঠিক একইভাবে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য এবং সংস্কৃতিপ্রেমেরও নীট মুনাফা উঠেছে কতিপয় চতুর ভাষা-ব্যবসায়ীর গোলাঘরে। সত্যই, মানবশোষণের এ-এক ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়া! ভয়ঙ্করই বটে!

www.pathagar.com

প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই প্রক্রিয়াটিই চালু ছিল কোথাও অগ্নিদেবতার নামে, কোথাও গীর্জা, কোথাও লাত-হোবল ইত্যাদি পুতুল-দেবতার নামে। এবং তখনো শোষণচক্রটি ছিল বেশ নিপুণ ও সুগঠিত। রাজশক্তি পৃষ্ঠপোষকতা দান করতো পুরোহিতদের আর পুরোহিতরা নি:শর্ত সমর্থন করতো রাজাদের; ধর্মের নামে রাজশক্তির অনুকূলে তারা জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করতো ভয় ও সম্ভ্রম এবং অলীক উন্মাদনা। সেই একই কৌশল এখনো সক্রিয়, বরং পূর্বাপেক্ষা আরো প্রবলভাবে সক্রিয়; শুধু গীর্জা কি দেবতার স্থলে জনগণের সম্মুখে তুলে ধরা হচ্ছে অন্য কুহক, অন্য বিভ্রম!

এজন্যই হার্ভার্ড কি অক্সফোর্ড-খ্যাত বিশ্বজয়ী পণ্ডিতজন, নোবেল-লরেট কোন কবি কি অর্থনীতিবিদও আজ মূল শোষকদেরই অর্থপুষ্ট এজেন্ট মাত্র। তাঁদের মেধা, মনীষা ও প্রতিভা, খ্যাতি ও বিদ্যাবত্তা সবই মানব-রক্তপায়ী ধনকুবেরদের দাসত্বে নিয়োজিত। যত নক্ষত্রচুম্বী প্রতিভাবানই হোন, যদি তাঁর ভূমিকা পৃথিবী-বিস্তৃত অর্থনৈতিক শোষণকে কণামাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত করে, তিনি নোবেল পাবেন না। শান্তির জন্য কাজ করলেই শান্তি পুরস্কার লভ্য নয়, যদি সেই শান্তি পশ্চিমাদের কুশলি কার্যক্রমে সামান্য পরিমাণও অশান্তির কারণ হয়। অসংখ্য উদাহরণ পেশ করা যায়; কিন্তু ধারণা করি, একটি, দু'টি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে। সদ্য নোবেল-বিজয়ী অমর্ত্য সেন অনুন্নত বিশ্বের দুর্ভিক্ষ ও তার কারণসমূহ নিয়ে কথা বলেছেন। বলেছেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধের ঘনিষ্ঠতা প্রয়োজন; এবং একথাও বলেছেন, অন্য কোন সিস্টেমেই পুরোপুরি সাফল্যলাভ সম্ভব নয়, একমাত্র গণতান্ত্রিক সরকার-ব্যবস্থাই দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। খুবই মূল্যবান ও খুবই গ্রহণযোগ্য এই সুপারিশ; অন্তত গণতন্ত্রবিলাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই কথা এমনকি জ্যাকসনের মধুস্রাবী সঙ্গীতের চেয়েও মধুরতর। কিন্তু অমর্ত্য সেন ভুলক্রমেও একথা বলেন নি বা বলতে পারেন নি যে, পশ্চিমা বিশ্বের হৃদয়হীন লুণ্ঠন প্রক্রিয়াও একটি গুরুতর কারণ। বললে, নোবেল-তো পেতেনই না, বরং পশ্চিমাদের বিরাগভাজন হতেন। খলিল জিবরান শুধু মাতৃভাষা কি মাতৃভূমির বলয়ে আবদ্ধ নন, আক্ষরিক অর্থেই তিনি এক বিশ্বনাগরিক। এবং পশ্চিমা পাঠকদের কাছেও তাঁর রচনা, অন্তত 'দ্য প্রফেট' অসম্ভব রকম প্রিয় ও আদৃত। তাঁর নাম উপর্যুপরি পাঁচবার উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু নোবেল কমিটি বিবেচনাও করে নি, গ্রাহ্যও করে নি। কারণ অন্য কিছু নয়, পশ্চিমা 'মানবদরদিরা' 'যে-অমৃতকথা' পৃথিবীকে শুনাতে চায়, জিবরানের বক্তব্য তার বিপরীত। জিবরান নিজে যে-ধর্মেরই হোন, তাঁর 'দ্য প্রফেট' বিপুলভাবে রেসালত ও তওহিদী বিশ্বাসের নিকটবর্তী। অতএব 'সর্বনাশ'! এমন ব্যক্তিকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করার অর্থ পশ্চিমাদের জন্য রীতিমত আত্মঘাতী।

আসলে যা বলতে চাই, তাহলো আধুনিক পৃথিবীতে ভাষা আর ভাষা নয়, সাহিত্যও

www.pathagar.com

সাহিত্য নয়; এমনকি বিজ্ঞান, কল্যাণমুখী কোন অনুসন্ধান, নান্দনিকতা ইত্যাদি কিছুই আর স্ব-স্বভাবে অকৃত্রিম নয়। সবই এক মতলবী-বাণিজ্যের বিশাল ব্যাদিত মুখগহ্বরের মধ্যে বিলীন এক-একটি অসহায় উপকরণ। কোন সন্দেহ নেই, আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিও কিছু মতলবী-প্রেমিকেরই অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র। এবং এজন্যই, তাঁরা শুধু ভাষাকে ভালোবেসেই ক্ষান্ত নয়, তাঁরা এক ধরনের বায়ুরোগেও আক্রান্ত, যা-থেকে তাঁরা জনমনে এক ভৌতিক আতঙ্ক ও ভৌতিক বিশ্বাস সৃষ্টিতেও সদা তৎপর। উল্লিখিত বিশ্বাসের স্বরূপটি হলো এই যে, তাঁরা ছাড়া বাংলাভাষার দ্বিতীয় কোন দরদী নেই, তাঁদের কৃতকর্ম ছাড়া আর সবই উৎত্রাস ও উপচ্ছায়া। আর ভৌতিক আতঙ্ক হলো এই যে, ভাষাপ্রেমে সর্বদা নিদ্রাহীন নিশিযাপিত এই সকল মহাপুরুষের বাইরে ও বিপরীতে যাঁরা কর্মিষ্ঠ, তারা সবাই মৌলবাদী। আর এই হেতুই মহানবী (সাঃ) কি হজরত উমার ফারুক (রাঃ)-কে নিয়ে যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরস্পর্শী কোন গ্রন্থ রচনা করেন, সেই লেখা আদৌ কোন লেখা নয়। অথচ যিনি কালকেতু বা চন্ডীদাস, মুচিরাম গুড় বা ভূতের গপ্পো নিয়ে বই লেখেন, তিনি নান্দনিকতার এক পরম পুরুষ, বাংলাভাষার এক অপরিহার্য হিতৈষী। যাঁর লেখায় সকল বিশ্বাসী মুসলমানের জন্য সত্য ও শুভত্ব, প্রেরণা ও সাহস এবং কল্যাণকামিতা, আল্লাহর ভয় ও রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্য, মানবপ্রেম ইত্যাদি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, তিনি 'ভাষাবিরোধী কূপমন্ডূক', যিনি সাদী, রুমি, হাফিজ কি গাজ্জালি কি ইকবালের কথা নিয়ে বই লেখেন, তিনি 'অমার্জনীয় মৌলবাদে' আক্রান্ত ভাষা ও সাহিত্যের একজন 'ঘোরতর শত্রু'। অথচ যিনি কোন চতুর্থ শ্রেণীর (4th Class) একটি মার্কিনী নাটকের অনুবাদ করেন অথবা কোন ঢেঁকি-পাড়ানীর গান সংগ্রহ করেন, তিনি এক মহাসাহিত্যিক, তিনি এক অবিস্মরণীয় ভাষাপ্রেমী। আফসোস! সম্ভবত এজন্যই, বক্তব্য যে-প্রসঙ্গেই হোক, নীরদ চৌধুরী তার একটি বইয়ের বড় সুন্দর ও মর্মস্পর্শী নাম রেখেছেন 'আত্মঘাতী বাঙ্গালী'। সত্যই আত্মঘাতী, যে-কারণে মাঝে মাঝেই নানা স্থানে বিশেষ করে টিভি-তে, এমন সব পণ্ডিতের দেখা মেলে, যাঁরা বলেন-ভারত কবেই-না টোল চতুষ্পাঠী তুলে দিয়ে আধুনিক অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছে, অথচ বাংলাদেশ এখনো 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে' মাদ্রাসা শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে আছে; অসার ও অপ্রয়োজনীয় এই ব্যবস্থার অবসান ঘটা আবশ্যক। পণ্ডিতই বটে। কিন্তু 'দুঃখের' কথা, তাঁদের সদুপদেশে কতিপয় উন্মাদ ছাড়া কেউ কর্ণপাত করে না। এবং এই সকল পণ্ডিত-প্রবরের বিবেচনাবোধ 'প্রখর' এবং সুপারিশটিও 'উত্তম', কিন্তু তাঁদের সদয় জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করি, টোল চতুষ্পাঠীকে তুলে দেয়া হয় নি, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই উঠে গেছে। কিন্তু ইসলাম এরকম কোন উঠে যাবার বস্তু নয়। ইসলামের সম্মানজনক হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহপাকের হাতে। 'ইন্না নাহ্নু নাজ্জালনাজ্জিকরা ওয়া ইন্নাহু লা হাফিজুন' কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছি, আমিই সংরক্ষণ করবো (সূরা হিজর)। অতএব কোরআন-হাদীসের চর্চাকেন্দ্র কোন ধর্মীয়

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানকে তুলে দেবার কথা কেউ কেউ ভাবলে ভাবতে পারে, কিন্তু কাজটা অসম্ভব। আমাদের মূষিক বা মণ্ডুকদের-তো প্রশ্নই ওঠে না, পৃথিবীর বহু ঐরাবতও চেষ্টা করে দেখেছে, এটা সম্ভব নয়। উপরন্তু সমগ্র পৃথিবী আজ যখন ইসলামের অব্যর্থ মহিমা ও কার্যকারিতায় মুগ্ধ, সমগ্র ইয়োরোপ-আমেরিকা আতঙ্কগ্রস্ত, তখন আমাদের কিছু কিছু পণ্ডিত-যে কী-বিবেচনায় ইসলামী-শিক্ষাকে অসার বলে ভাবতে পারেন, সেটা এক সমূহ দুর্ভাবনার বিষয়। বলা মুশকিল, এটা অজ্ঞতা নাকি বিশুদ্ধ অসততা।

কিন্তু অজ্ঞতা কি অসততা যাই হোক, বর্তমান নিবন্ধকারের ধারণা, এই ধরনের অন্তর্ঘাত ও অসদ্বিবেচনা প্রতিরুদ্ধ না-হয়ে যদি আরো প্রবল রূপ ধারণ করে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য অপেক্ষা করছে অনেক দুঃখ ও দুর্ভোগ। অন্তত একটা মুসীবত-তো রীতিমত ঘনায়মান ও সুস্পষ্ট যে, দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকালের বিপুল রক্ত ও নিরন্তর শ্রমের বিনিয়োগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে-একটি আলাদা চারিত্র্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি, তা আবার কলকাতার পদানত হয়ে কলকাতার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার উপক্রম। কলকাতার বাবু-লেখকদের প্রতি আমাদের মাত্রাতিরিক্ত প্রণয় ও আসক্তি, তাঁদের সামান্য স্তুতি ও প্রশংসার প্রতি ভিখারীর মত দুর্বলতা, এক অনাগত দুঃসময়েরই অগ্রিম সংকেত। এবং যিনি যত ইচ্ছা পুলকিত হোন, আসলে এই দুঃসময়কে যথাসম্ভব ত্বরান্বিত করার জন্যই আমাদের কিছু পাত্রে-অপাত্রে আনন্দবাজারের অর্ঘ নিবেদন এবং ঢাকার প্রতি সুনীল বাবুদের চাটুবাক্য বর্ষণ। কিন্তু দুঃখের কথা, আমাদের কিছু জেগে-ঘুমানো অর্ধ-পেলিটিক্যাল লেখক-বুদ্ধিজীবী এই অর্ঘ ও চাটুবাক্য নিয়ে এমনই আপাদমস্তক হিল্লোলিত যে, তাঁদেরকে বুঝানো এটা কষ্টকর যে, আমাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রাণশক্তি নিহিত আছে আমাদেরই নিজস্ব বোধ ও বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র আত্মচেতনার মধ্যে। কিন্তু বুঝানো কষ্টকর কেন? কষ্টকর এজন্য যে, এই উপলব্ধি ও তদনুযায়ী আমল আমাদের অনেকেরই লঘু আত্মস্বার্থের জন্য বিশেষ অনিষ্টকর ও প্রতিকূল। এতে কলকাতার কলেজস্ট্রীট ও কফি হাউসের বন্ধুজনেরা মনঃক্ষুন্ন হতে পারেন, যা আমাদের সমূহ ক্ষতির কারণ। উপরন্তু আমরা সম্পূর্ণ জেনেশুনে একদিকে ভাষা ও সংস্কৃতিকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করে নিয়েছি; অন্যদিকে গোপন উপেক্ষায়-অনাদরে তাকে পরিণত করেছি ব্রাত্যজনের অব্যর্থ 'রৌরব' গমনের প্রকৃষ্ট উপায়ে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রেমই বটে! এমন অতিপ্রেমের নিখাদ ও উপাদেয় প্রতিচ্ছবি, বেঁচে থাকলে ঈশ্বরগুপ্ত আঁকতে পারতেন; সম্ভবত, এখন পারেন আমাদের জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট রনবী।

অবশ্য আমাদের কতিপয় বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী, যাঁরা এখন স্বঘোষিত প্রাধান্য নিয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির একচ্ছত্র চালকের আসনে প্রায় সিজারের মত সমাসীন, তাঁরা

www.pathagar.com

অত্যন্ত চতুরও বটে। তাঁরা জানেন কী-করে আপন প্রাধান্যকে বজায় রাখতে হয়; বাংলাভাষার ক্ষতি-বৃদ্ধি যাই হোক, তাঁরা জানেন, কী-করে প্রমাণ করতে হয় তাদের হাতের বায়ুভর্তি বেলুনগুলো আসলে বাংলাভাষার এক-একটি কালজয়ী দিব্যরথ। এবং তাঁরা একথাও জানেন যে, ফাঁকি ও ব্যর্থতা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে দেবার সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল হলো লড়াই বাধিয়ে তা অব্যাহত রাখা। দেশ-পরিচালনায় ব্যর্থ ও অসাধু দেশ-শাসকেরা এই কৌশল অবলম্বন করে অনেক সময়ই আপন দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা তুলে ধরেন। এ-এক মোক্ষম কৌশল। বিশেষ কৌতুককর যে, আমাদের অতি-প্রেমী ভাষাজীবীরা এই কৌশলটি বেশ দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারঙ্গম। এবং এই হেতুই, ইসলাম ও ইসলামী-সাহিত্যকে তারা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রাণঘাতী প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করিয়ে এক ভয়াবহ ক্রুসেডের সূচনা করেছেন। এবং এই ক্রুসেড একই সঙ্গে এমন হাস্যকর ও বেদনাবহ এবং সুস্পষ্ট যে, আজ আমাদের কোন কোন 'প্রধান' কবি জয় গোস্বামীর কথা বলতেও শ্লাঘা বোধ করেন, কিন্তু মীর মশাররফ হোসেন কি নজরুল ইসলাম কি ফররুখ আহমদের নাম তাদের মনেও আসে না, মুখে-তো আসেই না। নটী বিনোদিনী কি ক্ষ্যাপা বাউলের উপর লিখিত বইও গগনচুম্বী বিদ্যাবত্তার প্রমাণ বহন করে, কিন্তু 'বিষাদসিন্ধু' 'বিশ্বনবীর' যাঁরা প্রণেতা, যাঁরা মহাগ্রন্থ আল কোরআন কি বোখারি শরীফ, মুসলিম শরীফের অনুবাদক, তাঁরা 'গোঁড়া' ও 'অর্ধশিক্ষিত' ও 'সাম্প্রদায়িক' এক-একজন 'ধর্মান্ধ' ভাষাদ্রোহী। বদনসীব, সত্যই বড় বদনসীব! কে প্রধান আর কে অপ্রধান, কে প্রকৃতই কবি আর কে মতলবী-পাগল, সে অন্যকথা; কিন্তু সামান্য-সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে মানুষ যখন ভাঁড় ও বিদূষকে পরিণত হয়, অভ্যস্ত হয় মিথ্যাচারে, তখন এসব উপসর্গই প্রবল হয়ে ওঠে। আর এই আত্মবিলুপ্তি, এই হীনমন্যতা, স্ব-সমাজের ঈমান ও আকীদা-বিধ্বংসী এই মারাত্মক তৎপরতা নিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং সংস্কৃতির চর্চায় যাঁরা নিবেদিত, তাঁরা বাংলা একাডেমী পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, একুশে কি স্বাধীনতা পদক, এমনকি নোবেল পুরস্কার লাভ করলেও বাংলাভাষার কোন লাভ নেই।

এ-বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, ভাষা হলো Means of Communication। আর মাতৃভাষা যেহেতু আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম, আমাদের কাছে বাংলা ভাষার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু আপন বিশ্বাস ও অভিজ্ঞানকে সমূলে উৎপাটিত করাই যাদের প্রিয়তম কাজ, তাদের মৌখিক ভাষা-প্রণয় একটি ছলনাময় উৎপাত মাত্র। অর্থাৎ যার আত্মচেতনাই দুর্বল ও দ্বিধাবিভক্ত এবং সম্ভ্রমরিক্ত, তার দ্বারা বাংলাভাষার কোন উপকারের যেমন সম্ভাবনা নেই, তাৎক্ষণিক মুনাফালভ্য ভাষাচর্চার মধ্যে তার নিজেরও কোন প্রকৃত উপকার-লাভের সম্ভাবনা নেই। বস্তুতই এ-এক দুরূহ সংকট, এক নিকষ

www.pathagar.com

অন্ধকার। তবু আশা করতে চাই, এই স্বার্থশিকারী 'মতলবী-পাগলদের' তৎপরতা বন্ধ হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ অবশ্যই একদিন জঞ্জালমুক্ত হবে। আশা করতে চাই, আমাদের বহু ভাষাপ্রেমীর অতি-নাটকীয় প্রণয়কথার মধ্যে ঘনীভূত হয়ে আছে যে-অনেক রহস্য ও কুহক এবং প্রহেলিকা, তার অবসান ঘটবে; কারণ তওহিদী চেতনায় উজ্জীবিত শতকরা পঁচাশি ভাগ মানুষের তামান্না কখনো নারী ও প্রকৃতি, অশ্লীলতা শির্‌ক ও পৌত্তলিকতার মধ্যে চিরকাল অবরুদ্ধ থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই বাংলাভাষা তার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের তরঙ্গভঙ্গে একদিন কল্লোলিত হয়ে উঠবে; বর্তমান এই রহস্যময় দুঃস্বপ্নের দিনগুলো অস্তমিত হয়ে জেগে উঠবে এই জমীন ও জনপদের একান্ত প্রতীতি সত্য সাহস ও আত্মবিশ্বাসের অমর উপাখ্যান। আমরা অলস, অক্ষম ও নগণ্যজনেরা নিরন্তর এই আশাতেই বুক বেঁধে আছি।

দৈনিক ইনকিলাব - ৩০.৫ ৩ ১.৬.৯৯

www.pathagar.com

লালন ও কতিপয় গুরুতর প্রসঙ্গ

এক:

'আমার এই দেশেতে এই সুখ হলো আবার কোথা যাই না-জানি', পংক্তিটি লালন ফকিরের; এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, সর্বমানবিক বেদনার এ-এক অসাধারণ মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি। বলা যায়, প্রায় বাহাদুর শাহ জাফরের সেই অসামান্য রক্তক্ষরিত যন্ত্রণার মতই তীব্র, 'উমরে দরাজ মাঙ্গকে লিয়ে থে চারদিন, দো আরজু মে কট্ গয়ি দো ইন্তেজার মে'- যা একইসঙ্গে আমাদের অনুভূতিকে শুধু বিষন্ন করে না, বিবশও করে। আমার ধারণামতে এই ধরনের কবিতাই প্রকৃত কবিতা। এবং কবিতার নামে বহু অকথ্য উপদ্রব সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, এই ধরনের কিছু কিছু পংক্তির আবির্ভাব ঘটে বলেই শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই কবিতা-লেখার কাজটিকে একটু বেশ প্রীতির চোখেই দেখা হয়। যদিও এই 'দেখা'র মধ্যে সর্বদা-যে প্রীতিই প্রতিভাত হয় তা নয়, অবজ্ঞা করুণা ও কৌতুকও মিশ্রিত থাকে। অর্থাৎ কবিরা নিজে যাই ভাবুন, বিদগ্ধ সাহিত্যপ্রেমীরা যাই বলুন, এটা সত্য যে, কবিদের সামাজিক মূল্য বিশেষ আশাপ্রদ নয়, উল্লেখযোগ্যও নয়। নোবেল পুরস্কার পেয়ে কেউ কেউ আকস্মিকভাবে ধনাঢ্য ও জগদ্বিখ্যাত হয়ে যান বটে, কিন্তু সে নিতান্তই ব্যতিক্রম। অধিকাংশ কবিই আমৃত্যু এক ধরনের অবহেলার মধ্যেই জীবন যাপন করেন। অবশ্য এ-কালের কবিরা যেহেতু একটু চতুর প্রকৃতির, তাঁরা কবিতার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক লাভজনক বৈষয়িক দিকেও যথোচিত মনোনিবেশ করতে দক্ষ। তাঁরা যুগপৎ শিক্ষিত, সংস্কৃতি-ব্যবসায়ী এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চতুর্দিকে সততই এমন অনুগত-লাটিমের মত ঘূর্ণায়মান যে, তাঁরাও বহু সভায় সসম্মানে সভাপতি বা প্রধান অতিথির আসন প্রায়শ অলংকৃত করতে সক্ষম হন। কিন্তু সবাই জানে, তাঁরা নিজেরাও জানেন—এই সম্মান ও প্রতিষ্ঠার প্রকৃত মূলধন কবিতা নয়, চাটুকারিতা ও ক্ষমতাবানদের সম্মুখে নতজানু হয়ে নিজেকে এক সহজ দ্রবণে পরিণত করার অসামান্য দক্ষতা। এবং যে-কবি যত চাতুর্যের সঙ্গে এই দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন, তিনি তত বড় কবি।

অবশ্য চিরকাল এ-রকম ছিল না। বিদূষক ধরনের রাজকবি ও ভাঁড় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী চিরকালই ছিল; কিন্তু তার বাইরে কবিতার প্রতি সৎ ও বিশ্বস্ত এমন কবিও ছিলেন, যাঁরা কারো মনরক্ষার কথা না-ভেবে একেবারে নিজস্ব আবেগে ও অনুরাগে দুলে দুলে উঠতেন। এরকমই একজন আত্মমগ্ন, সামাজিক স্বীকৃতির প্রতি সর্বাংশে ভ্রূক্ষেপহীন, একান্ত আবেগে আন্দোলিত একজন লোক কবির নাম লালন ফকির। কেউ কেউ বলেন সাঁইজী। তবে 'সাঁই' বা 'ফকির' যাই বলা হোক, লালন-যে বাউল পদরচনায় অমিতপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর গানের আকর্ষণ-যে খুবই দুর্বার,

www.pathagar.com

এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং সুর ও বাণীর সমন্বয়ে লালন যে-অসংখ্য শিল্পসুষমামন্ডিত, নান্দনিকতায় সমৃদ্ধ হৃদয়দ্রাবী গান উপহার দিয়েছেন, সেই উপহার বাংলাভাষী জনগণের একটি চিরায়ত সম্পদ।

কিন্তু লালনকে নিয়ে অন্য সমস্যা আছে; এবং সমস্যা একটি নয়, একাধিক। এখনো যে-একটি বিষয়ে মীমাংসা হলো না, তাহলো লোকটি জন্মসূত্রে কী ছিলেন, হিন্দু না মুসলমান? নানারকম তর্কবিতর্কের পর এখন অবশ্য মুসলমান বলেই মনে করা হচ্ছে। যাঁরা তাঁকে হিন্দু বলে বিশ্বাস করেন, ক্লান্তি ও অনীহাবশত তাঁরা এখন অনেকটাই নীরব। লালন যে-সকল গবেষকের কাছে মুসলমান, তাঁরা লালনের জন্মস্থান হরিশপুরসহ পিতামাতা আত্মীয়-পরিজনের পরিচয়ও 'নির্ভুলভাবে' চিহ্নিত করেছেন। লালন নিজে অবশ্য নিজের সম্পর্কে কিছুই বলেন নি; এমনকি ভুলক্রমে গানের মধ্যেও কোথাও কোনরূপ পরিচিতি প্রকাশ হয়ে না-পড়ে, এ-বিষয়ে তিনি সজাগ ও সচেতন ছিলেন। অর্থাৎ খুব সচেতনভাবেই লালন তাঁর ধর্ম ও জন্মগত পরিচয় গোপন করেছিলেন। গবেষকদের চিন্তা-ভাবনার পরিসরও বড়, রহস্যভেদী দূরদর্শিতাও অপরিসীম। তাঁদের কারো সাথেই কোন তর্কে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা নেই, শক্তিও নেই। অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে শুধু একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোন খুনী বা বড় ধরনের কোন দস্যুতস্কর ছাড়া কোন মুসলমান কি কখনো আত্মগোপন করে? তার-তো জাতি-ধর্ম নিয়ে কোন ভয় নেই, হীনমন্যতাও নেই, বিনা কারণে সে কেন জন্ম ও ধর্মপরিচয়কে সর্বদা আড়াল করে রাখবে? 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে' এই ধরনের গান লেখার জন্য রহস্যময় আবরণ সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন হয় না; সব ধর্মকে অস্বীকার করাই যথেষ্ট অথবা সব ধর্মকেই আপন ভেবে সর্বপ্রেমী ধর্মনিরপেক্ষ হলেই যথেষ্ট। নজরুল ইসলামও বলেছেন, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন' কিন্তু এজন্য নজরুলকে পরিচয় গোপন করতে হয় নি। আসলে লালনের এই আত্মগোপন ইচ্ছাকৃত নয়, বাধ্যতামূলক। ড: উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথাই সর্বাংশে সঠিক; লালন ছিলেন জন্মসূত্রে একজন কায়স্থ হিন্দু এবং কর-উপাধিধারী এই লালনের জন্মস্থান ছিল কুমারখালীর অপরপারে গড়াই নদী তীরবর্তী ভাঁড়ারা গ্রামে। বর্তমান নিবন্ধকারের যুক্তি, লালনের সমসাময়িক হিন্দুসমাজ ছিল অত্যন্ত কঠোর। ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, লালন মুসলমান পরিবারে অবস্থানসহ 'অন্নজল' গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভাঁড়ারায় ফিরে গিয়ে তিনি দেখলেন, তিনি কঠিনভাবে সমাজচ্যুত। হয়ত প্রায়শ্চিত্তের কোন ব্যবস্থা ছিল কিন্তু স্ব-সমাজের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা, ক্ষোভ ও অভিমান নিয়ে লালন ফিরে এলেন ছেঁউড়িয়ায় তাঁর মুসলমান আশ্রয়দাত্রীর কাছে। সমাজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো, তিনিও জন্ম-রক্ত-ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পরিণত হলেন এক নবজাত লালনে। যৌক্তিক দিক থেকে এই ধরনের জন্মপরিচয়হীন আত্মগোপনতাকেই স্বাভাবিক বলে ধারণা হয়।

www.pathagar.com

আর তিনি যদি সত্যই মুসলমান হতেন এবং তাঁর জন্মস্থান হতো হরিশপুর, তিনি চাইলেও তাঁর পরিচয় তিনি আড়াল করতে পারতেন না। তিনি জীবদ্দশায়ই বিখ্যাত; এবং তাঁর ছেঁউড়িয়াস্থ আখড়া থেকে হরিশপুরের দূরত্ব এমন বেশি নয়। হরিশপুর থেকে কেউ-না-কেউ এসে কোন-না-কোনদিন নিশ্চয়ই বলতো- 'এ-লালন আমাদেরই সন্তান'। কিন্তু না, তাঁর দীর্ঘজীবনে এমন কথা কেউ কখনো বলে নি। অতএব দু'একজন উপাধিলিপ্সু গবেষক যত যাই বলুন, যত দলিল প্রমাণই উপস্থাপন করুন, বিশ্বাস করা খুবই কষ্টকর যে, লালনের বাড়ি ছিল হরিশপুর এবং তিনি মুসলিম সন্তান। যে-এক 'কলমিপুঁথির' অবলম্বনে লালনকে মুসলমান বানানো হয়েছে, খুবই রহস্যময় ও কৌতুককর যে, সেই পুঁথিটিও কোন এক 'সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ডে' ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এখন শুধু একটি নকল পুঁথিই সম্বল। কিন্তু এই প্রশ্ন কি খুব অসংগত যে. 'আসলটা' যখন অক্ষত ছিল তখন কী-প্রয়োজন ছিল আরেকটি নকল লেখনের? তারপরও প্রশ্ন, মূল কপিটি যখন পুড়েই গেল, হুবহু দ্বিতীয় একটি কপি তৈরী হলো কী-করে? পুরো ব্যাপারটাই কোন মতলবি-নাটক নয় তো? বিশেষ করে পুঁথি-বিশেষজ্ঞরা যখন ভাষা-শব্দ ও অন্যান্য বিচারে উপস্থাপিত এই নকল কপিটিকে ঘোরতরভাবে সন্দেহ করেন, তখন আমাদের মত মূর্খজনেরা ভাবতে বাধ্য হয় যে, আমাদের কতিপয় উপাধিলোভী গবেষক, সত্যানুসন্ধানী সশ্রম গবেষণার চেয়ে লোকপ্রিয় নাটক রচনাতেই অধিক পারঙ্গম। বলা আবশ্যক, আমার নিজের কোন ব্যক্তিগত পূর্বসিদ্ধান্ত নেই। একদা নানা কারণে আমার মধ্যে লালনের প্রতি কিছু অনাবশ্যক অনুরাগ জন্মেছিল; সেই সূত্রে তাঁর জীবন ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে কিছু চিন্তাভাবনাও করেছিলাম। আমার মনে হয়েছে, আমাদের মধ্যে একজন মাত্র আছেন যিনি লালন-গবেষণায় নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী; তিনি ড: আবুল আহসান চৌধুরী। তাছাড়া অধিকাংশই পূর্বধারণা ও মতলবি-উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত। তবে সুখের বিষয়, আলোচ্য সমস্যাটি একটি অতিশয় লঘু সমস্যা। এ-নিয়ে কেউ কেউ জীবনপাত পরিশ্রম করলেও করতে পারেন, কিন্তু এতে মেধা ও মনীষার কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও কোন উপকার হয় না। লালন হিন্দু ছিলেন না-মুসলমান, এ-বিষয়ে সাধারণ জনমনে কিছুটা কৌতূহল যদিও আছে, কিন্তু এই অপ্রয়োজনীয় লঘু-কৌতূহল আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়; এবং এতে বিশেষ কিছু এসেও যায় না।

কিন্তু লালনকে নিয়ে দ্বিতীয় একটি সমস্যা আছে, যা শুধু প্রবল কি প্রকট নয়, রীতিমত বিপজ্জনকও বটে। কেউ কেউ লালনকে বলেন 'আউলিয়া'। খুবই বিপদ যে, এই ধরনের গবেষকদের প্রলাপোক্তির কোন সীমা-পরিসীমা নেই। যে-ব্যক্তি জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়েন নি, একটি রোজা রাখেন নি, যিনি চৈত্রমাসের দোল-পূর্ণিমাকে গ্রহণ করেছেন তাঁর বাৎসরিক পুণ্যযজ্ঞের মাহেন্দ্র রজনীরূপে, যিনি যাপন করেছেন

www.pathagar.com

ইসলামের সঙ্গে গুরুতরভাবে সাংঘর্ষিক ও সম্পর্করিক্ত এক মুশরেকি জীবন, যাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের আধ্যাত্মিক সাধনার শ্রেষ্ঠতম অনুপান হলো ধূমায়িত গঞ্জিকা—তিনিও একজন 'আউলিয়া'। আউলিয়াই বটে! কোন কোন গবেষকের প্রেম ও কল্পনাশক্তি যে সত্যই কত প্রখর, এটা তারই প্রমাণ। জন্মসূত্রে লালন কী ছিলেন, এ-নিয়ে কিছু সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর জীবনাচারে যে ইসলাম ও মুসলমানিত্বের গন্ধমাত্র ছিল না, এটা-তো দিবালোকের মত স্পষ্ট। তবু তাঁকে আউলিয়া-দরবেশ অভিহিত করে কিছু কিছু গবেষক কী-যে তৃপ্তি, সুখ ও ফায়দা লাভ করেন, আল্লাহপাক জানেন। এবং এই পণ্ডিতজনেরা কিন্তু যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করেছেন। কারণ অবস্থা অতি দ্রুত এমন রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, গঞ্জিকাপায়ী সংসার-পলাতক কিছু লালনভক্ত শুধু নয়, বহু সাধারণ মুসলমানও এখন বিশ্বাস করে, শুধু কবি নয়, লালন একজন খুব বড় মাপের আউলিয়াও ছিলেন। ভয় হয়, কোন-না-কোনদিন রবীন্দ্রনাথও এই অভিধায় চিহ্নিত না-হন। কারণ তাঁর কিছু গানের 'সূফীতাত্ত্বিক' মহিমা এবং তৎসঙ্গে দেবোপম অবয়ব ও শ্মশ্রুমণ্ডিত অনিন্দ্য-মুখশ্রী 'আউলিয়া' অভিধা ধারণের পক্ষে খুবই মানানসই ও সহায়ক। এবং ইতোমধ্যে কেউ কেউ-যে তাঁকে আল্লাহর প্রায় সমকক্ষ বলে ঘোষণা করছেন ও তাঁর সঙ্গীতকে গ্রহণ করছেন 'ইবাদতের' বস্তু হিসাবে, এতে বর্তমান নিবন্ধকারের আশঙ্কা কখনো সত্যে পরিণত হতেও পারে। বদনসীব, বাঙ্গালী মুসলমানের সত্যই বড় বদনসীব!

বর্তমান লালনপ্রেমীদের খুব কষ্ট হবে, তবু দু'একটি বিষয়ে আলোকপাত করা বিশেষ জরুরি। প্রকৃতপক্ষে লালনের যথার্থ পরিচয় অক্ষতভাবে বিধৃত হয়ে আছে তাঁর সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী প্রায় পৌনে-এক শতাব্দীর ইতিহাস এবং তাঁর গানের মধ্যে। লালনকে নিয়ে ইতিহাস বিকৃতি শুরু হয়েছে পাকিস্তান আমলে ১৯৬৫ সালের পর। সম্ভবত, সেই থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর একটি অপরিহার্য প্রভাব-বলয়ও তৈরী হয়েছে, যে-কারণে দূরদূরান্ত থেকে ডুগি-একতারা ও গাঁজার কল্কি নিয়ে 'সাধক পুরুষেরা' তো আসছেই, শিরনি মানতসহ বহু সরলপ্রাণ মুসলমানও আসছে এই 'মাযার-জিয়ারত' করতে। এটা একটা ফিত্না; এবং এমন ফিত্না যার কারণে ঈমানই নষ্ট হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য, লালনের আখড়াকেন্দ্রিক এই ফিত্নাটি একেবারে নতুন নয়, তিন সাড়ে-তিন দশক আগে এই বিপদের আরম্ভ; এবং তারপর থেকে ক্রমাগতই এই ফিত্না প্রবল হয়ে উঠেছে। অথচ সকল সরকার ও সকল সচেতন মানুষের এই কথা বলা উচিত ছিল, যত বড় আউলিয়াই হোন, তাঁর মাযারে গিয়ে কোন কিছু প্রার্থনা করা সুস্পষ্ট শির্ক, অতএব নিষিদ্ধ। আর এটা-তো কোন মাযারই নয়, এটা একজন বাউল গীতিকারের সমাধি মাত্র। বিশেষ করে আমাদের আলেম-উলামাদের পক্ষ থেকে একথা উচ্চারণ করা খুবই জরুরি ছিল; কারণ এটা তাঁদের ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু না, তাঁরাও কিছু বলেন না। সম্ভবত, বলেন-না তার কারণ, তাঁদের অধিকাংশেরই এমন

www.pathagar.com

অবস্থা যে, দোয়ার মাহফিলে ওয়াজ করতে করতেই তাঁরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। সামান্য যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তা তাঁরা তসলিমা নাসরিন নামক এক বিক্ষিপ্তচিত্ত বালিকা ও কতিপয় মুরতাদ বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে নাটুকে লড়াইয়ের মধ্যেই নিঃশেষ করে ফেলেন। অবশ্য বিষয়টি ভিন্ন আলোচনার বস্তু, পুনরায় লালন প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

আমাদের কাছে এটা খুব দুর্বোধ্য যে, লালন যা-নয় তা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করতে কিছু মানুষের এত উৎসাহ কেন? আবহমান বাংলাগানের ইতিহাসে লালন-যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এ-নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই; এবং শ্রোতারা তাঁর গানে যদি আনন্দে আন্দোলিত হয়, সেখানেও কিছু বলার নেই। কারণ তাঁর সুর ও বাণীর মধ্যে এমন এক ধরনের নান্দনিকতা আছে, যা চিরকালই সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষকে কমবেশি আকর্ষণ করবেই। কিন্তু এটা-তো মনে রাখা উচিত যে, তিনি না-কোন দরবেশ, এবং তাঁর গান না-এতটুকু ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। 'নামাজ', 'রোজা', 'রাসূল' ইত্যাদি ধরনের কিছু ইসলামী শব্দ এবং দু'একটি ইসলামসম্মত পংক্তি দেখে কেউ কেউ বিপুলভাবে উৎসাহিত হতে পারেন; কিন্তু বস্তুত তাঁর গানের পুরো আবহই যে, ইসলামী আকীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এ-কথা না-মানার কোন যুক্তি নেই, কোন উপায়ও নেই। দু'একটি মাত্র উদাহরণ পেশ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, লালন আসলেই কী-পরিমাণে ইসলামের সম্পূর্ণ বহির্ভূত এক বেশরা জিন্দিক। 'আপনি খোদা আপনি নবি, আপনি হন আদম ছফি' অথবা 'আল্লাহ নবি দু'টি অবতার, গাছ বীজ দেখি যে-প্রকার' কিংবা 'যে-মুরশিদ সেই তো রাসূল, ইহাতে নাই কোন ভুল, খোদাও সে হয়'-এই সকল গান কী প্রমাণ করে? প্রমাণিত হয়, ইসলামের মৌলিক ও অলঙ্ঘ্য দাবী যে-তওহিদ, সেই তওহিদের সরাসরি মোকাবিলায় দণ্ডায়মান লালন এক কুশলি কবি-তীরন্দাজ। তাঁর গান শুনতে যত মধুরই হোক, তাৎক্ষণিক আবেদন হোক যতই মর্মস্পর্শী, আসলে এই গান মুসলমানের ঈমান ও আকীদা-বিধ্বংসী এক-একটি দুর্বার মারণাস্ত্র। অথচ কী বদনসীব আমাদের, এমন ঈমান-বিনাশী মারণাস্ত্র নির্মাতাকেই আমরা বলছি 'সূফী' 'দরবেশ' 'আউলিয়া'; এবং কখনো কখনো বলছি মারেফাতের নিগূঢ় রহস্যভেদী এক 'ইনসান-ই-কামেল'। কামেলই বটে, নাহলে এই কথা কি আর কেউ গানে বাঁধতে পারে-'এক এক দেশের এক এক বাণী, পাঠান কি সাঁই গুণমনি, মানুষের রচিত বাণী লালন ফকির কয়'! এমন 'ইসলাম-দরদী কামেল পুরুষ' ছাড়া কে-আর এমন করে বলতে পারে-'কে বোঝে তোমার অপার লীলে, তুমি আপনি আল্লাহ ডাকো আল্লাহ বলে। তুমি আগমেরই ফুল নিগমে রাসূল, এসে আদমের ধড়ে জান হইলে'! কী গর্হিত ও ভয়াবহ উক্তি! রাসূলকে আল্লাহ এবং আল্লাহকে রাসূল মনে করার এই জঘন্যতম আকীদা ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করারই অপচেষ্টা। লালন ফকিরের এই এক ধরনের গান, যেখানে তওহিদ, রেসালত কোরআন-সুন্নাহ, ইসলামের মূল আকীদা-বিশ্বাস-সবকিছুকে অস্বীকার করে

www.pathagar.com

এক জাতীয় কুহকভরা মরমিয়া নান্দনিকতার মোড়কে এমন সব কথা বলা হয়েছে, যা রীতিমত শির্‌ক, কুফর, নিফাক্ ও গোমরাহির চূড়ান্ত। আফসোস, যা-কিছু উৎখাত করবার জন্য এই ধরাপৃষ্ঠে ইসলামের আগমন, রাসূল (সাঃ) ও তাঁর অগণিত সাহাবী (রাঃ)দের জীবন সম্পদ সর্বস্ব নিবেদিত নিরাপস সংগ্রাম, লালনের গানে সেই সকল নিষিদ্ধ বিষয়ই বার বার বাঙ্ময় হয়ে ওঠে ; এবং আরো আফসোস যে, সেই সকল দুর্বাক্যপূর্ণ গান আজ সসম্মান প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করে।

দুই

লালনের দ্বিতীয় এক ধরনের গান আছে যা দেহতত্ত্বনির্ভর। দেহতত্ত্ব-যে কী জিনিস, আল্লাহ মালুম! দেহতত্ত্ব চিকিৎসাবিদ্যার বিষয় হতে পারে, কিন্তু এর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কী-সম্পর্ক? বস্তুত এটা একটা অতি নিম্নমানের চাতুরিপূর্ণ পরিভাষা, সরলপ্রাণ মানুষকে গোমরাহির দিকে টেনে নেবার একটা প্রতারণা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যত নোংরা প্রতারণাই হোক—এই গানের সংখ্যাও বিপুল, প্রভাবও ভয়াবহ। লালনের গানে যে-দেহতত্ত্ব, তার সরল অর্থ হলো দেহই সব। প্রায় হুবহু ফ্রয়েডের মত কথা। ফ্রয়েড তবু-তো অনেক ভালো যে, তিনি যৌনতাকে মানবজীবনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। খুবই ভুল, কিন্তু ফ্রয়েডের মধ্যে অন্তত কোনরকম চালাকি ছিল না। অথচ লালন এক্ষেত্রে এক চতুর-কামুকতা ও বিকৃত কামপ্রক্রিয়ার ধারক ও প্রচারক। এবং এটাও একটা মুখ্য কারণ, যার জন্য তাকে গ্রহণ করতে হয় গোপনতার আশ্রয়; কারণ লালন যে-দেহদর্শনের প্রবক্তা ও ব্যবহারিক রূপকার, তা এতই নোংরা ও অকথ্যরূপে নিকৃষ্ট যে, কিছু সমাজচ্যুত লম্পট-প্রকৃতির বিকৃতমনা বদ্ধউন্মাদ ছাড়া, কোন ধর্ম কি সম্প্রদায়ের কোন মানুষই এই ধরনের পরিষ্কার ইবলিসি-তত্ত্বকথাকে ভুলক্রমেও গ্রহণ করতে পারে না। আর ইসলামে-তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। অথচ কী-দুর্ভাগ্য আমাদের, লালনের সমস্ত কু-বাক্য ও বিকৃত জীবনাচার আমাদের কিছু-মানুষের কাছে এক পরম সাধনা ও পরম মারেফাত হিসেবে অভিনন্দিত! লালনতত্ত্বের প্রধান কথাই হলো, সাধনা-সিদ্ধি-মোক্ষ সবকিছু এই দেহেরই মধ্যে। এই তত্ত্ব কারো কারো কাছে খুবই প্রিয়; কারণ কপট-আধ্যাত্মিকতার আবরণে প্রাণভরে দেহসম্ভোগের এমন নির্ঝঞ্ঝাট সুযোগ অন্য আর কোথায় পাওয়া যাবে! লাম্পট্যের মধ্যে এমন মারেফাতী তরিকার সবক ও সৌরভ কতই-না মূল্যবান! বাউলদের একটা বড় সুবিধা হলো, তারা একটি নিজস্ব পরিভাষা তৈরী করে নিয়েছে। আর লালন যেহেতু একজন খুবই উঁচুমাপের প্রতিভাবান কবি ও ভাষাশিল্পী, তিনি এই পরিভাষাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তাঁর গানের যে-বক্তব্য তা খুবই গর্হিত, কিন্তু তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে আড়াল করে এক মধুর বাতাবরণ সৃষ্টি করতে দক্ষ; এবং সেই টানেই ধীরে ধীরে অনেক নিরীহজন তাঁর গানের অক্টোপাশে ধরা দেয়, তাঁর গোপন বিকৃত যৌনকামনার অনুরাগী

www.pathagar.com

হয়ে ওঠে। অনেকটাই যেন পতঙ্গশিকারী পুষ্পের মত লালনের গান ও লালনের ভূমিকা।

লালনের গান থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি আশা করি পরিষ্কার হবে। এবং এটাও আশা করি, লালন যে-দেহসাধনার কথা ব্যক্ত করেন, তা-যে আসলে কামুকতারই বিচিত্রবর্ণ অভিব্যক্তি, সেটাও পরিষ্কার হবে। লালন বলেন :

'উপাসনা নাইগো আর
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থ ব্রত যার জন্য
এই দেহে তার সব মিলে'।
অথবা
'এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন
তাইতো মানুষরূপ গঠলে নিরঞ্জন'।

কথাগুলো অন্য কিছু নয়, বিকৃতি ও বিভ্রান্তির অন্ধকারে দেহলিপ্সু নারী-পুরুষকে ডেকে নেবার একটা ভূমিকা মাত্র। এই ধরনের পংক্তি আরো অনেক আছে, যার কাজ হলো, লালনের উদ্ভাবিত অথবা ইপ্সিত নিভৃত-সাধনার গোপন অন্দরমহলে প্রবেশের আহ্বান। কিন্তু সকল 'উপাসনা' 'তীর্থব্রত' 'মাধুর্যভজন' যে-লক্ষ্যে নিবেদিত, সেই 'মহামূল্যবান' সাধনার স্বরূপ কী? খুবই অশ্লীল ও অকথ্য, কিন্তু লালন বড় 'সুন্দর' করে বলেন:

'জন্মপথে ফুলের ধ্বজা
ফুল ছাড়া নাই গুরুপূজা
সিরাজ সাঁই কয় এ-ভেদ বোঝা
লালন ভেড়োর কর্ম নয়'।

বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়, নারীর জন্মপথ অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়কে পুষ্পার্ঘরূপে গুরুর কাছে নিবেদন করাই সাধনার প্রথম পাঠ (নাউজুবিল্লাহ্)। এবং গানের স্তবকটিতে যে-ফুলের উল্লেখ আছে, তা কোন সাধারণ ফুল নয়, 'বাঁকা নদীর তীরে বারো মাসে বারো ফুল ফোটে'। বোঝা যায়, 'জন্মপথে' নারীর-যে মাসিক-রজ:স্রাব, সেই 'মহাযোগের' মাহেন্দ্রক্ষণে ভক্তির নৈবেদ্য সাজিয়ে গুরুর কাছে নিঃশেষে সমর্পিত হবার নামই সাধিকার জন্য 'পরম সাফল্যের' সন্ধানলাভ; শুধু সাধিকা নয় গুরুর জন্যও বটে। বলাই বাহুল্য, অধিকাংশ গানেই লালন তাঁর এই কুৎসিত অভিপ্রায়কে গুহ্যতত্ত্বের মোড়কে মহিমান্বিতরূপে পেশ করেন। নমুনাস্বরূপ, 'আগে জানতে হয় গুরুর গুপ্তভেদ গুরুর সকাশে'। চিন্তার কথা, ঘোরতর আতঙ্কেরও কথা, গুরু তাঁর 'নিভৃত সকাশে'

www.pathagar.com

সাধিকা-ভক্তকে কী মধুর গুপ্তধনই-না দান করবেন! লালনের একটি বিখ্যাত গানের কিছু অংশ :

'তিরপিনীর তীর ধরে
মীনরূপে সাঁই বিহার করে
তুমি উপর উপর বেড়াও ঘুরে
সে গভীরে ডুবলে না।
মাস অন্তে মহাযোগ হয়
নীরস হয়ে রস ভেসে যায়
করিয়ে সে যোগের নির্ণয়
মীনরূপে খেল দেখলে না'।

তিরিপিনির অর্থ ত্রিবেণী। অধিক রহস্যজ্ঞান ও রহস্যভেদের আবশ্যকতা নেই, স্বল্পজ্ঞানেই বোঝা যায়, লালন এখানে দেহসাধনার নামে লাম্পট্যের এক আবহ নির্মাণ করেছেন। এক সময় ভারতবর্ষে অনেক চতুর মোহান্ত দেবতার নামে দেবদাসীদের শরীর ভোগ করতো। দক্ষিণভারতে কোন কোন স্থানে এই যৌনাচার এখনো অব্যাহত আছে। লালন এই চতুর মোহান্তদেরই আরো-চতুর এক বাঙ্গালী সংস্করণ। অবশ্য মুসলমান যেহেতু চিরকালই এই ধরনের কামপ্রবৃত্তি ও অবৈধ যৌনাচারকে ঘৃণা করে; শুধু ঘৃণা নয়, ইসলামে যেহেতু এই ধরনের যৌনাচার নিরঙ্কুশভাবে নিষিদ্ধ একটি কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ, লালন ও তাঁর শিষ্যরা সমকালীন আলেমদের দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত-নিগৃহীত হয়েছেন। এবং এজন্যই প্রধানত আত্মরক্ষার্থে এবং এতদসঙ্গে পূর্বসূরীদের উদ্ভাবিত সাংকেতিকতাকে লালন অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে এমন এক কুহক সৃষ্টি করেছেন, যা রীতিমত আতঙ্কজনক। 'অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়, দেখতে যার বাসনা হৃদয়, লালন বলে থেকো সদায়, ত্রিবেণীতে থেকো বসে'। অমাবস্যার চাঁদ অবলোকনের এই 'পরম সৌভাগ্য' লাভে ধন্য হবার ও ধন্য করার জন্য নারীর ত্রিবেণীতে উপবেশন করার কী-অর্থ, তা নিশ্চয়ই খুব দুর্বোধ্য নয়। এ-রকম একটি-দু'টি নয়, লালনের অসংখ্য গান শুধু যৌনাসন ও নরনারীর সংগমপ্রক্রিয়ারই এক-একটি অকথ্য সাংকেতিক রূপছায়া, অকথ্য সংগমচিত্র। যারা গুরুপ্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞানে এই সংকেত ধরতে পারে, তারা 'অধিকারী'; আর সাঁইয়ের গোপন 'গুরুবিদ্যা' ও 'গুপ্ততত্ত্ব' থেকে বঞ্চিত অন্য সবাই 'অনধিকারী'। নিঃসন্দেহে আমরা এই অনধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তবু যেটুকু বুঝি, তাতেই আপাদমস্তক শিউরে ওঠে যে, বড় বদনসীব আমাদের, এমন একজন মানুষকে আমরা মুসলমান বলি, ফকির আউলিয়া বলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি, যার একমাত্র কাজ হলো কদর্য যৌন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার শিক্ষাদান ও বিস্তার।

সংক্ষেপে লেখাটি শেষ করতে চাই; কিন্তু সমস্যা এমন বহুমাত্রিক ও অপরিহার্য যে, একটি একটি করে নানা কথা ভিড় করে আসে। লালনের একটি জনপ্রিয় পান, 'খাঁচার

www.pathagar.com

ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়'। অনেকে বলেন, মানুষের দেহপিঞ্জরে আত্মার আনাগোনার কথা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। আর এই ব্যাখ্যায় কিছু কিছু মানুষ এত মুগ্ধ যে, প্রায় স্নানরত আর্কিমিডিসের মত উলঙ্গ-উন্মাদ হবার উপক্রম। কিন্তু এটা কোন ব্যাখ্যা হলো? সবাই জানে, মানুষের দেহে আত্মার আনাগোনা বলে কিছু নেই; আত্মা একবারই আসে, একবারই বিদায় গ্রহণ করে। কতিপয় পণ্ডিতের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন, রূহ্ বা আত্মা হলো আল্লাহর হুকুম। আসলে 'অচিন পাখি' 'অচিন মানুষ' ইত্যাদি শব্দবন্ধ লালন ব্যবহার করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে। লালনের বিবেচনামতে 'অচিন পাখি ধরার স্থান হলো 'মূলাধারচক্র বা ত্রিবেণীর ঘাট'; অর্থাৎ একেবারে নারীর নিভৃত যৌনাঙ্গ। বস্তুতই, লালনগীতির সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে এই ধরনের কদর্য অশ্লীলতা। তাঁর ব্যবহৃত শব্দ ও শব্দবন্ধসমূহের প্রতি খেয়াল করলে, নিতান্ত সরল 'অনধিকারী' ব্যক্তিও এটা বুঝতে পারে যে, তাঁর গানের মূল প্রতিপাদ্যই হলো যৌনতা। এ-বিষয়ে একটি কৌতুককর তথ্য সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক শ্রী জ্যোতির্ময় দত্ত আমাকে একদা অবহিত করেছিলেন। একজন বিদেশী বাউল-গবেষক প্রণীত লালনগীতিসহ কিছু বাউলগানের একটি চমৎকার ইংরাজী অনুবাদগ্রন্থ যখন কলকাতায় প্রকাশিত হলো, বাউল-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রায় তৎক্ষণাৎই রীতিমত সকৌতুক সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। অথচ ঘটনাটি এমন গুরুতর কিছু নয়, বিদেশী গবেষক ভদ্রলোক 'গোপনচন্দ্র' কথাটির অনুসরণে বইটির নাম দিয়েছিলেন 'Hidden Moon'। সরলার্থে এই অনুবাদ সঠিক, কিন্তু লালন ও বাউলদের পরিভাষায় গোপনচন্দ্রের অর্থ হলো নারীর যৌনাঙ্গ। এ-থেকেই বোঝা যায়, লালন ও তাঁর পূর্বাপর বাউলেরা যে-পরিভাষা ব্যবহার করেন, কিছু অস্পষ্টতার আড়ালে-ঢাকা তার গূঢ় অর্থ একেবারে সরাসরি যৌনতার বাহন। আর লালন এক্ষেত্রে এমন এক অপরাজেয় ওস্তাদ যাঁর কোন তুলনাই হয় না। লালন আসলে গানের নামে, সূফীতত্ত্ব ও মরমিয়া আধ্যাত্মিকতার নামে পর্নোগ্রাফীর এক দক্ষ কুশলি উপস্থাপক। 'অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়' 'কারণবারি' 'রসরতি করে চলাচল' 'ধরো চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে' 'মহাযোগ' 'মীনরূপে সাঁই খেলে' 'চাঁদে চাঁদে গ্রহণ', 'নীরে ক্ষীরে মিশায়', 'রসিক ময়রা' 'মাস অন্তে সুদৃষ্টি রাখে', 'বারামখানা', 'দশ দুয়ারি মানুষ মক্কা' 'অধর চাঁদের স্বর্গপুরী', 'টলঅটল', 'চারিচন্দ্র' 'নিভে যায় আগুনের ঘর'—এসব অশ্লীল অসামাজিক কথা ও কথামালা নিয়েই লালন ও লালনগীতি।

নিশ্চিত অনুমান করি, আমার এই আলোচনায় কিছু গবেষক, কিছু কিছু সংস্কৃতিপ্রেমী বড় কষ্ট পাবেন; এবং এ-কথাও অনুমান করি, মুসলমানের ঈমান-অপহরণে খুবই তৎপর কিছু তথাকথিত উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীর মধ্যে প্রবল উষ্মা ও ক্রোধের উদ্রেক ঘটবে। কিন্তু কিছুই করার নেই। লালন একদা আমারও অত্যন্ত প্রিয় ছিল; এতটাই প্রিয় যে, আমার একটি বইয়ে (বাংলাগানের সুখ, দুঃখ, হাক্কানী পাবলিশার্স প্রকাশিত) তাঁকে নিয়ে দু'টি প্রবন্ধও লিখেছিলাম, যা-থেকে ওপার বাংলার বিশিষ্ট লেখক

www.pathagar.com

সুধীর চক্রবর্তী তাঁর লালন বিষয়ক 'ব্রাত্য লোকায়ত লালন' নামক প্রণীত একটি অনবদ্য গ্রন্থে কিছু সপ্রশংস উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু আল্লাহপাক তাঁর স্বীয় অনুগ্রহে আমার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ঈমানী-বিবেচনা দান করেছেন, লালনের প্রতি আমার নিরর্থক পূর্ব-অনুরাগের প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। বর্তমান প্রবন্ধটি আমার সেই অনুতাপতাড়িত কষ্ট ও প্রায়শ্চিত্তেরই লেখ্যরূপ। কোন্ গবেষক, কোন্ লালনপ্রেমী কী ভাবলেন, এ-নিয়ে আমার আদৌ কোন দুর্ভাবনা নেই; আল্লাহপাকের ক্ষমা ও মাগফেরাতই আমার এই রচনার একমাত্র লক্ষ্য। আসলেই লালন ও লালনের গান যে, সামাজিক ও নৈতিক বিবেচনায় কত গর্হিত ও কত গুরুতর, বিশেষ করে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কী-এক দীর্ঘস্থায়ী ফিত্না—লালনপ্রেমী গবেষক-বুদ্ধিজীবীদের তা অজানা নয়। তবু তাঁরাই কেউ কেউ বলেন, লালনের সাধনা দেহতাত্ত্বিক বটে, কিন্তু দেহ থেকে দেহাতীতের দিকে তাঁর সাধনযাত্রা। এবং তাঁরা কেউ কেউ জ্ঞানত বা অজ্ঞতাবশত নির্ভয়ে এতদূর অগ্রসর হন যে, লালন-দর্শনকে রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র হাদীসের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেও দ্বিধা করেন না। তাঁরা প্রায়ই উল্লেখ করেন, 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ্ আরাফা রাব্বাহু'-নিজেকে চিনলেই আপন প্রভুকে চেনা যায়। অথচ এটা কোন হাদীসই নয়, এটা পরবর্তীকালের কোন বুজুর্গের উক্তি। আফসোস, তারা জানে না, কথা যত উৎকৃষ্টই হোক, যারা রাসূল (সাঃ)-এর নামে কোন কথা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ব্যবহার করবে, তাদের ঠিকানা অবধারিত জাহান্নাম। শয়তানের কুপ্ররোচনা ও প্রবল আত্মস্বার্থবশত লালনের মহিমাপ্রচারে কেউ কেউ-যে কত দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারে, উদ্ধৃত আরবি-বাক্যটির এই মতলবি-ব্যবহার তারই প্রমাণ। আল্লাহপাক বলেন 'ওয়ালা তাক্রাবুজ্জিনা'- তোমরা জেনার নিকটবর্তী হয়ো না। রাসূল (সাঃ)ও বলেছেন - তোমরা আমাকে জিহ্বা এবং যৌনাঙ্গ, এই দু'টি বস্তু হেফাযতের গ্যারান্টি দাও, আমি তোমাদেরকে জান্নাতের গ্যারান্টি দেব। পবিত্র কুরআনুল করীম ও পবিত্র হাদীসের সুস্পষ্ট নিষেধসত্ত্বেও, গোপনাঙ্গের হেফাযত-তো দূরের কথা, লালনের কাছে গোপনাঙ্গই হলো সার্বক্ষণিক তপস্যাভূমি, সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট বিচরণক্ষেত্র, উপায় ও উপকরণ। কিন্তু রিরংসাচালিত গোপন প্লেবয় এই লালন ফকির নামকক্ষ ণজন্মা 'মহান মরমিয়া সাধক' এর সবকিছু জেনেও যাঁরা সরব সমর্থক ও সবিশেষ অনুরাগী, তাঁদের সম্পর্কে কী বলা যায়? অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু তা যথেষ্ট হবে না, যথাযথও হবে না। বরং আল্লাহপাক স্বয়ং এই জ্ঞানপাপীদের উদ্দেশ্য করে যা-বলেন, সেই পবিত্র আয়াতটিই উদ্ধৃত করি, 'ফা ইন্নাহা লা তাআমাল আবছারু ওয়ালা কি তাআমাল কুলুবুল্লাতি ফিছ্ছুদুর'-বস্তুত চোখ-তো অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয় (সূরা হজ্ব)।

অনেকে বলতে পারেন, কেউ কেউ বলেনও—লালন-যে এমন প্রভাব বিস্তার করলেন, খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন দুর্বারভাবে, তা একেবারে শুধু শুধু নয়; পরম কোন 'বস্তু' নিশ্চয়ই লুক্কায়িত আছে। এবং এই 'বস্তুর' সন্ধান করা আমাদের কর্তব্য। 'বস্তুও' আছে এবং তার সন্ধানলাভে ব্রতী হওয়া 'কর্তব্যও' বটে; বর্তমান নিবন্ধকার নিজেও একথা

www.pathagar.com

স্বীকার করেন। আর সে মহামূল্যবান 'বস্তুসমূহ' যে কী-জিনিষ, বর্তমান প্রবন্ধে সেই কথাই আলোচিত হয়েছে। আসলে নিষিদ্ধের প্রতি আকর্ষণ মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, লালন যেহেতু সবদিক থেকেই নিষিদ্ধের প্রবক্তা ও রূপকার, তাঁর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। উপরন্তু আমাদের বিবেচনাবোধও সুষ্ঠু নয়, বরং নিদারুণভাবে বিভ্রান্তির শিকার। অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতা, পদ-পদবি, পুরস্কার-সম্মাননা, খ্যাতি-প্রসিদ্ধি-এসব দিয়েই আমরা মানুষের মূল্য ও গুণাগুণ বিচার করি। আধুনিক বিশ্বের বড় দুর্ভাগ্য, সত্যমিথ্যা, বিশ্বস্ততা কি প্রতারণা, ঈমান বা মুনাফেকী—এ-সব এখন আর আদৌ কোন বিচার্য বিষয় নয়। কিন্তু সবাই না-মানুক, কেউ কেউ মানে, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি কোন মানদণ্ড নয়, প্রকৃত মানদণ্ড হলো সত্য। একজন বুজুর্গ খুব সুন্দর করে বলেন, - স্বর্ণখণ্ড নর্দমায় পড়ে থাকলেও সেটি স্বর্ণ ; আর ধূলিকণা আসমানে উঠে গেলেও সে ধূলিকণাই থাকে। অতএব লালন ফকিরের কবিত্ব নিয়ে যত যাই বলা হোক, এমনকি তিনি যদি নোবেল পুরস্কারও লাভ করেন, (মৃত ব্যক্তিকে এই পুরস্কার প্রদানের নিয়ম নেই) কিছুই এসে যায় না। লালন লালনই। এজন্যই লালন যতবড় মহাকবিই হোন, যত উচ্চাসনেই তাঁকে বসানো হোক, লালনগীতির 'মহিমা' ও নান্দনিকতায় আমরা যতই-না অভিভূত হই, আসলে তাঁর প্রকৃত পরিচয় বড় দুঃখজনক, তাঁর পারলৌকিক পরিণতিও দুঃখজনক। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গুনাহ কি সওয়াব দুটোরই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কিছু মানুষের কিছু কিছু কাজের সওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকে; এবং অনুরূপভাবে অনেক মানুষের অনেক অপকর্মপ্রসূত গুনাহ্ও জারি থাকে কেয়ামত পর্যন্ত। লালন ফকির এই শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে বিদআত্ একটি জঘন্য মহাপাপ, লালন নিঃসন্দেহে বিদআতী; ইসলামে যৌন-অনাচার ঘোরতরভাবে নিষিদ্ধ, লালন এই অশ্লীল ও পাপপংকিল নিষিদ্ধ জগতের বাসিন্দা ; আল্লাহ এবং রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে যারা খেয়াল-খুশিমত বাক্য-পংক্তি নির্মাণ করে তারা জিন্দিক, লালন এই ধরনেরই এক নিকৃষ্ট জিন্দিক ; ইসলামে শিরক অমার্জনীয় অপরাধ, নব নব শিরকের প্রবক্তা ও উদ্ভাবক লালন সাঁই একজন বিশুদ্ধ মুশরিক। আর এতগুলো 'উৎকৃষ্ট সদ্গুণের' যিনি অধিকারী, সেই পরম সাধকের নির্ভুল গন্তব্যস্থল-যে অগ্নিময় জাহান্নাম, তা বলাই বাহুল্য। এবং এই ধরনের কবি ও তার ভক্ত-অনুগত উপাসকদের সম্পর্কেই আল্লাহপাক ঘোষণা করেন - 'আমি কি বলবো, শয়তান কাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে? শয়তান আসে অসৎ ও মিথ্যাবাদীর কাছে, এসে আজগুবি মিথ্যা পৌঁছে দেয়; এবং তারা (শয়তান যাদের কাছে আসে) অধিকাংশই ডাহা মিথ্যাবাদী। আর পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই কবিদের অনুসরণ করে' (সূরা শুয়ারা)।

পালাবদল : অক্টো ২য় পক্ষ, নভে : ১ম পক্ষ' ৯৮
ইনকিলাব : (পরিবর্ধিতরূপে) ডিসে: ৩১ '৯৮; জানু : ৭ '৯৯

www.pathagar.com

লালন : কতিপয় গুরুতর প্রসঙ্গ এবং আরো কথা

এক

পাক্ষিক 'পালাবদল' সংক্ষেপে এবং পরে 'দৈনিক ইনকিলাব'এ অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে লালন সম্পর্কে আমি আমার মতামত অকপটে তুলে ধরেছিলাম। আমি বলেছিলাম, লালন নি:সন্দেহে একজন বড়-মাপের কবি, এবং বহু মানুষের কাছে একজন 'আউলিয়া' সদৃশ উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক সাধকও বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শির্ক বিদআত ও গোমরাহির এক চূড়ান্ত নমুনা। তাঁর মতবাদ আপাতদৃষ্টিতে বর্তমান বাঙ্গালী-সংস্কৃতিপ্রেমীদের কাছে, যে-কোন কারণেই হোক, যত মূল্যবান ও মরমিয়া ধনাঢ্যতার পরিচয়ই বহন করুক, লালন আসলে মুসলমানের আকীদা ও ঈমান-বিধ্বংসী এক জঘন্য মহানায়ক। তাঁর ও তাঁর গানের প্রতি সামান্যতম দুর্বলতা পোষণ করাও ইসলামের দৃষ্টিতে ভয়াবহ অপরাধ। শুধু অপরাধ নয়, লালনের বক্তব্যের সঙ্গে ক্ষীণভাবেও যদি ঐকমত্য পোষণ করা যায়, ঈমানই থাকে না। অতএব বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি অনুগত তওহিদবাদী যে-কোন মুসলমানের কাছেই-যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ—এই কথাটাই আমি আমার পূর্বের আলোচনায় উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলাম। যা বলেছিলাম, তা-ছিল আমার দিক থেকে এমন চূড়ান্ত অভিব্যক্তি, যার পরে আমার অন্তত আর নতুন করে কিছু বলবার ছিল না এবং এখনো নেই। তবু এ-বিষয়ে আবার নতুন করে লিখতে হচ্ছে অপরিহার্য দু'টি কারণে।

প্রথমত, 'লালন ও কতিপয় গুরুতর প্রসঙ্গ' লেখাটি 'দৈনিক ইনকিলাব'এ 'শিল্প সংস্কৃতি' পৃষ্ঠায় পর পর দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হবার পর, অনেক পাঠক আমাকে চিঠি, টেলিফোন ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতে সপ্রশংস মোবারকবাদ জানিয়ে বিষয়টি আরো কিছুটা বিশদভাবে ব্যাখ্যার দাবী জানিয়েছেন। অবশ্য দু'একজনকে আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধেও পেয়েছি। যেমন কলমাকান্দা নেত্রকোনা থেকে একজন একটি কৌতুককর চিঠিতে আমার যথেষ্ট 'তাসাউফি জ্ঞান' না-থাকার দরুন, আমাকে তাঁর কোন এক 'মারেফাতী হুজুরের' শরণাপন্ন হবার 'সুপরামর্শ' দিয়েছেন। প্রস্তাবটি হয়ত 'উত্তম'; কিন্তু আমার যেহেতু মারেফাত হাসিলের কোন অভিপ্রায় নেই এবং আমি যেহেতু আকাশে জায়নামাজ বিছিয়ে সালাত আদায় করতে চাই না, ভদ্রলোকের পরামর্শ আমি সহাস্যে অবজ্ঞা করেছি। কারণ ইসলামকে বুঝবার জন্য, একজন ঈমানদারের যা-প্রয়োজন, তাহলো পূর্ণ অনুরাগ ও আনুগত্য নিয়ে কুরআনুল কারীম, সহীহ হাদীসসমূহ এবং সাহাবা (রাঃ)দের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে এমন লেখক-বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা অপ্রতুল নয়, যাঁরা প্রায়-গঞ্জিকাপায়ী লালনশিষ্যদের মতই বা তদপেক্ষাও অধিক লালনপ্রেমী। এবং তাঁদের অনেকে সানুরাগ লালনভক্তির কারণে ডক্টরেট উপাধিও করায়ত্ত করেছেন। আমি সতর্ক প্রতীক্ষায় ছিলাম ; কিন্তু আমার লেখা প্রকাশিত হবার পর অনেকদিন

www.pathagar.com

অতিক্রান্ত হলেও, অদ্যাবধি কোথাও কোন প্রতিবাদ দৃষ্টিগোচর হয়নি। এটা একটা শুভ লক্ষণ। শুভ এই কারণে যে, লালনকে নিয়ে অনেকের মধ্যে অনেক ভুলধারণা ও গর্হিত অনুরাগ প্রশ্রয় লাভ করলেও, তাঁরা ইসলামের মৌলদাবীকে তাচ্ছিল্য করে লালনপ্রেমের নামে পুরোপুরি বেঈমান 'ন্যাড়ার ফকিরে' পরিণত হতে চান না, পারেনও না। আল্লাহপাক তাঁদেরকে হেফাযত করুন। আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য, কেউ কেউ আমার বিরুদ্ধে এই সংগত অনুযোগও উত্থাপন করেছেন, 'আপনারাই-তো দিনে দিনে লালনকে মাথায় তুলেছেন, আর-কি এখন তাকে স্ব-স্থানে নামিয়ে আনা সম্ভব'! যাই হোক, এই সকল নানা ধরনের বক্তব্য ও তৎসঙ্গে চিহ্নিত সুশিক্ষিত লালনপ্রেমীদের নীরবতার কারণে, লালনের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে আরো একটু বিশদভাবে আলোচনা করা একটি জরুরি কাজ বলে জ্ঞান করি। এবং এই হেতুই প্রায় একই শিরোনামে এই লেখাটির পুনঃঅবতারণা।

যাঁরা লালনের প্রতি আমাকে আমার পূর্বপ্রণয় ও ভূমিকার কারণে ভর্ৎসনা করেন, আমি তাঁদেরকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। এই তিরস্কার আমার প্রাপ্য। তবে যেহেতু, অনেক বিলম্বে হলেও লালনের অশ্লীলতা ও পাপপরিকীর্ণ গানের 'মহত্ত্ব' থেকে আল্লাহপাকের অশেষ রহমতে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়েছি, এজন্য ঈষৎ সাধুবাদও আমার প্রাপ্য। আসলে এ-রকম ঘটে। মক্কার যে-কাফেররা একদা নানা দেবদেবীকে আন্তরিক শ্রদ্ধায় যুগ যুগ ধরে অর্ঘ নিবেদন করতো, তারাই স্বহস্তে সে-সব 'আদরণীয়' দেবদেবীকে ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সত্যের সংস্পর্শে আসা মাত্র আমারও বহুদিনের অন্ধকার জীবন থেকে লালনপ্রীতি বিদূরিত হয়েছে ; বিলম্বে হলেও এজন্য আমি নিজেকে আল্লাহর অনুগ্রহভাজন বলে অনুভব করি। আর এটাই-তো চূড়ান্ত সত্য, 'ওয়াকুল জাআল হাক্কু ওয়া জাহাকাল বাতিলা, ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা' সত্যের আগমনে বাতিলের বিলুপ্তি ঘটেছে, নিশ্চয়ই বাতিলের বিলুপ্ত হওয়ারই কথা (সূরা বনি ইসরাইল)। অতএব লালনকে অন্য কারো মাথা থেকে নামানো যাক না-যাক, আমি-যে এই বাতিল প্রহেলিকা থেকে উদ্ধার পেয়েছি, এটা আল্লাহর রহমত।

লালন ফকিরের গান যে শিল্পকর্ম হিসেবে অনবদ্য, এ-বিষয়ে তার ঘোরতর কোন শত্রুও দ্বিমত পোষণ করেন না। এবং কোন সন্দেহ নেই, লালনগীতি-যে একটি বিশেষ জনপ্রিয় সঙ্গীতধারা হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তারও মূল কারণ, এই গানের অপরাজেয় সুষমা ও নান্দনিকতা। কিন্তু মুসলমানের কাছে নান্দনিকতাই একমাত্র বিচার্য নয়। অশ্লীলতা, আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস, বহু দেবতার আরাধনা, নারীদের পাবলিক প্রপার্টিতে পরিণত হওয়া, যৌনতা বহুগামিতা—এ-সবও নান্দনিকতার মোড়কে পরিপাটিরূপে পেশ করা সম্ভব; কিন্তু বিষভর্তি এই নান্দনিকতার পেয়ালা ইসলাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। যা মানুষকে আকৃষ্ট করে অশ্লীলতার দিকে, যৌনতার দিকে,

www.pathagar.com

ঈমান ও আখেরাত-বিধ্বংসী খোদাদ্রোহিতার দিকে, সেই নান্দনিকতার এক পয়সা মূল্য অন্তত ইসলামে নেই। বরং এই ধরনের গর্হিত শিল্পকর্মকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করাই ইসলামের দাবী। আমি আমার 'লালন ও কতিপয় গুরুতর প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে এই কথাটাই বলতে চেয়েছি। যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার উপাসক, অশ্লীলতাই যাদের জীবনের প্রিয়তম উপজীব্য, ধূর্ত-আধ্যাত্মিকতার নামে অবৈধ দেহসম্ভোগই যাদের লক্ষ্য অথবা লালনকে নিয়ে সহজে উচ্চতর উপাধিলাভে যারা ধন্য ও উপকৃত, আমার আলোচনা তাঁদের মধ্যে কষ্ট ও উষ্মার সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু ইসলামের ন্যূনতম দাবীর প্রশ্নেও এই 'মহিমান্বিত মহাকবির' যে কোন স্থান নেই, এ-বিষয়ে তাঁরা অবশ্যই আমার সঙ্গে একমত। মওলানা মুহিউদ্দীন খান 'দারুস সালাম' পত্রিকায় একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ইসলামের বিরুদ্ধে বাউলও একটি অন্যতম ফিত্না। ইংরেজরা এদেশে আসার পর নানারকম অপতৎপরতার মত এই জঘন্য ফিত্নাটিও প্রবল রূপ ধারণ করেছিল। মওলানা সাহেবের কথা সর্বাংশে সঠিক; আর এই নোংরা ফিত্নার প্রতাপান্বিত সম্রাট হলো লালন সাঁই।

বিষয়টি একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বহু শতাব্দীব্যাপী মুসলিম শাসিত এই উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের প্রারম্ভকাল থেকেই মুসলমানদের ক্রোধ, রোষ ও বিদ্রোহের বহি:প্রকাশ ঘটতে থাকে। হিন্দুরা যদিও বৃটিশ শাসনকে সঙ্গে সঙ্গেই স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু মুসলমান বৃটিশ-বিরোধিতাকে ফরজ বলে জ্ঞান করেছে; এমনকি বহু প্রভাবশালী আলেম ও সামন্তরাজা দেশকে তখন বিধর্মী-কবলিত 'দারুল হারব' ঘোষণা দিয়ে সারা দেশে জিহাদের পয়গাম ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবং এরই চূড়ান্ত রূপ ওয়াহাবী ও ফরাআজী আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহ। এই সশস্ত্র বিরোধিতার মোকাবিলায় তখন ইংরেজ একেবারে উন্মাদপ্রায়। তারা অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যদল ও কিছুসংখ্যক গাদ্দার ভারতবাসীর সহায়তায় মুসলমানদের জিহাদী আন্দোলনকে বহুলাংশে প্রশমিত করেছে সত্য, কিন্তু ভয় ও উদ্বেগ দূরীভূত হয় নি। ইংরেজ তখন কিছু মুরতাদ, কিছু কোরআনের অপব্যাখ্যাকারী খরিদকৃত আলেম ও নানা বর্ণের পথভ্রষ্ট গাদ্দারদের নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির নব নব চক্রান্ত রচনা শুরু করলো। এই কূট চক্রান্তেরই বিষবৃক্ষ বাহাই সম্প্রদায়ের বাহাউদ্দিন, কাদিয়ানিদের গোলাম আহমদ এবং বাংলা মুলুকে বাউল শিরোমণি লালন সাঁই। এদের কাজই হলো, মুসলমানদের জিহাদী প্রেরণাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা এবং যথাসম্ভব ইসলামের মৌলদাবী ও আকীদাকে বিনষ্ট করে খুব চাতুর্যের সঙ্গে মুসলমানকে এক ক্লীব, ভীরু ও প্রায় নপুংসক মুশরিকে পরিণত করা। এক্ষেত্রে তারা কিয়ৎপরিমাণে সাফল্যও লাভ করেছে; কেউ হয়েছে 'নবী' কেউ ইসলামের ত্রাণকর্তা 'তাসাউফী ইনসানই কামিল', আর আমাদের আলোচ্য লালন হয়েছে গভীর আধ্যাত্মিকতার পথনির্দেশক এক দেহবাদী অশ্লীল 'আউলিয়া'। এবং এই আউলিয়া-যে খুবই সতর্কতার সঙ্গে নিজের জন্মপরিচয়কে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তার

www.pathagar.com

একটি অন্যতম হেতু এ-ও হতে পারে যে, পরিচয় প্রকাশ পেলে তার গোপন লক্ষ্য ও চক্রান্তের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়বে। কেউ কেউ এ-নিয়ে তর্ক তুলতে পারেন, কিন্তু তর্ক করে লাভ কী?

সত্যই তর্ক করে আদৌ কোন লাভ নেই বরং সমূহ ক্ষতি। কারণ লালনে কি এমন একটিও গান আছে, যা মুসলমানের অপরিহার্য বিশ্বাস ও শরিয়ত, আমল ও আকীদার সমধর্মী? নেই। এমনকি 'ইলাহি আলমিন গো আল্লাহ' বলে দৈন্যপদের যে-গানটি আপাতদৃষ্টিতে ইসলামী বলে মনে হয়, সেখানেও হজরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া (রহঃ)কে প্রচণ্ড বেআদবী ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলা হয়, 'নিজাম নামে এক বাটপাড় সে তো, পাপেতে ডুবিয়া রইতো।' শুধু ঔদ্ধত্য নয়, কঠিন অজ্ঞতাও বটে; কারণ জনশ্রুতি যাই হোক, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হজরত নিযামুদ্দিন ছিলেন বরাবরই ইসলামের জিহাদী চেতনায় উদ্দীপিত ও প্রতিবাদী এক আধ্যাত্মিক অগ্নিপুরুষ। নামাজ সম্পর্কেও এই 'আউলিয়া' (লালন) মহোদয়ের বক্তব্য বড় চমৎকার! যে-নামাজ ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, যে-নামাজ মুসলমান ও বিধর্মীদের মধ্যে পার্থক্য-নির্দেশক, যে-নামাজ দশ বৎসর বয়:ক্রমকাল থেকে ফরজ এবং যে-নামাজ সম্পর্কে বান্দাহ আখেরাতে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসিত হবে—সেই নামাজকে নিয়ে লালনের কী-চতুর বালখিল্য উক্তি 'পড়গা নামাজ জেনে শুনে'। অর্থাৎ 'জানাশুনাও' হবে না, আর নামাজও পড়া লাগবে না। নামাজ থেকে মুসলমানকে দূরে রাখবার কী অপূর্ব ইবলিসী কৌশল! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেশ অনেক বছর আগে আমাদের কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব আবদুল লতীফ চৌধুরীর সঙ্গে একবার লালনের আখড়ায় গিয়েছিলাম। অধ্যক্ষ চৌধুরী ধর্মপ্রাণ মানুষ; তিনি আখড়ার খাদেমকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা নামাজ পড়েন?' খাদেম মানুষটি খুব বিনয়ী ও বাকপটু; সে কিছুমাত্র আড়ষ্ট কি বিচলিত না-হয়ে তৎক্ষণাৎ খুব আস্থার সঙ্গে বললো, 'আমাদের নামাজ হলো এক রাকাত'। জনাব চৌধুরী একটু স্মিত হেসে নীরব হয়ে গেলেন। আমাদের মনে হলো, কোথায় যেন অনেকখানি যৌনতার গন্ধ! পরে দু'একজন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জেনেছি, এই 'এক রাকাতের' মর্মার্থ হলো, নারীদেহকে জায়নামাজ জ্ঞানে যৌনসম্ভোগ (নাউজুবিল্লাহ)। এবং এটা ধারণামাত্র নয়, লালন এই রকমই বুঝিয়েছেন, অন্যথায় কেন বলবেন 'আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে'। এই হলো লালন ও লালনের কাছে দীক্ষাগ্রহীতা শিষ্যপ্রশিষ্যদের মহার্ঘ কামালিয়াত!

দুই

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, লালনের বহু গান আমি প্রায় শল্যচিকিৎসকের মত ব্যবচ্ছেদ করে করে দেখেছি; সেখানে আর যাই থাক, ইসলামের নামগন্ধও নেই। বরং যা-আছে, তা মুসলমানের ঈমান ও আকীদার জন্য এতই ভয়ংকর যে, তার প্রতি যৎসামান্য দুর্বলতা পোষণ করলেও নিশ্চিতভাবে মুশরিক ও মুনাফিকদের দলভুক্ত হয়ে

www.pathagar.com

যেতে হয়। অবশ্য তারপরও আমি সর্বাংশে আমার নিজস্ব বিবেচনার উপরই নির্ভর করি নি; বিশিষ্ট গবেষক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি অধ্যাপক ড: আবুল আহসান চৌধুরী আমাকে অনেক বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছেন। ডক্টর চৌধুরী লালনের প্রতি সবিশেষ অনুরাগী; এবং তাঁর অনুরাগ এতটাই প্রবল যে, বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত তাঁর 'লালন শাহ' গ্রন্থে তিনি প্রথমে-যে 'লেখকের নিবেদন' পেশ করেছেন, সেই নিবেদন তিনি শেষ করেছেন 'আলেক সাঁই' শব্দবন্ধটি দিয়ে। কুষ্টিয়ার অত্যন্ত বনেদী ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেধাবী সন্তানটির এই নিরর্থক লালনভক্তি আমাকে পীড়িত করে, কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। ড: চৌধুরীর যেটা প্রীতিকর ও প্রশংসনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য, তা হলো কোনো রাগ-অনুরাগ বা কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধির আশঙ্কাবশত তিনি কখনো সত্যকে আড়াল করতে প্রলুব্ধ হন না। আমি তাঁর দ্বারা বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছি; অনেক সত্যকথা তিনি এমন অকপটে আমাকে জানিয়েছেন, যার দ্বারা থিকথিকে লালনপ্রীতির বিপজ্জনক দংশন থেকে বহু মুসলমানের জন্য আত্মরক্ষার একটা পথ তৈরী হতে পারে। আল্লাহপাক আবুল আহসান চৌধুরীকে অন্তত এই কাজটির জন্য হলেও পার্থিব ও পারলৌকিক কামিয়াবী দান করুন, এই দোয়া করি।

লালনকে যারা মারেফাতের সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত একজন আউলিয়া বলে বিবেচনা করেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে লালনগীতির কিছু কিছু পংক্তি তুলে ধরলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি ইসলামের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাতে ওস্তাদ এমন এক নিপুণ ও মারাত্মক আউলিয়ারূপী আততায়ী, যার কাছে এমনকি নবুয়তের নোংরা দাবীদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানিও যথেষ্ট ছেলেমানুষ। অবশ্য লালন যদি রবীন্দ্রনাথ কি নজরুল কি অতুলপ্রসাদের মত শুধুই কবি বা সঙ্গীতকার হতো, কিছু বলার ছিল না, বলার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ অতি নগণ্য ব্যতিক্রম ছাড়া, গান-তো তার স্বভাবী নিয়মেই মানুষকে অল্পাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে। এবং প্রায়শ যেহেতু আমাদের লাভ-ক্ষতির হিসাবের মধ্যে যথেষ্ট গরমিল বিদ্যমান, শৈল্পিক সুষমা ও নান্দনিকতার নামে এই ক্ষতি আমরা অনেকে মেনেও নিয়েছি। কিন্তু লালন যেহেতু গানের আড়ালে মুসলমানের পার্থিব ও পারলৌকিক সর্বনাশ-সাধনে এক বিশুদ্ধ ইবলিসী-পথের রাহ্‌বার, ইসলামের তওহিদী-ঐশ্বর্যের এক ঘোরতর দুশমন, ইসলামের সকল নীতি ও নৈতিকতাকে ভেঙ্গে দিয়ে এক নোংরা নর্দমা সৃষ্টির রূপকার, তার মুখ ও মুখোশের পরিচয় তুলে ধরা তাই একটি জরুরি কাজ। অবশ্য আল্লাহপাকের ঘোষণা, 'যারা অন্ধ, মূক ও বধির' 'যাদের বক্ষস্থিত কল্‌ব একেবারে মৃত' তারা আর ফিরবে না। কিন্তু অনেক মুসলমান-তো এমনও আছে, যারা অসতর্কতাবশত ভুলক্রমে ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত; তাদের পক্ষে লালনের গর্হিত সম্মোহন ছিন্নকরত ইসলামের কাছে ফিরে আসা অসম্ভব নয়। লালন-যে সত্যই কত বড় 'আউলিয়া' তার কিছু পরিচয় তার কিছু বিখ্যাত পংক্তির মধ্য দিয়ে পেশ

www.pathagar.com

করতে পারি। 'অনাদির আদি শ্রী কৃষ্ণ নিধি' 'আর কি গৌর আসবে ফিরে' 'গোঁসাই আমার দিন কি যাবে এই হালে' অথবা 'গৌর কি আইন আনলে নদীয়ায়' 'দয়াল নিতাই আমার ফেলে যাবে না'-এই সকল গান থেকে কী প্রমাণিত হয়? শ্রীকৃষ্ণ, গৌর গোবিন্দ, নিতাই, গুরু গোঁসাই-এসব নিয়ে যার ভক্তির দরিয়া 'রসরতির' কামক্রীড়ায় সর্বদা তরঙ্গমুখর হয়ে থাকে, ইসলাম থেকে তার অবস্থান-যে কত দূরবর্তী, তার ভূমিকা-যে কত সাংঘর্ষিক, তা-নিয়ে বিতর্কের অনুমাত্র অবকাশ নেই।

অনেকে বলবেন, লালনের যে-বিশাল দর্শন, সঠিক অনুধাবন-ক্ষমতার অভাবহেতু আমি তার গভীরে প্রবেশ করতে পারি নি। আসলে দেহ থেকে দেহাতীতের দিকে যাত্রা, সসীম দেহভাণ্ডের মধ্যে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অনুসন্ধানই লালন-দর্শনের মহিমা। এর সঙ্গে সাধারণ যৌনতার সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। যেহেতু 'ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই', তাকে পরম 'ভক্তিভাব' নিয়ে দেহকে পূজার নৈবেদ্য করে সমর্পণ করাই-তো 'সাধনসিদ্ধির' একমাত্র উপায়। এই উপায়েই 'হাওয়ার ঘরে' চোরকে বশে আনা যায়, দৃষ্টিগোচর হয় রসসমুদ্রে ভাসমান 'সোনার মানুষ' 'মনের মানুষ' ও 'গুরু গোঁসাই'য়ের 'অটল রূপ'শ্রী। দেহটা উপকরণ মাত্র, লক্ষ্যটা অনেক দূরের জিনিষ। অতএব না-বুঝে লালনকে অভিযুক্ত করা খুবই অসমীচীন, খুবই অর্বাচীনতা। আমার অক্ষমতা আমি স্বীকার করি। এত দূরের জিনিষ এত গভীর জিনিষ, আমার পক্ষে অনুধাবন করা সত্যই অসম্ভব। ড: আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর 'লালন শাহ' গ্রন্থে অনেক দেখে-শুনে ভেবে-চিন্তে খুব অকপট ও নির্মোহচিত্তে বলেছেন, 'বাউলের সাধনায় যোগতন্ত্র মৈথুন ও সহজ সাধনার ধারা এসে মিলেছে', এবং প্রফেসর চৌধুরী বাউলদের নিখাদ পরিচিতি সম্পর্কে ড: আহমদ শরীফের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুচিন্তিত চূড়ান্ত কথাও উল্লেখ করেছেন, 'বাউলেরা রাগপন্থী। কামাচার বা মিথুনাত্মক যোগ সাধনাই বাউল পদ্ধতি'। বলাই বাহুল্য ড: আবুল আহসান চৌধুরী বা ড: আহমদ শরীফ, তাঁরা কেউই লালনের মর্তবা ও গুপ্ত-ঐশ্বর্যের আধ্যাত্মিক মহিমা নিয়ে অন্য অনেকের মত একপেশে কথা বলতে চান নি। তাঁরা লালনের সর্বতোমুখী পরিচয়, ভালো-মন্দ উভয় দিকই পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। তাঁদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ। তাঁদের নিরপেক্ষ মতামতের মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, লালন আসলে ছিল একজন কামাচারী ও মিথুনাত্মক সাধনার 'গুরুগোঁসাই', অশিষ্ট অভিধায় একজন প্রকৃত লম্পট। আর আমি যেহেতু নিরপেক্ষ নই, ধর্মনিরপেক্ষও নই; আমি যেহেতু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর পথনির্দেশকেই চূড়ান্ত বিবেচনা করি, আমার পক্ষে জেনেশুনে লালনের বিপজ্জনক অনিষ্টকারিতার সম্মুখে নির্বাক মৃতের ভূমিকা পালন করা অসম্ভব। এই ধরনের নীরবতা ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুতর ও অমার্জনীয় অপরাধ, রীতিমত কবীরা গুনাহ্। অতএব 'চারিচন্দ্রভেদের' এই দিশারী, 'ত্রিবেণীতে মীন ধরা' এই গুরুসাধক যে-'রসরতি' 'নীর-

www.pathagar.com

ক্ষীর' বা 'রজ:শুক্র' 'নাদ বিন্দুর' গুপ্ততত্ত্ব নিয়ে এক মরমিয়া আবহ সৃষ্টি করে, আমরা তাকে 'মিথুনাত্মক এক গূঢ় সাধন প্রক্রিয়া' বলে অভিহিত করতে পারি; আমরা বলতে পারি, অদীক্ষিতের কাছে এটা যাই মনে হোক, আসলে এই দেহবাদের অন্ত:স্থলে রয়েছে অসীম-অনন্ত এক আধ্যাত্মিক পিপাসা ও মুক্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যত যাই বলি, বস্তুত এটা এক চূড়ান্ত ভ্রান্তি ও কুৎসিত যৌনাচার এবং কামাকীর্ণ অশ্লীলতা। এবং এটা আরো বেশি মারাত্মক এই জন্য যে, নিষিদ্ধ কামক্রীড়ার প্রতি মানুষ এমনিতেই বড় দুর্বল। তদুপরি সর্বতোভাবে হারাম এই 'প্রিয়কর্মটি' যদি সম্পূর্ণ হারাম হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের ছদ্মবেশে সজ্জিত হয়, পরিধান করে 'হকিকত-তরিকতের' কপট আলখাল্লা, তাহলে সেটা-যে কত বিপজ্জনক, ইসলামকে যারা ন্যূনতম মাত্রায়ও ভালোবাসেন, তাঁদের উচিত এটা অনুধাবন করা।

কোনো কোনো ধর্মে আছে, মানুষকে তৃপ্তি দান আসলে স্বয়ং নারায়ণকেই সুখী করা; কারণ অলক্ষ্যে থেকে নারায়ণই তৃপ্তিলাভ করেন, অতএব এটা বিশুদ্ধ 'পুণ্যকর্ম'। কিন্তু আমাদের আলোচ্য লালন এক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি অগ্রসর হয়ে লাভ করেছেন 'পূর্ণ কামিয়াবী'; যিনি কিছু মানুষকে প্রায় অক্লেশে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, এই গুপ্ত শরীরী-ফাঁদের এতই মেঘচুম্বী মহিমা যে, 'অধরচাঁদ' শুধু নিকট অলক্ষ্যে থেকে তৃপ্তিসুখই সম্ভোগ করেন না, 'ত্রিবেণীসঙ্গমে' সশরীরে দৃশ্যমান হয়ে 'হাওয়ার ঘরে' তিনি ধরাও দেন। কারণ, 'ব্রহ্মবিষ্ণু নর-নারায়ণ সেই ফাঁদে পড়েছে ধরা'। প্রকৃতপক্ষেই লালন যে-মিথুনাত্মক প্রক্রিয়ার মধ্যে 'বিরাট কিছু' রয়েছে বলে আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তার সাঙ্গীতিক ও পারিভাষিক রূপ যত রহস্যময়ই হোক, আসলে তা লাম্পট্য। এবং পুরো লালনগীতির আদ্যোপান্ত এই লাম্প্যটেরই কথকতা, যা কোনো মুসলমানের কাছে প্রশ্রয় পেতে পারে না। আল্লাহপাক বলেন, 'ওয়ালা তাকরাবুজ্‌জিনা ইন্নাহু কানা ফাহিশাতান ওয়া ছাআ ছাবিলা' অর্থাৎ, তোমরা জ্বিনার নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয়ই এটা অশ্লীলতা ও কুপথ। এবং এই কুকর্মটি এতই ভয়াবহ যে, পবিত্র বোখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে—প্রকাশ্য ব্যভিচার কেয়ামতের একটা অন্যতম আলামত। অথচ যত সুভাষণই প্রয়োগ করি, যত কথাই বলি, লালনের সর্বাত্মক সাধনার মূলকেন্দ্রই হলো ব্যভিচার; ইসলামী বিধানে যে ব্যভিচার বা জ্বিনার শাস্তি হলো নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ড। অতএব যে মুসলমান ইসলাম থেকে পুরোপুরি খারিজ হয়ে যেতে চান না, তিনি কি স্বপ্নেও কখনো লালনকে সূফী বা আউলিয়া বা মরমি-মহাসাধক বলে ভাবতে পারেন! অথচ কী দুর্ভাগ্য আমাদের, আল্লাহপাকের পথনির্দেশ ও রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত এক মুশরিক ও বিদআতীকে, আমরা গভীর অনুরাগে গ্রহণ করলাম মারেফাত জগতের এক সূফীতাত্ত্বিক রাহ্‌বাররূপে। মুসলমানের কল্‌ব কতখানি ব্যাধিগ্রস্ত হলে, এই রকমের বেশরম অশ্লীলতাকে আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায় বলে বিবেচনা করতে

www.pathagar.com

পারে, সপ্রীতি প্রশ্রয় দিতে পারে, সেটা সত্যই ভেবে দেখার মত একটি জরুরি বিষয়।

পুনরায় উল্লেখ করি, অনেকের বিবেচনায় লালন একজন খুবই উঁচু মর্যাদার সূফী সাধক। আমরাও 'বলি', তিনি একজন অত্যুচ্চ মাকামের সূফীই বটে। কিন্তু সেই উচ্চমার্গীয় মাকামটা যে কী-জিনিষ, আল্লাহপাক ভালো জানেন। তবে আমরা যেটুকু দেখি তাতে বুঝতে পারি, এই গোঁসাইগুরু কামালিয়াত এতটাই হাসিল করে ফেলেছেন যে, তিনি 'কামের ঘরে কপাট' বন্ধ করে কামক্রীড়ায় 'অটল রূপে বিহার' করতে জানেন। শুধু তাই নয়, গোপনাঙ্গের 'রঙমহলে ঝলক দেয়া' থেকে শুরু করে 'শুদ্ধ প্রেমরসের রসিক' ত্রিবেণীতীর্থে 'প্রেম ডুবারু' এই লালন আরো-যে বহু অকথ্য 'করণ কারণ'-এরই এক দক্ষ অপরাজেয় গ্রান্ডমাস্টার, সে-বিষয়েও রসিকজনেরা সম্যক ওয়াকিবহাল। এবং আমরাও অস্বীকার করবো না, কামলোলুপতা, অশ্লীল যৌনাচার যদি কামালিয়াত হয়, তাহলে লালন অবশ্যই একজন বড় মাপের 'কামেল পুরুষ', অধ্যাত্মবাদের এক মহানায়ক।

কিন্তু ইসলাম কী বলে? ইসলামের অকাট্য ও স্বাভাবিক অনুশাসন থেকে আমরা কী পাই? ইসলাম কারো জন্যই কোনো কারণে কোনো অবস্থাতেই সূক্ষ্মতম অশ্লীলতাকেও অনুমোদন করে না। পাক-নাপাক, শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নটি ইসলামে একটি গুরুতর প্রশ্ন; যে-কারণে মাহরাম পুরুষ ছাড়া একাকী কোনো নারীর পক্ষে কারো সঙ্গে বসাই নিষিদ্ধ, মুসলমানের জন্য নির্জন বাথরুমেও নগ্ন হওয়া নিষেধ, এবং সামান্য বায়ু-নি:সরিত হলেও তাকে পুনরায় অজু করে পবিত্র হতে হয়। কিন্তু কী আফসোস, অনেক মুসলমান আজ এতটাই গাফেল ও আত্মবিস্মৃত যে, লালনের চূড়ান্ত অশ্লীলতাকে পরম শ্রদ্ধায় মনে করছে মুক্তির পথ ও পাথেয় এক অমূল্য আধ্যাত্মিকতা। অথচ এই গ্রান্ডমাস্টার কামেল সম্পর্কে তার জীবদ্দশাতেই লেখা হয়েছিল, 'সাধুসেবা নামে লালনের শিষ্য ও তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার চলে।' আসলে লালনের পুরো 'ধর্মকর্মই' হলো ব্যভিচার-নির্ভর। লালন যে-গূঢ় আধ্যাত্মিকতার কথা বলে, সেখানে আছে 'টলে জীব অটলে ঈশ্বর', আছে 'সে অটলরূপের উপাসনা, সে ভাব কেউ জানে, কেউ জানে না' অথবা 'অটলকে টলাতে পারে কোন্ জনা'। অন্য কিছু নয়, এখানে যৌনমিলনকালে পুংবীর্যকে ধারণ করে রাখার কথা বলা হয়েছে। এবং 'অটল সাধনার' নামে নানা ধরনের অস্বাভাবিক নোংরা যৌনাচারই হলো লালনের 'গুপ্তভেদ', 'গুপ্তমন্ত্র' ও 'সাধনপ্রক্রিয়া'। যারা ইসলাম একেবারেই না-মানে, তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যার মধ্যে ইসলামের সামান্য নামগন্ধও অবশিষ্ট আছে, তার পক্ষে কি এই ধরনের নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সেবাকে মহৎ বলে মেনে নেয়া সম্ভব? আর শুধু ইসলামের কথা বলি কেন, পৃথিবীর কোনো ধর্মই কি এই ধরনের কামাচারকে ভালো চোখে দেখে বা দেখতে পারে? এতদসঙ্গে উল্লেখ করি, নরনারীর যৌনমিলনের মধ্যেই যেহেতু লালনের মোক্ষ নিহিত,

www.pathagar.com

'যুগলভজনই' হলো লালনের সকল সিদ্ধিসাধনার উর্বর কৃষিক্ষেত্র। অবশ্য লালনকে অধিকাংশ সময়ই তার প্রকৃত রূপে শনাক্ত করা কঠিন হয়; কারণ এই কবি সর্বদায়ই এক আপাত-নির্দোষ পরিভাষার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। উদাহরণত, লালনের একটি বিখ্যাত গান, 'সময় গেলে সাধন হবে না; এখানে 'সময়' অর্থ 'মহাযোগের' মুহূর্ত। আর এই মুহূর্তটির 'শুভাগমন' ঘটে নারীদেহে রজ:স্রাবের প্রথম তিন দিনের মধ্যে; যে-কারণে লালন বলে, 'ও সে তিন দিনের তিন মর্ম জেনে একদিনেতে সেধে লয়'। সত্যই লালনের কোনো তুলনা হয় না! এবং এটাও সত্য যে, ইবলিসের সার্বক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ সহায়তা না-পেলে, এত নিপুণভাবে কেউ কখনো কদর্য যৌনাচারকে ধর্মের মোড়কে লোকসমক্ষে সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপন করতে পারে না।

তিন

আমি আমার আলোচনা দীর্ঘ করবো না, দীর্ঘ করবার আবশ্যকতাও কম। বর্তমান এই আলোচনার মূল লক্ষ্য হলো, ভুলক্রমে বা যথেষ্ট গুরুত্ব না-দেবার কারণে, আমরা যে লালনকে নিয়ে কামপঙ্কিল অমার্জনীয় অশ্লীলতা ও শিরকের এক গভীর গহ্বরে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করছি, এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও বোধোদয় ঘটানো। সুখের বিষয়, আমার আগের আলোচনা একেবারে বিফলে যায় নি, কেউ কেউ কিছুটা ক্রুদ্ধ হলেও, কারো কারো মধ্যে অল্পাধিক পরিবর্তনও এসেছে। আসলে ইসলাম এমন একটা শ্লীল, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবনের কথা বলে, যেখানে কোনো কপট ও রিরংসু লালন ফকিরের স্থান নেই। স্থান-তো নেই-ই, বরং এই জাতীয় জঘন্য যৌনদর্শনকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করা যে-কোনো মুসলমানের জন্য ফরজ। এবং এটা শুধু হঠাৎ আমিই বলছি, তা নয়। লালনের সমসাময়িককালে এবং পরে বহু আলেমে-দ্বীন তাকে ইসলামের একজন ঘোরতর দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করে এই ফিত্নাকে উৎপাটিত করার যথাসাধ্য ব্যবস্থা নিয়েছেন! কিন্তু শয়তান ও তার কুৎসিত অপকর্মকে দীর্ঘায়ু দান করে আল্লাহপাক যেহেতু নানাভাবে মুসলমানকে পরীক্ষা করে নিতে চান, লালনকে দৃশ্যপট থেকে একেবারে বহিষ্কার করা যায়নি। না যাক, কিন্তু তার অশ্লীল বুজরুকি-যে সমূলে উৎখাত করা প্রয়োজন, এই ঈমানী তামান্না নিয়ে আল্লাহর একদল তওহিদী-বান্দাহ লালনের জীবদ্দশাতেও যেমন সক্রিয় ছিলেন, এখনো আছেন। আমরা পশ্চাদ্দিকে লক্ষ করতে পারি, কী ছিল তখনকার প্রতিক্রিয়া।

এই ধরনের 'বাউল বা নাড়ার ফকির' সম্পর্কে মুন্সী মেহেরুল্লাহর ধারণা ছিল, 'বানাইল পশু তারা বহুতর নরে'। মীর মশাররফ হোসেনও বাউলদের সম্পর্কে অক্লেশে বলেছেন, 'এরা আসল শয়তান, কাফের, বেঈমান, তা কি তোমরা জানো না'। কবি জোনাব আলি প্রচণ্ড ঘৃণায় ও আক্রোশে সরাসরি এই উক্তি করেছেন 'লাঠি মারো মাথে

www.pathagar.com

দাগাবাজ ফকিরের' ('লালন শাহ'-আবুল আহসান চৌধুরী)। এবং লালনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত (১৯০০ সাল, লালনের মৃত্যু ১৮৯০) মৌলভী আবদুল ওয়ালী তাঁর একটি ইংরাজী প্রবন্ধে খুব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'The So called Musalman Faqirs speaking to another Musalman try their best to argue against Islam, and to misinterpret or misquote passages in support of their doctrines'. অর্থাৎ কিছু তথাকথিত মুসলমান ফকির অন্য মুসলমানকে ইসলামের বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে, এবং তাদের কাজ হলো, নিজেদের মতবাদের সমর্থনে (কুরআনুল করিম থেকে) ভ্রান্ত ব্যাখ্যা ও ভুল উদ্ধৃতি তুলে ধরা। এবং মুন্সী এমদাদ আলি লালনের পরিষ্কার নামোল্লেখ করে বলেছেন, 'নাড়া-যে কি ধর্ম তাহা ব্যক্ত করা বড়ই দুরূহ। এমন অসভ্য অশ্লীল ব্যবহার জগতে কোনো মনুষ্যের দ্বারা হইতে পারে, এমন বিশ্বাস হয় না'। এমনকি সর্বজনশ্রদ্ধেয় মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁও মুসলিম সমাজের অধঃপাত ও শোচনীয় অবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে মারফতি ফকিরদের উদ্ভবকে দায়ী করেছেন; এবং বলেছেন, 'সামাজিক জীবনের মারাত্মক ব্যাধি'। মোঃ আবু তাহের বর্ধমানী লালনকে বলেছেন, 'ইসলাম বিরোধী, শরীয়ত বিরোধী, বেশরাহ, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ফকির'; বলেছেন, 'লালনের গানে আছে নরনারীর অবাধ মিলনের প্রেরণা, লালনের গানে আছে গুপ্ত যৌনপ্রক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার গভীর উৎসাহ, লালনের গানে আছে নাপাক দ্রব্য (কামাচারপ্রসূত বীর্য ও রতিরস) ভক্ষণ করার প্রেরণা, লালনের গানে আছে তৌহিদ-বিরোধী কালাম'। আফসোস, এরপরও লালন আজ আমাদের কাছে 'আউলিয়া', গভীর আধ্যাত্মিক জগতের এক অবিসংবাদিত 'কামেল পুরুষ'। কামেলই বটে! কিন্তু এই 'মহাপুরুষের' শিষ্য-প্রশিষ্যেরা, এখন যদিও মুক্তবুদ্ধি উদার, অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিসেবীদের ব্যবস্থাপনা ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আনন্দে-নির্বিঘ্নে বছরে অন্তত দু'বার লালন-আখড়ায় জমজমাট গঞ্জিকা সেবন ও রসরতির আসর বসায়, কিন্তু একদা বড় বিপদের মধ্যে ছিল। অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী জনাব শামসুদ্দিন আহমদের অগ্রজ মওলানা আফসার উদ্দিন ছিলেন ইসলামপ্রেমী এক তেজস্বী পুরুষ। তিনি দোলপূর্ণিমার বার্ষিক উৎসবে আগত বহু ফকিরের ঝুঁটি-বাবরি কেটে দিয়েছিলেন। এবং তাঁর জীবদ্দশায় লালনের আখড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাউলদের কোনো প্রকাশ্য অনুষ্ঠান-তো হতেই পারে নি, ভয়ে অনেক লালনশিষ্য বহুদিন পলাতকও ছিল। এই হলো লালন ও বাউল ফকিরদের নিয়ে সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরবর্তীকালের প্রতিক্রিয়া। আজ অনেকটা স্তিমিত বটে কিন্তু এই ঘৃণা ও প্রতিরোধের ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত। এই মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর আগেও মওলানা মেছবাহুর রহমান লালনের বিরুদ্ধে একটি ছোটখাটো আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর প্রচারপত্রে লিখেছিলেন, 'চারিচন্দ্রভেদ ষড়চক্র.... প্রেমভাজা প্রভৃতি কাম আরাধনার ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দসমূহের তাৎপর্য কি তা জানলে বা তার অবতারবাদের সংবাদ জানলে, যে-কোনো

www.pathagar.com

রুচিসম্পন্ন মানুষ লালন এবং তার অনুসারীদের নাম মুখে আনতেও ঘৃণাবোধ করবে'। এই ঘৃণা এখনো অক্ষত। ম. আ. সোবহান, মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন প্রমুখ লেখকের সাম্প্রতিক রচনাসমূহে এই ঘৃণারই তীব্রতা লক্ষ করি।

অবশ্য লালনের প্রতি অনেকের মধ্যে অনেক সহানুভূতিও আছে। ড: আবুল আহসান চৌধুরী প্রতিরোধের এই অবিরাম ধারাবাহিকতার কারণে কথঞ্চিৎ বেদনার সঙ্গে উল্লেখ করেন, 'একতারার বিরুদ্ধে চলেছে লাঠির সংগ্রাম। বাঙলার সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের এ এক বেদনাদায়ক অধ্যায়'; বলেন, লালনের প্রতি 'আলেম সমাজের একটি বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।' নিশ্চয়ই সহানুভূতির কথা, কিন্তু ড. চৌধুরী 'বিদ্বেষ' বলছেন কেন? তিনি ভালোই জানেন, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফত উভয় আমলেই এই ধরনের ধর্মভ্রষ্ট জিন্দিক-মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। কারণ এ-ক্ষেত্রে নির্বিকার থাকার কোনো পথ নেই; রাসূল (সাঃ) বলেন, সত্য-মিথ্যার প্রশ্নে যারা নীরব ও নিরপেক্ষ তারা 'বোবা শয়তান'। ড. চৌধুরী আরো বলেছেন, 'বারংবার তিনি (লালন) হয়েছেন লাঞ্ছিত-অপমানিত-সমালোচিত। কিন্তু লালন ধীর স্থির লক্ষ্যগামী। কোনো অন্তরায়, প্রতিবন্ধকতাই তাঁকে নিরুৎসাহিত বা নিরুদ্ধ করতে পারে নি'। আসলে পারার কথাও নয়; কারণ মিথ্যা, অন্ধকার ও অশ্লীলতাকে আঁকড়ে থাকাও একটি অনতিক্রম্য প্রচণ্ড নেশা। অতএব লালন ও লালনের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা যদি প্রচণ্ড ঘৃণার মুখেও নিজেদের নোংরা মত ও ততোধিক নোংরা পথকে আঁকড়ে ধরে থাকেন, সেটা স্বাভাবিক।

অবশ্য লালনকে নিয়ে এত বিস্তর কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না, যদি এই 'মহাপুরুষকে' ঘিরে আমাদের ঈমান ও আকীদা-বিধ্বংসী একটি কুৎসিত আবহ গড়ে না উঠতো। আমাদের দুর্ভাগ্য, যে-ব্যক্তি মুসলমানই ছিল না, যার মধ্যে ইসলাম বলে আদৌ কোনো পদার্থ ছিল না, যার গানের পারিভাষিক চোরাপথে শুধুই অশ্লীল ইঙ্গিতের ছড়াছড়ি, যার মরমিয়া পয়গাম হলো নিখাদ যৌনতার কথকতা, কী বদনসীব আমাদের, তাকেই আমরা কেউ কেউ আউলিয়া ভেবে বিভ্রান্ত হতে ভালোবাসি। এবং এক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, প্রচারমাধ্যমসমূহের অত্যুৎসাহী ভূমিকা এবং সর্বোপরি ইসলামের ঘোরতর দুশমন কিছু মতলবী 'অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ' বুদ্ধিজীবীর 'মানবপ্রীতি' আজ লালনকে এমন এক শীর্ষবাসী 'মহৎ-এ' পরিণত করেছে, যা এমনকি বহু আলেমকেও কিয়ৎপরিমাণে বিভ্রান্ত করছে। এই বিভ্রান্তির শুরু, পূর্বে উল্লেখ করেছি, অনবধানবশত পাকিস্তান আমল থেকে, যে-কারণে জানাযা ও দাফন-কাফনহীন অবস্থায় লালনের মৃতদেহটি যে-গহ্বরে রক্ষিত, তার উপরে সযত্নে নির্মিত হয়েছে হজরত নিযা-মুদ্দিন আউলিয়া (রহঃ)-এর পবিত্র মাযার-এর অনুকরণে এক বিশাল মনোরম স্মৃতিসৌধ। সমাধি না-বলে 'গহ্বর' বলেছি এই কারণে যে, লালনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে

www.pathagar.com

সঙ্গেই প্রকাশিত 'হিতকরী' পত্রিকার একটি সংখ্যায় এই প্রামাণ্য তথ্য বর্তমান যে, তার কোনো জানাযাও হয় নি, দাফন-কাফনও হয় নি, একটু শুধু হরিনাম কীর্তন হয়েছিল। এবং এই জনশ্রুতিও বর্তমান যে, লালনকে গহ্বরস্থ করা হয় উত্তর-দক্ষিণে নয়, পূর্ব-পশ্চিম লম্বভাবে। 'হিতকরীর' এই সংখ্যাটি যেহেতু লালন মৃত্যুবৎসরেই প্রকাশিত, উল্লিখিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে-বর্ণনা, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র তথ্যগত বিভ্রাট নেই। বিশিষ্ট লালন-বিশেষজ্ঞ বসন্ত রঞ্জন পালও বলেন, এটা 'সর্বৈব সত্য'। কিন্তু দুঃখজনক যে, এই বিষয়টি একমাত্র ড. আবুল আহসান চৌধুরী ছাড়া আর কেউ আমাদের গোচরীভূত করেন নি। কেন করেন নি, তার দু'টি জবাব হতে পারে; হয় আমাদের গবেষকরা 'হিতকরীর' এই প্রামাণ্য তথ্যটি সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল নয়, না-হলে লালনকে আউলিয়ারূপে প্রতিষ্ঠিত করবার এক মতলবী উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা সত্যকে গোপন করতে চান। কিন্তু এই ভূমিকা বড় নিন্দার্হ, বড় অমার্জনীয়। কারণ মহৎ কি কুৎসিত যে-উদ্দেশ্যই থাক, কিছু মানুষের অসাধুতার কারণে বহু মুসলমানের ঈমানে ও তওহিদী-চেতনায় শিরক ও বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিষয়টি মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য অতীব গুরুতর।

বলা প্রয়োজন, আমার এই রচনার দ্বিতীয় কোনো লক্ষ্য নেই। আমি শুধু বাংলাভাষী মুসলিম মিল্লাতকে এক গুরুতর ঈমানী-বিপর্যয় থেকে সতর্ক করতে চেয়েছি। আশা করি, কেউ কেউ নিশ্চয়ই আল্লাহপাকের অনুগ্রহে এই বিভ্রান্তি ও গর্হিত ফিত্‌না থেকে সতর্ক হবেন। কিন্তু এতদ্‌সঙ্গে এই আশঙ্কাও করি যে, যারা ইসলামের ক্ষতিসাধনে তৎপর, মুসলমানকে যারা শির্‌ক ও বিদআত এবং অশ্লীলতায় নিমজ্জিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমার এই আলোচনার কারণে লালনকে তারা একটি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দ্বিগুণ উৎসাহে তৎপর হয়ে না-ওঠে। এই ধরনের অশ্লীলতাপ্রেমী লালন-বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহপাক পৃথিবীতে কী-শাস্তি উপহার দেবেন বা আদৌ দেবেন কিনা জানি না; তবে এটা জানি, 'ইসলামই যেহেতু আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম', বিদআত ও অংশীবাদ যেহেতু ইসলামের এক নম্বরের দুশমন, এই লালনে-নিমজ্জিত ইসলামদ্রোহীদের আপ্যায়নের জন্য আখেরাতে অপেক্ষা করছে এক ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড, জাহান্নাম। তবে ঈষৎ সান্ত্বনার কথা, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাথী হিসেবে ত্রিবেণীতীর্থ মানবদেহরূপ আদি মক্কার 'মহান সাধক' লালন সাঁইও থাকবেন।

আলোচনা অধিক দীর্ঘায়িত করার আবশ্যকতা নেই। কারণ আমি যা-বলতে চেয়েছি বা চাই, তা নিশ্চয়ই পাঠকের কাছে অল্পাধিক পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। আমি চাই, আখেরাতের প্রশ্নে, মুসলমানের সঠিক অভিজ্ঞান-রক্ষার প্রশ্নে, আমরা যেন লালনের কুহক ও কুহেলিকা উপেক্ষা করতে পারি। 'নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল' (সূরা নিসা)। যাঁরা বলেন, লালন বস্তুত অশ্লীলতার প্রবক্তা নয়; যাঁরা বলেন, লালনে

www.pathagar.com

যৌনতা একটি বিষয় বটে কিন্তু লালন যৌনতাকে উত্তীর্ণ করেছেন এক উচ্চমার্গীয় নান্দনিক আধ্যাত্মিকতায়, দেহকে পরিণত করেছেন এক দেহাতীত সৌরভে; এবং তিনি নিজেও ক্রমশ রূপান্তরিত হয়েছেন এক মরমিয়া সিদ্ধপুরুষে—তাদের কথা একেবারে 'ফেলে দেবার মত নয়'। 'হয়ত তাই'। কিন্তু আমার মনে পড়ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কৌতুকজনক কেস্-এর কথা। প্রকাশ্যস্থানে আপত্তিকর অবস্থায় এক যুবক-যুবতী পুলিশের হাতে পাবলিক নুইসেন্স এ্যাক্টে গ্রেফতার হয়েছিল। তাদেরকে যখন আদালতে হাজির করা হলো, যুবতীটি কিছুমাত্র লজ্জিত কি বিচলিত না-হয়ে সপ্রতিভ কণ্ঠে বললো, 'আমি দেহ বিক্রয় করি নি, আমি বিক্রয় করেছি জন্মনিয়ন্ত্রক কনডম, তবে-তা Practical demonstration সহ'। লালনও এই মহিলার মত; তারও কথা, এটা যৌনতা নয়, এ-এক গুপ্ত আধ্যাত্মিক জগৎ। তবে এই জগতের প্রবেশদ্বার হলো নরনারীর মিথুনক্রিয়া; এবং অবুঝ অ-রসিকেরা যাকে নিন্দা করে, সেটা হলো মূলতত্ত্ব ও সাধনজগতের Practical demonstration। আফসোস! আত্মঘাতী কিছু মুসলমান এই নোংরা আধ্যাত্মিকতার উপরও আস্থা স্থাপন করে। অধঃপাতেরও একটা সীমা আছে; কষ্ট হয়, মুসলমান আর কত অধঃপতিত হবে!

দৈনিক ইনকিলাব : ১৫.৯.৯৯
পালাবদল : নবেম্বর '৯৯ : ১ম ও ২য় সংখ্যা

www.pathagar.com

রবীন্দ্রবিভ্রম ও মৌলবাদীর অপ্রিয় কথা

রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রতিভাবান ছিলেন না, ছিলেন কল্পনাতীতরূপে সৌভাগ্যবানও। এবং এই কবি শুধু সাহিত্যের একটি বিশাল ভাণ্ডারই রেখে যান-নি, এমন এক বিশাল ভক্তদলও রেখে গেছেন, যারা তাকে প্রায় ঈশ্বরের আসনে সমাসীন করতে ও রাখতে সর্বদা তৎপর। এই ভক্তজনদের এটা বুঝানো অসম্ভব যে, এই ধরনের অনুচিত-ভক্তির কারণে কারো কিছু ব্যক্তিগত সুবিধা সৃষ্টি হলেও, রবীন্দ্রনাথের খুব-একটা উপকার হয় না। এবং এটাও বুঝানো কষ্টকর যে, এতে উপকার-তো নেই-ই বরং এই ধরনের হাস্যকর অতিভক্তিজাত বিভ্রম অধিক প্রশ্রয় পেলে, বাঙ্গালীর মানসিক দৈন্য ও ভারসাম্যহীনতা এতদূর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা, যা স্বাভাবিক বিচারবোধকে ঢেকে দিয়ে বাংলাভাষী বহু মানুষকে নিরাময়হীন বদ্ধ-উন্মাদে পরিণত করতে পারে। অতএব রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন, তাঁকে কবি হিসেবে দেখাই সমীচীন; যা ছিলেন না, স্বার্থ কি অন্ধত্ববশত সেই গুণ আরোপ করার মধ্যে কোন উপকার নেই। যাঁরা মনে করেন, রবীন্দ্রনাথকে যত বেশি ও বহুবর্ণ শিরোপায় ভূষিত করা যায় তত ভালো, তাঁরা ভুল করেন। কিন্তু সমূহ দুঃখের বিষয়, এ ভুলই এখন আমাদের অপরিহার্য-বিলাস, বিভ্রমই আমাদের চোখের আলো।

প্রথমে খুব-একটা বিশ্বাস হয় নি, কিন্তু পরে দেখলাম কথাটা সত্য যে, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বলেছেন—রবীন্দ্রনাথের আদর্শ আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। শেখ হাসিনার একটি বড় গুণ যে, তিনি যা-বলেন তা অকপটে বলেন, এবং সততই অত্যন্ত ভেবে-চিন্তে। অর্থাৎ তিনি এমন কিছু বলেন না, যা তাঁর বিশ্বাস ও কর্মপন্থার বিপরীত, যা নিতান্তই কথার কথা। কিন্তু সম্ভবত এইবারই প্রথম, তিনি খুব না-ভেবে এমন একটি লঘু ও শিথিল মন্তব্য করলেন, যার মধ্যে কোন লক্ষ্য ও সারবস্তু খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। এই আকস্মিক ও অমনস্ক উক্তি সদর্থক-তো নয়ই, বরং গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের ঈমান ও আকীদার সঙ্গে এমন প্রত্যক্ষভাবে সাংঘর্ষিক, যা মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর ধর্মমনস্ক ভাবমূর্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষুন্নই করেছে।

রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য কেউ কেউ 'ঈশ্বর' এবং কেউ কেউ ঈশ্বর থেকে 'সামান্য ছোট' বলে ধারণা করেন, বিশ্বাসও করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মূত্রাশয়ে প্রদাহ দেখা না-দিলে, অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথ এই 'সামান্য ছোট'ও থাকতেন না, ঈশ্বরের পুরোপুরি সমকক্ষই হতে পারতেন। কিন্তু এই ধরনের বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ কম, আবশ্যকতা আরো কম। কারণ ব্যক্তিগত রুচি, প্রয়োজন ও বোধ-বিবেচনা নিয়ে, যিনি যাকে ইচ্ছা ভগবান মনে করবেন, পূজ্যপাদ দেবতা জ্ঞান

www.pathagar.com

করবেন, এ-নিয়ে বিচলিত হবার কিছু নেই। প্রাচীন মিশরীয়রা গুবরে পোকাকে সূর্যজ্ঞানে পূজা করতো। কোথায় সূর্য আর কোথায় গুবরে পোকা! তবু আমরা আশ্চর্য হই-না, কারণ কে-যে কী-ভাবে উপাস্য স্থির করে, এবং কার-যে কী লক্ষ্য বা মতলব, তা খুবই রহস্যময়। আল কোরআন থেকে নিশ্চিতভাবে আমরা এই তথ্যও পেয়েছি যে, হজরত মূসা (আঃ)-এর কওমভুক্ত অনেক লোক পরম অনুরাগে গো-বৎসের পূজা শুরু করেছিল। এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের কিছু ভক্ত যখন তাঁকে 'ভগবান' বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করলো, কিছু লোক পরমহংসের কাছে গিয়ে জানতে চাইলো, 'আপনি কি সত্যিই ভগবান'? রামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমি কী বলবো, তোরাই বুঝে দেখ্'। এই কথার কী অর্থ হয় বুঝা কঠিন, কিন্তু অনেক ভক্ত এই কথায় নির্ভুল ভগবানের কণ্ঠস্বরই শুনতে পেতো। আরো কথা মনে পড়ছে। আগা খানকে একবার এক ডিনারে বৃটেনের রানী রসিকতাচ্ছলে বলেছিলেন, 'আগা, তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমাকে নাকি ঈশ্বর মনে করে'? আগা খান কিছুমাত্র বিচলিত বা অপ্রস্তুত না-হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'ভারতবর্ষের বহুকোটি লোক গরুকেও ঈশ্বর মনে করে; সে-তুলনায় আমার সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনাবোধ-তো অনেক প্রখর'। আসলেও তাই; গুবরে পোকা কি গো-বৎসের পূজারীদের তুলনায়, আমাদের যে-সকল বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথের উপাসক, তাঁরা অবশ্যই অনেক বুদ্ধিমান। যদিও ইসলামে এ-সবই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু ইসলামে যেহেতু দ্বীন-এর ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি এবং হস্তক্ষেপও নিষিদ্ধ, যার যেমন ইচ্ছা ইট কাঠ পাথর প্রাণী বৃক্ষ নক্ষত্র যে-কোন কিছুকে উপাস্য দেবতা হিসেবে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই। আর বিষয়টি যেহেতু নিতান্তই ব্যক্তিগত, যে-কেউ এক্ষেত্রে বিশ্বাসের পূর্ণ-স্বাধীনতা ও পূর্ণ-সুরক্ষা দাবী করতে পারে; এবং এটা তার একটা গণতান্ত্রিক অধিকারও বটে। কিন্তু সমস্যা হলো, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য কোন বিবেচনায়ই অবহেলা করা যায় না, করা উচিতও নয়। কারণ তিনি ব্যক্তিমাত্র নন, তিনি একটি জাতির আবেগ ও অনুরাগ, আকাঙ্ক্ষা ও উপলব্ধির নিত্য-প্রতিনিধিত্বশীল এক অপরিহার্য কণ্ঠস্বর। অতএব প্রধানমন্ত্রীর যে-কোন উক্তি যে, সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা ও পর্যালোচনার দাবী রাখে, এ-নিয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু আদর্শটা কী? রবীন্দ্রনাথ একজন নোবেল-বিজয়ী বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কি মহামানবরূপে কোন মহৎ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন? তাঁর গান ও কবিতার কারণে কেউ কেউ দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁকে দেবতা জ্ঞান করেন সত্য, কিন্তু তিনি কি আসলেই দেবতা? রবীন্দ্রনাথের জীবন ও

www.pathagar.com

জীবনকথা কিন্তু অন্য সাক্ষ্য দেয়। সর্বমানবিক অনুরাগে পুষ্ট অনেক অমর গান ও কাব্যপংক্তি তিনি রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর নিজের বাস্তব অবস্থান ছিল এ-থেকে অনেক দূরে। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার ব্রেখ্টের মতই স্ববিরোধী, যে-ব্রেখ্ট বলতেন-সমাজতন্ত্রকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক আন্তরিকভাবে এটা কামনাও করি, কিন্তু তার অর্থ এ-নয় যে, গাড়ী-বাড়ি নিয়ে আমার সচ্ছল, নিশ্চিন্ত আরামের এই জীবন কিয়ৎপরিমাণেও বিঘ্নিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হোক। রবীন্দ্রনাথ উপেনদের নিয়ে অনেক মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছেন; কিন্তু কার্যত নিজে ছিলেন পিতামহ কি পিতার মতই অর্থলিপ্সু ও নিষ্ঠুর প্রজানিপীড়ক। অন্য একটি গুণও তাঁর মধ্যে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এই স্বার্থসচেতন 'মহাপ্রাণ আদর্শ মহামানব' সর্বদাই নিজের দোষগুলোকে দক্ষতার সঙ্গে আড়াল করে রাখতেন। আপন ত্রুটি নিয়ে তাঁর বিশেষ কুণ্ঠা ও দুর্ভাবনা ছিল না, শুধু প্রকাশ হয়ে পড়াটাই তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। অর্থাৎ যে-কোন ব্যাপারে তাঁর সঙ্কোচ কম ছিল কিন্তু চক্ষুলজ্জা ছিল অপরিসীম; যে-কারণে অতিমাত্রায় রবীন্দ্রভক্ত অন্নদাশংকর রায়ের উদ্ধৃতি সহযোগে ড: আহমদ শরীফ বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর ত্রুটি, নিন্দা ও কলঙ্কের সাক্ষ্য-প্রমাণ সতর্ক প্রয়াসে অপসারিত বা বিনষ্ট করতেন'। সর্বমানবিক প্রেম ছিল তাঁর কবিতার উপজীব্য; কিন্তু কার্যত তিনি নিজে বাস্তবে ছিলেন অহংকার ও ভেদবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত। প্রাচীন ঋষিদের মত ঔপনিষদিক বেশবাস ও অবয়ব যদিও ছিল, কিন্তু স্বভাবে ও সর্বান্ত:করণে তিনি ছিলেন বৃটিশ রাজশক্তির অনুগত উপাসক। তাঁর ধারণা ও বিশ্বাসমতে, বৃটিশ-শাসন ছিল 'ঈশ্বরের শাসন'। এবং তিনি বৃটিশদের প্রতি এতটাই মুগ্ধ ও অনুরক্ত ছিলেন যে, তাঁর সার্বক্ষণিক কামনা ছিল, এই বৃটিশরূপী 'ঈশ্বরের শাসন' চিরস্থায়ী না-হলেও অন্তত দীর্ঘস্থায়ী হোক। দুঃখের সঙ্গে এই কথাও বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ ও বাংলাভাষাকে কতভাবেই-না বন্দনা করেছেন, অথচ বরাবরই অগ্রাধিকার দিয়েছেন হিন্দী-কে। কী অসাধারণ সব স্ববিরোধিতা! এরকম একজন স্ববিরোধী আত্মবিভক্ত ও নিপুণ দ্বৈতাচারী মানুষ কী-করে মানুষের আদর্শ হতে পারে!

কারো অজানা নয়, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল বিশাল জমিদারী। কিন্তু মুসলমান কিছুটা অক্ষরজ্ঞান লাভ করতে পারে, এই আশঙ্কায় এই 'প্রজাহিতৈষী' জমিদার তাঁর এলাকায় একটি প্রাইমারি স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন-নি। কেন করবেন? তিনি মানব দরদী ছিলেন বটে, কিন্তু ছিলেন আপাদমস্তক বঙ্গীয়-মুসলমানদের প্রতি বিরূপ ও বৈরী। বঙ্গবিভাগ ও তৎপরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, এই উভয়বিধ ক্ষেত্রে তাঁর 'যে-কবিজনোচিত দরদী-ভূমিকা' তা-থেকে সম্যক অনুধাবন করা যায়, বাঙ্গালী

www.pathagar.com

মুসলমানের উন্নতি-অগ্রগতির যে-কোন ক্ষীণতর সম্ভাবনাও এই মহাকবির কাছে ছিল সহ্যের অতীত। ইহুদি-খ্রীস্টানদের ক্রীতদাসরূপী সালমান রুশদি একদা বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি অতিশয় অবমাননাকর কটূক্তি করেছিল—অন্য কোন গুণ বা যোগ্যতা নেই, বাংলাদেশের মানুষ কেবল পাট ও সন্তান-উৎপাদনে দক্ষ। এটা প্রমাণিত, বাংলাদেশের এই জমীন ও জনপদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারণা সালমান রুশদি থেকে আদৌ আলাদা কিছু ছিল না। সত্যই-যে ছিল না, 'চাষা-ভুষোদের' জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা যে-কত অবিজ্ঞোচিত, এ-নিয়ে কলকাতা গড়ের মাঠে আয়োজিত প্রতিবাদ সভার পুরোহিতরূপে সে-প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন। আফসোস, এই রবীন্দ্রনাথও আজ আমাদের অনুসরণযোগ্য আদর্শ মহাপুরুষ!

রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গান, 'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে'। সত্যজিৎ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন; এবং তিনি বুঝতেই পারেন-নি, চাবি ভেঙ্গে কাউকে ঘরের বাইরে আনা যায় কী-করে? তালা হলে কথাটার একটা অর্থ হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এটা কী-লিখলেন? আসলে 'যাবি' ও 'চাবি'র একটি সরল মধ্যমিল ও অনুপ্রাসের লোভ সংবরণ করতে না-পারার কারণেই শব্দব্যবহারের এই নিরর্থক অসংগতি। অথচ যে-কোন সাধারণ মানের কবিও এই অসংগতি বর্জন করে লিখতে পারতেন, 'ভেঙ্গে মোর ঘরের তালা বুকের জ্বালা জুড়িয়ে দিবি কে আমারে'। কবিতার কথা নয়, এই ধরনের কত-যে অসংগতি ও আত্মভ্রষ্টতা রবীন্দ্রজীবনে বর্তমান, তার শেষ নেই। এবং এজন্যই, বিশেষ করে তাঁর আত্মম্ভরিতা ও কৃত্রিম ঋষিপ্রতিম মহত্বের খোলস দেখে দেখে বিরক্ত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য একদা একটি অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ড: ভট্টাচার্য ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী, কিন্তু একই সঙ্গে অত্যন্ত বিদগ্ধ মানুষ। এক বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা কিছু গদ্যাংশ তুলে দিলেন ভালো-বাংলায় রূপান্তরের জন্য। রবীন্দ্রনাথকে অবজ্ঞা কি অসম্মানিত করার এই ব্যবস্থা নির্মম বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কাজটি উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের যুগপৎ বিরক্তি ও সরস নান্দনিক বোধেরও পরিচয় বহন করে।

যাই হোক, ভুলক্রমে বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী যাই বলুন, রবীন্দ্রনাথ কি সত্যই কোন আদর্শবান পুরুষ ছিলেন? এক্ষেত্রে গ্যেটে কার্লাইল হিটলার মাইকেল হার্ট প্রমুখ মনীষীপুরুষ মানুষের মহত্ত্ব নির্ধারণে যে-ধরনের মানদণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন, আমরা সেই মানদণ্ডের কথা তুলবো না; কারণ সেই-বিচারে একদা-বিখ্যাত গায়ক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়েরও যেটুকু স্থান হয়, সুভাষ বসুর হয়, রবীন্দ্রনাথের তাও হয় না। আমরা খুব সাধারণভাবে বিষয়টিকে

www.pathagar.com

দেখতে চাই। রবীন্দ্রনাথ কি পরোপকারী ছিলেন? তিনি কি এতীম, অসহায়, নিরাশ্রয় মানুষের পাশে এসে কখনো দাঁড়িয়েছেন? সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি কি কখনো কোন ত্যাগ স্বীকার করেছেন? ভেদবৈষম্য পরিহার করে তিনি কি সর্বমানবিক মমতা নিয়ে সাধারণ মানুষের সমতলে এসে দাঁড়িয়েছেন কখনো? না, এ-সব প্রশ্নের সকল উত্তরই শতকরা একশ' ভাগ নেতিবাচক। শুধু নেতিবাচক নয়, পুরোপুরি বিপরীত ও সাংঘর্ষিক। এতে একজন বড় কবি হয়ে উঠতে বাধা হয়-নি সত্য, কিন্তু তাঁকে বড় মানুষ হিসেবে প্রমাণ করা বড়ই দুরূহ। অতএব রবীন্দ্রনাথের উপাসকবৃন্দ তাঁর বিশাল অন্ধকার দিককে আড়াল করে যতই চাঁদের মত শুধু আলোর দিকটাকে লোকসমক্ষে বিম্বিত করার চেষ্টা করুক, সেটা নিষ্ফল হতে বাধ্য। বরং রবীন্দ্রনাথকে ঐশ্বরিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার মতলবি-মোহ পরিত্যাগ করে তাঁকে একজন বড় কবি হিসেবে দেখলেই তাঁর প্রতি যথার্থ সুবিচার করা হয়; এবং সেটাই সঠিক, সেটাই বাস্তবসম্মত।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে কী ছিলেন, অধিকাংশ মানুষ তা জানে-না; দু'একজন জানে। তাঁকে সবচেয়ে ভালো চিনেছিলেন তাঁর এক সহোদরা বিধবা ভগিনী। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিধবা কন্যার জন্য জমিদারীর আয় থেকে আমৃত্যু একটি মাসোহারার ব্যবস্থা রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ দলিলটিকে বিনষ্ট করে মাসোহারা বন্ধ করে দেন। শুধু তাই নয়, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, শরীকদেরকে সকল উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার 'মহৎ' লক্ষ্যে এই রবীন্দ্রনাথ পিতৃদেব কর্তৃক সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত উইলের সকল কাগজপত্রও পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ-যে একজন অসাধারণ কবি ছিলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান-যে অসামান্য, এ-নিয়ে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু খ্যাতি প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা যতই গগনচুম্বী হোক, ঋষিপ্রতিম রাজকীয় অবয়ব লোকচক্ষে যত সম্ভ্রমই সৃষ্টি করুক, মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাধারণ মানের। তাঁর তুলনায় মাইকেল কি বিদ্যাসাগরও ছিলেন অনেক বেশি মানবিক গুণে সমৃদ্ধ। অতএব কবি হিসেবে তাঁকে নিয়ে আমরা যথেচ্ছ উত্তাল হয়ে উঠতে পারি, কিন্তু মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে আদর্শরূপে গ্রহণ করার মধ্যে মূঢ়তা ও সীমাহীন আত্মবৈক্লব্য ছাড়া দ্বিতীয় কোন যুক্তি নেই।

যুক্তি-যে সত্যই নেই, তার আরো কিছু তথ্যপ্রমাণ আমরা পেশ করতে পারি। ড: আবুল আহসান চৌধুরীর একটি লেখায় দেখলাম, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত ঠাকুর পরিবারের প্রজাপীড়নের তথ্যবহ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর একটি প্রবন্ধের কারণে রবীন্দ্রনাথ কী-পরিমাণে কুপিত হয়েছিলেন। 'এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ রুষ্ট ও অপ্রসন্ন হন এবং

www.pathagar.com

তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়কে বলে অক্ষয়কুমারের 'রাণী ভবানী' গ্রন্থপ্রকাশের অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করান। কাঙাল-পুত্র সতীশচন্দ্র মজুমদার-সূত্রে জানা যায়, ঠাকুর-জমিদারদের প্রজাপীড়নের সংবাদ-প্রকাশের অপরাধে (?) তাঁরা লাঠিয়াল-গুণ্ডা লাগিয়ে কাঙালকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা নেন' (ড: আ. আ. চৌধুরী)। এবং ড: চৌধুরীর নিকট থেকে এই তথ্যও পেয়েছি যে, শখের কৃষি খামারের জন্য বহু গরীব মুসলমান চাষীর ভিটেমাটি রবীন্দ্রনাথ দখল করেছিলেন। এতদসঙ্গে চরের মুসলমান প্রজাদের শায়েস্তা করবার জন্য নমঃশূদ্র প্রজা এনে বসতি স্থাপনের সাম্প্রদায়িক-বুদ্ধিও রবীন্দ্রনাথের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। এই হলো রবীন্দ্রনাথ, প্রকৃত রবীন্দ্রনাথ। ড: আবুল আহসান চৌধুরীর কাছ থেকে প্রাপ্ত অপর একটি ভয়াবহ তথ্যও উল্লেখযোগ্য। যে-সম্পদ ঐশ্বর্য, যে-জমিদারী রবীন্দ্রনাথের হস্তগত হয়েছিল, তা আদৌ কোন উৎকৃষ্ট উপার্জন ছিল না, তার নেপথ্য উপাখ্যান খুব ভালো নয়। গরীব প্রজাদের উপর অমানুষিক শোষণ-তো ছিলই, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের পতিতালয়-পরিচালনাও জড়িত ছিল ঠাকুর পরিবারের আয়-উপার্জনের সঙ্গে। আবার বলি, এই হলো আমাদের রবীন্দ্রনাথ, এই হলো আমাদের 'পূজ্যপাদ আদর্শের রবীন্দ্রনাথ'।

তবু আমরা কখনো রবীন্দ্রনাথকে অবহেলা করিনি; বরং রবীন্দ্রনাথের যা-প্রাপ্য আমরা তা যথাসাধ্য প্রদান করেছি। রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন নিষেধের মুখে, তার প্রতিবাদে আমরা কেউ 'শহীদ' হই-নি বটে, কিন্তু যে-প্রচণ্ড আন্দোলন সেদিন গড়ে তুলেছিলাম, শুধু গানের জন্য তেমন তীব্র আন্দোলন পৃথিবীতে কোথাও কখনো দেখা যায় নি। তারপর, গানের অভাব ছিল না, কিন্তু আমরা আমাদের সাধ্যের বাইরে গিয়েও গুণীজনের মূল্য দিতে জানি, পঁচাশি শতাংশ তওহিদী জনতার এই দেশে তাঁরই গান আজ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। আমাদের বেতার-টিভি, নৃত্যে-নাটকে-সঙ্গীতে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই সারাক্ষণ উন্মাতাল; বেতার-টিভিতে অন্য কবি-লেখকরাও আছেন, কিন্তু তাঁদের অবস্থান অনেকটা শিলাইদহ জমিদারীর অধীন কুণ্ঠা-ভারাক্রান্ত রায়তদের মত। আমাদের টিভি-তে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এমনই নিরবচ্ছিন্ন প্রচার, এবং এতই দৌর্দণ্ডপ্রতাপ এই গানের যে, শুধু কতিপয় 'অসহিষ্ণু মৌলবাদী' নয়, অনেক মানুষের কাছেই বাংলাদেশ টেলিভিশন রবীন্দ্র-দূরদর্শন বলে ভ্রম হয়। আর পঁচিশে বৈশাখ বাইশে শ্রাবণে আমরা যে-ভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠি, সেই উন্মাদনার এক শতাংশও কি হিন্দু-অধ্যুষিত কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গের কোথাও বা নয়াদিল্লীর বাঙ্গালী-পাড়ায় পরিদৃষ্ট হয়? আফসোস, এর-পরেও আমরা সাম্প্রদায়িক, এর-পরেও আমরা অনুদার মৌলবাদী। আসলে 'বন্ধুদের' প্রকৃত লক্ষ্যস্থল আমাদের হৃৎপিণ্ড,

www.pathagar.com

আমাদের ঈমান ও আকীদা; এই বস্তুটি পুরোপুরি বিসর্জন না-দেয়া পর্যন্ত, শুধু রবীন্দ্রপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে 'বন্ধুর' মন পাওয়া যাবে না। সত্যই আল্লাহপাকের কথা কতই-না নির্ভুল, কতই-না অকাট্য! 'ইহুদি খ্রীস্টানেরা (মুশরিকরাও অন্তর্ভুক্ত) তোমার উপর কখনো খুশি হবে না, যতক্ষণ-না তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী হয়ে যাও' (সূরা বাকারা)। কিন্তু অনেক কিছুর পরেও আমাদের কি এই চূড়ান্ত কথাটি বলা কর্তব্য নয় যে, 'আল্লাহর হেদায়াতই হলো আসল হেদায়াত'।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর ভুল ধরিয়ে দেয়া আমার কাজ নয়; এই কাজের জন্য তাঁর অনেক কৃতবিদ্য উপদেষ্টা আছেন। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, প্রধানমন্ত্রী যেহেতু একজন ধর্মপ্রাণ মহিলা, তিনি হজ্ব করেছেন, ওমরাহ পালন করেছেন, নিয়মিত সালাত আদায় করেন, কোরআন পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, রবীন্দ্রনাথ-তো নয়ই, কেউই নয়—আমাদের একমাত্র আদর্শ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, 'রাহমাতুল্লিল আলামীন', 'সর্বোত্তম স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত' 'উসওয়াতুন হাসানা' মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। কোন মুসলমান যদি এটা ভুলে যায় তাহলে তার বড় বদনসীব; আর যদি সজ্ঞানে অস্বীকার করে, তাহলে-তো সে আর মুসলমানই থাকে না। আমরা সাম্প্রদায়িক নই, অনুদার নই; কিন্তু আমরা শির্কের সাথে আপোষকামী আত্মবিস্মৃতও নই। আমাদের বুকের অভ্যন্তরে সদা জাগরুক তওহিদের আমানত। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই; তিনি তাঁর মত আছেন, তাঁর মতই থাকুন। আমাদের আদর্শের উত্তরাধিকার এমন শাশ্বত ও ঐশ্বর্যময়, এমন এক অখণ্ড আল্লাহপ্রদত্ত অবিনশ্বর নূরে আমাদের জীবন ও জগৎ আলোকিত, যেখানে পার্থিব ও পারলৌকিক সাফল্যের মহিমা নিয়ে কোন সংশয় নেই। কোন্ দুঃখে কোন্ প্রয়োজনে আমরা আদর্শের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে হাত বাড়াবো? তওহিদ ও রেসালাত ও আখেরাত নিয়ে আমাদের জীবন ও জীবনদর্শন। 'আল্লাহু ওয়ালিউল্লাজীনা আমানু' (সূরা বাকারা) আল্লাহ আমাদের বন্ধু, আল্লাহর ভয় দ্বারা আমরা পরিচালিত। 'ওয়া ছাখ্খারা লাকুম মাফিছ ছামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদি জামিয়াম মিন্হু' (সূরা জাছিয়া), ভূপৃষ্ঠ থেকে নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত যা-কিছু আছে, আল্লাহর অপার অনুগ্রহে, তা-সবই আমাদের বশীভূত কিংকর। অথচ কী সমূহ বদনসীব, আদর্শের জন্য আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের মুখাপেক্ষী! আমাদের ঈমানের দওলাত্ কি তাহলে একেবারে পুরোপুরিই নিঃশেষ হয়ে গেল? আমাদের অভীষ্ট কী? আল কোরআনকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে আমরা কি জাহান্নামে প্রবেশ করতে চাই? নাহলে, আদর্শ মানা-তো দূরের কথা, কুরআনুল কারীমের সুস্পষ্ট নির্দেশ- 'মানুষের মধ্যে তোমাদের সর্বাপেক্ষা উগ্রতম দুশমন হলো ইহুদি এবং মুশরেক' (সূরা

www.pathagar.com

মায়িদা)। নিঃসন্দেহে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইসলামের একটি অলংঘনীয় শিক্ষা ও দাবী; কিন্তু যত গুণবান পুরুষই হোক, আদর্শ গ্রহণ-তো অনেক বড় কথা, কোন বিধর্মীর সঙ্গে এমনকি সখ্যস্থাপনও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এটা আল্লাহর নির্দেশ। 'হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না' (সূরা মুমতাহিনা), যাদেরকে আল্লাহপাক সূরা বাইয়্যিনাহ-তে 'শাররুল বারীয়া' নিকৃষ্টতম সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

যাই হোক, আশা হয়, আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বভাবজ ধর্মভীরুতা নিয়ে আমার কথাগুলো বুঝবেন ও নিরর্থক রবীন্দ্রবিভ্রম থেকে আত্মরক্ষা করবেন। কিন্তু এতদসঙ্গে আশঙ্কা হয়, রবীন্দ্রব্যবসা যাঁদের আয়-উপার্জন ও অস্তিত্বের উৎসমূল, তাঁরা হয়ত ভুল বুঝবেন; এবং তাঁদের মধ্যে হয়ত অহেতুক উষ্মা ও ক্রোধের সঞ্চার হবে। হতেই পারে, হওয়াটা স্বাভাবিকও বটে, কারণ 'বস্তুত আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার হেদায়েতের জন্য তোমরা কোন পথ আবিষ্কার করতে পারবে না' (সূরা নিছা)।

দৈ: ইনকিলাব : পালাবদল (পরিবর্ধিতরূপে) : আগষ্ট ২য় পক্ষ, ২০০০

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

ঋভু ও ঋষভের কাহিনী

এক : ঋভু ও ঋষভ

'ঋভু' শব্দটি কিছু পাঠকের অজানা থাকা অস্বাভাবিক নয়, শব্দটির অর্থ দেবতা; এবং 'ঋষভ' প্রচলিত বটে কিন্তু অনেকের ধারণা শব্দটির অর্থ গর্দভ, কিন্তু আসলে ষাঁড়। যাই হোক, কোন পাঠক যাতে বিভ্রমের শিকার না-হন, অথবা অতিরিক্ত শ্রমক্ষয় করে অভিধানের শরণাপন্ন হতে না-হয়, এজন্য শব্দ দু'টির অর্থ প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার বলে মনে করেছি। এখন আমি যা বলতে চাই, কালক্ষেপ না-করে সেদিকে আসি।

দারিদ্র্য নিজেই একটি সমস্যা, এবং এমন সমস্যা যা অন্য আরো বহু উৎকট সমস্যার জন্মদাত্রী। অতএব দারিদ্র্যবিক্ষত বাংলাদেশ যে নানা সমস্যায় পীড়িত ও পর্যুদস্ত হবে, এটা স্বাভাবিক। দারিদ্র্যের কারণে জীবন-যাপনের মান যে শুধু নীচে নেমে যায় তা নয়, অবিচার, অসাম্য, লোভ ও পরশ্রমলুণ্ঠন, আলস্য, মধ্যস্বত্বভোগ, বাহুবলের প্রাধান্য ও অর্থের দাপট, মেধা ও নৈতিকতার পরাজয়, চালাকি, তাৎক্ষণিক বাহবা শিকারের নিমিত্ত কুশলি আস্ফালন, বিচিত্র বর্ণ ফন্দিফিকির, ঔচিত্যবোধ ও ইনসাফের অপসৃতি, ধর্মবিরাগ, সমাজ বিধ্বংসী সমাজ বিপ্লব ইত্যাদি অসংখ্য রকমের উপসর্গ জন্মগ্রহণ করে। তবু এই সকল সমস্যা যেহেতু দারিদ্র্য নামক দৈত্যের জঠর থেকে জাত, এই দৈত্যকে বশীভূত করা গেলে, অনেক সমস্যাই অনেকাংশে প্রশমিত হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে বহুদিন থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি উৎকট রোগ বা উপদংশ বিরাজমান, সেটা হলো বুদ্ধিজীবী সমস্যা। এই সমস্যাটির জন্ম ও বিকাশ এবং প্রসারের প্রকৃত কারণ কী ও কোথায় নিহিত, সেটা সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়; কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা একটা ব্যাধি। ব্যাধি বলছি এজন্য যে, প্রয়োজনবোধে খুবই সবাক এবং প্রয়োজনবোধে একেবারেই নির্বাক এই বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সততই অত্যন্ত স্ববিরোধী এবং সততই সরল ও বিশ্বাসপ্রবণ মানুষের মধ্যে ভ্রান্তি-উৎপাদক। অবশ্য এই স্ববিরোধিতা ও বিভ্রমসৃষ্টির কারণে তাঁরা ইতোমধ্যেই নানা মহল থেকে নানাভাবে নিন্দিত ও তিরস্কৃত হয়েছেন। এবং তাঁদের ভূমিকা যে ঘোরতরভাবে সন্দেহজনক, সেই দুঃসংবাদও শোনা গেছে। কারো কারো ধারণা এই বুদ্ধিজীবীরা আসলে স্বচ্ছ ও স্বাধীন মতামতের অধিকারী নয়, কোন অদৃশ্য লাটাইয়ের সাথে যুক্ত এক-একটি শূন্যে উড্ডীয়মান ঘুড়ি বিশেষ, যাঁরা তাঁদের দূরবর্তী প্রভুদের মন ও প্রণয় রক্ষার্থেই শুধু যত্নবান। এবং এটা-

www.pathagar.com

যে নিতান্তই ধারণা কি অনুমানমাত্র নয়, এই বুদ্ধিজীবীদের বিগত বহুদিনের কার্যকলাপ থেকে তার অনেক সরস ও অকাট্য এবং তথ্যভিত্তিক প্রমাণ কেউ কেউ পেশ করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সুবিধাভোগী ও প্রভুভক্ত, এবং একই সঙ্গে বায়ুপ্রবাহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে সক্ষম ও কুশলি অভিনয়ে প্রভুবদলে বিশেষ পারঙ্গম। অবশ্য তাঁদের বর্তমান প্রভু কে বা কারা, কোথা থেকে তাঁরা তাঁদের মস্তিষ্কের অগ্নিকুণ্ডে জ্বালানি সংগ্রহ করেন, সে বিষয়ে বর্তমান নিবন্ধকারের কোন ধারণা নেই, কৌতূহলও নেই। যাঁদের আছে, অনেকেই বলেন, তাঁরা একটু ক্লেশ স্বীকার করে কলকাতা ও দিল্লী, পশ্চিম ইয়োরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। তবে সেই শ্রম ও সময়ক্ষেপন আদৌ জরুরি নয়; বরং আমাদের বর্তমান পটভূমিতে এই বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্ক ও তৎপ্রসূত অভিব্যক্তি নিয়ে একটি নির্মোহ, নিরপেক্ষ আলোচনা করা যুগপৎ জরুরি ও উপকারী।

বুদ্ধিজীবী শব্দটির হুবহু সমার্থক কোন শব্দ সম্ভবত অন্য কোন দেশে নেই; 'এলিট' 'ইনটেলেকচুয়াল' 'বুজুর্গ' ইত্যাদি শব্দের ব্যঞ্জনা ঠিক বুদ্ধিজীবীর মত নয়। এই শব্দটি একান্তভাবেই আমাদের স্বসৃষ্ট; এবং ঈষৎ কৌতুকপ্রদ যে, এই উপাধি বা অভিজ্ঞান কিছু কিছু জ্যোতিষীর মতই অনেকটা স্বপ্রদত্ত ও স্বঘোষিত। তবু এটা বলা সংগত যে, এই শব্দবন্ধটি খারাপ নয়। যদিও অনেকে বুদ্ধিজীবীদেরকে 'বিবৃতিবাজ' ও 'বুদ্ধিবিক্রেতা' বলে উপহাস করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা এতটা উপহাসের পাত্র নন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ 'খুব বড়' কবি, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কেউ সংস্কৃতিচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ সাধক, কেউ-বা অতি উচ্চপদে উপবিষ্ট সমাজের কল্যাণার্থে নিয়োজিত 'ত্যাগী ও হিতৈষী' পুরুষ। অতএব তাঁরা নিজে না-অমনোযোগের পাত্র, না তাঁদের কথা উপেক্ষার যোগ্য। উপরন্তু, যে-যাই বলুন, এটা মেনে নেয়া উচিত যে, বুদ্ধি ও দক্ষতাও এক-একটি বিক্রয়যোগ্য পদার্থ। এবং এটাই-তো বাস্তব যে, নানা উপকরণের সঙ্গে কিছুটা বুদ্ধির মিশ্রণ ঘটিয়েই সব মানুষ জীবিকা সংগ্রহ করে; অতএব কেউ যদি শুধু বুদ্ধি খাটিয়েই তা পারে, তাকে দোষ না-দিয়ে বরং বাহবা দেয়া সংগত। অবশ্যই সংগত, কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের বহু বুদ্ধিজীবী বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একেবারে পানির দামে বিবেকটিও বিক্রয় করে দিয়েছেন। না-হলে বুদ্ধি যাই বলুক, বিবেক নিশ্চয়ই বলে-না যে, আপন আস্ফালনকে শ্রুতিগ্রাহ্য করবার জন্য অপর সকল কণ্ঠচ্ছেদনের ব্যবস্থা করা সমীচীন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের কতিপয় বুদ্ধিজীবী কার্যত এই ভূমিকাতেই অবতরণ করেছেন। তাঁরা বুদ্ধিমান বটে কিন্তু বিবেকবান নয়। এমনকি গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতা ও মানবাধিকার ইত্যাদি নিয়ে তাঁদের যে-অকুণ্ঠ প্রেম, সেই প্রেমও একটি ছলনা। এবং এজন্যই

www.pathagar.com

পঁচাশি শতাংশ মানুষের পবিত্র ধর্মানুভূতিকে ব্যঙ্গ করা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্মগত স্বাভাবিক অধিকার অপহরণ, তাঁদের এক-একটি 'মহান ব্রত'।

অবশ্য বাহ্যত যাই মনে হোক, এটা সঠিক নয় যে, সরকার এঁদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আসলে নানা সমস্যাহেতু সময়াভাব ও ব্যস্ততাবশত সরকার এসব দুর্মতিকে উপেক্ষা করছেন মাত্র। তবে এটা সত্য যে, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী যেহেতু আল্লাহপাকের মেহমান হয়ে হজ্বব্রত পালন করেছেন, মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র রওজা-মুবারক জিয়ারত করে এসেছেন, এবং তিনি যেহেতু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারী একজন ধর্মভীরু নিষ্ঠাবতী মুসলমান—দুর্মতিগ্রস্ত বুদ্ধিজীবীদের গুরুতর বালখিল্যতাকে প্রতিরোধ করা তাঁর জন্য ওয়াজিব। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রুষ্ট হলেও হতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন।

সত্যই ঘন-কুহকাচ্ছন্ন এ-সকল বুদ্ধিজীবীর প্রকৃত স্বরূপ কত কদাকার, তা দু'একটি নমুনা থেকেই অনুধাবন করা সম্ভব। আজান-এর পবিত্র আহ্বান অনেক নিদ্রাকাতর বেঈমানের কাছে যথেষ্টই বিরক্তিকর মনে হতে পারে, সে-তুলনায় উলুধ্বনি কি শঙ্খের আওয়াজ বা খ্রীষ্টানদের রবিবাসরীয় প্রার্থনা-সঙ্গীতকে মনে হতে পারে খুবই প্রাণস্পর্শী, প্রীতিকর ও নান্দনিক। বলার কিছু নেই। কিন্তু পবিত্র আজানকে 'বেশ্যার খরিদ্দার' ডাকার (নাউজুবিল্লাহ) সঙ্গে তুলনা করার মত কুরুচি ও কদর্য বিবেকভ্রষ্টতা কি নীরবে উপেক্ষার যোগ্য? কবিই বটে! এই ধরনের অভাবনীয় নীচতা এমনকি ইসলামের প্রতিশ্রুত শত্রুদের মধ্যেও বিস্ময় ও ঘৃণার উদ্রেক করে। একজন অতি-সুশিক্ষিত নাস্তিক-তো ইসলামকে 'মূর্খ ইতরদের ধর্ম' বলেই আখ্যায়িত করে বসলেন। নাস্তিক হলে ইসলামকে আক্রমণ করা কি আসলেই খুব জরুরি? অনুমান করি, এই পণ্ডিত-মানুষটি মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে বড় অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে আছেন; কিন্তু ইসলাম-তো কাউকে ধরে-বেঁধে মুসলমান করে রাখে না। কটূকাটব্যের প্রয়োজন কী, তিনি অন্য যে-কোন সভ্যধর্মে দীক্ষিত হলেই পারেন। অপর একজন মহিলা কবি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তাঁর 'ইবাদতের' বিষয়বস্তু বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই কবি অবশ্য প্রশংসনীয় সততার অধিকারী। কারণ তিনি অন্তত কাউকে আক্রমণ করেন নি; যা বলেছেন, সেটা একান্তভাবেই তাঁর আপন বিশ্বাস অনুরাগ ও উপাসনার প্রতিধ্বনি। কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেই ক্ষোভ নিরর্থক। মহিলাটি একজন প্রবীণা মুসলমান বলে একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করা যায় না। কারণ প্রাচীন মিশরিয়রা গুবরে-পোকাকেও সূর্যজ্ঞানে পূজা করতো, দক্ষিণ ভারতে এখনো অনেক স্থানে ইঁদুর দেবতারূপে উপাস্য, এবং বেনারসে দেখেছি, বহু লোকের আরাধ্য দেবতা হনুমান।

www.pathagar.com

এই তুলনায় উক্ত কবি নি:সন্দেহে অনেকাধিক অগ্রসর চেতনার অধিকারী, তাঁর 'উপাস্য দেবতা বা ঈশ্বর' অন্তত রবীন্দ্রনাথের মত একজন বহুবিখ্যাত কবিপুরুষ! আসলে এই বুদ্ধিজীবীদের যা-কিছু প্রগতিশীলতা ও সংস্কৃতিপ্রেম সবই ছদ্মবেশ; তাঁদের সকল শরবর্ষণের একমাত্র লক্ষ্য ইসলাম ও মুসলমানের বক্ষস্থল। তাঁদের অভিপ্রায় যাই হোক, মুসলমানের যন্ত্রণা ও পরাজয় এবং শরবিদ্ধ রক্তক্ষরিত হৃৎপিণ্ড তাঁদের কাছে বড় প্রিয় ও উপভোগ্য।

অতএব এই বুদ্ধিজীবীরা কেউ কেউ যখন ইনকিলাবকে 'অপাঠ্য' আখ্যায়িত করে পাঠককে না-পড়ার ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিজ্ঞাপনদানে বিরত থাকার 'সুপরামর্শ' দান করেন, ব্যথিত হই কিন্তু বিস্মিত হই না। এবং তাঁদের এই 'সদ্বিবেচনাপ্রসূত' বিবৃতি অনেকাংশে কৌতূকপ্রদ মনে হয়। 'দৈনিক ইনকিলাব' যদি পাঠযোগ্য না-হয়, পাঠক নিজেই প্রত্যাখ্যান করবেন, এ-নিয়ে বিবৃতিদানের প্রয়োজন কী? প্রয়োজন আছে, সরল ও সাধারণ বুদ্ধির পাঠককে 'সত্য' ও স্বমতে নিয়ে আসবার এক কঠিন দায়িত্ব দেশের 'মঙ্গলার্থে' তাঁরা গ্রহণ করেছেন, অতএব উক্ত কর্মটি তাঁদের পবিত্র দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তাঁরা নিশ্চুপ বসে থাকতে পারেন না। কিন্তু দৈনিক ইনকিলাবের অপরাধ কী? এমন একটি বহুল প্রচারিত জননন্দিত পত্রিকার কী-এমন গর্হিত অপরাধ যে, তাঁরা তাঁদের উষ্মা ও অন্তর্দাহ কিছুতেই গোপন রাখতে পারেন না? 'দৈনিক ইনকিলাব' কি মিথ্যা ও মনগড়া কথা বলে? সাংবাদিকতার নীতিচ্যুত হয়ে ইনকিলাব কি বিকৃতি ও তথ্যসন্ত্রাস সৃষ্টি করে? না, এ-সবের কোন প্রমাণযোগ্য দৃষ্টান্ত নেই। যদি থাকে, উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণাদিসহ তার বিরুদ্ধে পাঠককে সচেতন করা যায়, প্রয়োজনবোধে আদালতেরও শরণাপন্ন হওয়া যায়; এবং সেটাই সংগত ও সৌজন্যসম্মত এবং যৌক্তিক। কিন্তু শুধু শুধুই বায়বীয় ঈর্ষা কি অসূয়াবশত বিবৃতিদান, যুক্তিরিক্ত শ্লেষ ও রোষ এবং উষ্মাপ্রকাশ খুবই নিম্নমানের কাজ। এই ধরনের নীচ কৌশলকে অবলম্বন করে উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা করতো আবু জেহেল এবং পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলীর অনুসারীরা এবং আরো পরে গোয়েবলস। বলা আবশ্যক, এই বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই বর্তমান লেখকের অতীব শ্রদ্ধাভাজন ও শিক্ষকস্থানীয়; এঁদের ভূমিকা নিয়ে কথা বলা শোভন ও শিষ্টাচারসম্মত নয়, এবং আমার পক্ষে কষ্টদায়কও বটে। তবে এটুকু বলা দোষণীয় হবে না যে, বুদ্ধি ভালো কিন্তু স্বার্থবুদ্ধি খুবই নিন্দনীয় এবং অতিবুদ্ধি সর্বদাই মারাত্মকরূপে অহিতকর। যতটা বুঝি, ইনকিলাব সজ্ঞানে অসদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত কোন মিথ্যা আচরণ করে না। ইনকিলাবের একটাই 'দোষ', সে অত্যন্ত নির্ভয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর কথা বলে, ইসলাম ও মুসলমানের কথা বলে এবং দেশ ও জনগণের ভালোমন্দ, সুখ-

www.pathagar.com

দুঃখের কথা বলে। এতে কার কী ক্ষতি হয় জানি না, তবে জনগণ উপকৃত হয়। এই ইনকিলাব-এর জন্য আল্লাহপাকই যথেষ্ট। আল্লাহপাক বলেন, 'ওয়াল্লাহু ওয়ালিউল মুমিনীন'-আল্লাহ মুমিনদের বন্ধু। এবং রাসূল (সাঃ) বলেন, 'যে-ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধুদের সঙ্গে দুশমনি রাখে, আল্লাহ বলেন, 'আমি স্বয়ং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি'। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, এ-সব কথায় আমরা খুব কমই কর্ণপাত করি। পার্থিব 'রৌপ্যচন্দ্রের' আকর্ষণ বড় প্রবল। আমরা হতে চাই ঋভু কিন্তু এসব নানা বৈষয়িক আকর্ষণে আমরা শেষ পর্যন্ত পরিণত হই ঋষভে-আল্লাহপাকের ভাষায় 'ছুমমুন বুকমুন উমইউন' ও 'আসফালা সাফিলীন' অর্থাৎ বোবা অন্ধ বধির এক নিকৃষ্টতম প্রাণীতে। তবে খুবই কৌতুককর যে, বহুল আলোচিত বিবৃতিটি এবার লক্ষ্যচ্যুত হয়ে বুমেরাংয়ে রূপ নিয়েছে। বিবৃতিদাতাদের মনস্কাম সফল হয় নি; তাঁদের কষ্ট ও মনঃকষ্ট বাড়িয়ে দৈনিক ইনকিলাব-এর প্রচার সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। মহাকৌশলী আল্লাহপাকের রহস্য সত্যই বড় অপার ও অভাবনীয়! আল্লাহপাক স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের সবাইকে সকল কুহকমুক্ত সৎ ও সরল পথ প্রদর্শন করুন। 'আলহামদুলিল্লাহ ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাজি নাস্‌তাফা'।

দৈনিক ইনকিলাব - ১৮.৬.১৯৯৭

দুই : বিধুর বুদ্ধিজীবী সমাচার

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বিরক্তিকর সমস্যা হলো বুদ্ধির সমস্যা যা-শুধু বিরক্তিকরই নয়, রীতিমত বিবমিষা উদ্রেককারী। অবশ্য সমস্যাটির উদ্ভব বুদ্ধির অপরিপক্কতা বা স্বল্পতাহেতু নয়, আধিক্যহেতু। অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রায় হঠাৎই এমন কিছু বুদ্ধিজীবীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, যাঁরা অতিবুদ্ধির প্রাবল্যবশত এমন সব 'দৈববাণী' জগদ্বাসীকে উপহার দিচ্ছেন, যা সত্যই সাধারণ মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন, পরিপাক করা আরো কঠিন। অবশ্য অশ্লীল, গর্হিত বা যত আপত্তিকরই হোক, কারো বাক্‌স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা অসমীচীন। কিন্তু সমস্যা হয় তখন, যখন দেশের পঁচাশি শতাংশ মানুষের ধর্ম ও ইতিহাস এবং ঐতিহ্য অর্থাৎ সার্বিক অস্তিত্বই তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়, পুরুষানুক্রমে লালিত নৈতিক বোধ ও বিশ্বাসের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অব্যাহত শরবর্ষণ করতে থাকে। সঠিক অনুধাবন করা কঠিন, ইসলামের বিরুদ্ধে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে নিষ্ফল তীর-নিক্ষেপে এই নিপুণ তীরন্দাজেরা কী-স্বর্গীয় সুখ লাভ করেন; এবং কী-গোপন রহস্যময় কারণে এই প্রিয় ও 'হিতকর' কর্মে তাঁরা সর্বদা উদ্দীপিত থাকতে পারেন? নানা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, বিশাল বিশাল বুদ্ধির ভারে ভারাক্রান্ত এ-সকল বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্কে আসলে এক ধরনের কোলাহল ও বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

এই বুদ্ধিজীবীরা দু'তিনটি বিষয় নিয়ে খুবই মনঃকষ্ট ও পেরেশানির মধ্যে আছেন। 'ঈশ্বর' কি 'করুণাময়' কি 'প্রভু' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারনৈপুণ্যে একভাবে আল্লাহকে ব্যালান্স করার চেষ্টা চলে; কিন্তু রাসূল (সাঃ) ইসলাম ও মুসলমানিত্ব নিয়ে তাঁরা কোন পথ খুঁজে পান না। এজন্য এগুলোই তাঁদের সরাসরি আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এবং এইজন্যই রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শকে দিক-নির্ধারক কম্পাসের মত সামনে রেখে যারা চলতে চায়, ইসলাম যাদের কাছে একমাত্র প্রিয়তম দ্বীন, সেই মুসলমানকে তাঁরা বাঙ্গালী-চেতনারিক্ত গোঁড়া ও ঐতিহ্যভ্রষ্ট, অনুদার ও অনাধুনিক আখ্যা দিয়ে পরম তৃপ্তিলাভ করেন। সত্যই কী দুর্মর বদনসীব! সত্যই বড় আফসোস যে, মুসলমান পিতার ঔরসজাত মুসলমান জননীর পবিত্র উদর থেকে ভূমিষ্ঠ কতিপয় মুসলমান বুদ্ধিজীবী, আজ সর্বসাধ্য নিয়ে মুসলমানদের জন্য গহ্বর-খননকেই জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একজন চাকমাও তার স্বজাতির সম্মান-অসম্মানের কথা বিবেচনা করে, একজন রেড-ইন্ডিয়ান কি একজন কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো ক্রীতদাসও তার মৌল পরিচয়কে বিস্মৃত হতে চায় না; অথচ কী দুর্ভাগ্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দ্বীন, শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ, শ্রেষ্ঠতম মহামানবের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের আত্মপরিচয়কে সজ্ঞানে ও সহাস্যে নির্বাসন দিতে বদ্ধপরিকর। বর্তমান নিবন্ধকারের জ্ঞান খুবই অপ্রতুল, সম্ভবত সমাজবিজ্ঞানীরা বলতে পারেন - এই কর্কট রোগের কী কারণ এবং তার নিরাময়েরই-বা কী চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্র।

অমুসলিমদের কথা জানি ; তাদের কোন অবিকৃত ধর্মগ্রন্থ নেই, পূর্ণাঙ্গ কোন জীবনবিধান নেই, সর্বতোভাবে অনুসরণযোগ্য মহানবী (সাঃ)-এর মত কোন নিখাদ, বাস্তব ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নেই। অতএব তারা হীনমন্যতায় পীড়িত হয়ে ইসলামের মোকাবিলায় ঈর্ষা ও অসূয়াবশত শরবর্ষণ করতে থাকবে, এটা কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের কী হলো? আমরা কেন নিজেই নিজের বক্ষ নিরন্তর শাণিত কৃপাণে বিদ্ধ করছি? সত্যই আমাদের কিছু বুদ্ধিজীবীর হলোটা কী? তাঁরা কি তাঁদের অতল বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানরাশি নিয়ে বাস্তবিকই পাগল হয়ে গেল? আমাদের এক জাতীয় বুদ্ধিজীবীর ধারণা, প্রকৃত বাঙ্গালী হতে হলে মুসলমান থাকা অসম্ভব ; অর্থাৎ কোন ঈমানদার মুসলমানকে যথার্থ বাঙ্গালী বলা সমীচীন নয়। ধারণা বটে, কিন্তু এই ধারণা কি সুস্থ মস্তিষ্কে পরিবেশনযোগ্য, না গ্রহণযোগ্য? বাংলাভাষা যার মাতৃভাষা, বাংলাদেশ যার মাতৃভূমি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যার কাছে সীমাহীন প্রেমের বস্তু- এমন ব্যক্তি ইসলামে আত্মসমর্পিত একজন মুসলমান বলেই তার বাঙ্গালিত্ব মুছে যাবে? একজন মুসলমান তুর্কী হতে পারে, ইরানী, আফগান, পাকিস্তানী, এমনকি ভারতীয়ও হতে পারে, কিন্তু কতিপয় বুদ্ধিজীবীর কী 'নির্ভুল ও অত্যুত্তম' ফয়সালা–

www.pathagar.com

মুসলমানিত্ব বর্জন না-করলে বাঙ্গালিত্ব অর্জন করা যায় না। আসলে এদের যুক্তি ও বিশ্বাস ও ধারণামতে বাঙ্গালী নানা ধর্মাবলম্বী হতে পারে না; বাঙ্গালিত্বই একটা ধর্ম। অতএব লক্ষণ সেন, শ্রী চৈতন্য, পরমহংসদেব কি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা, কৃষ্টি ও জীবনাচারকে যারা অবহেলা করে, আপন বলে গ্রহণ করে না, শত সহস্র বৎসর ধরে প্রবহমান যে-পুতুল ও প্রকৃতিপূজা, তার সঙ্গে যারা একাত্মবোধ করে না, তারা কিসের বাঙ্গালী? বাঙ্গালিত্বের একটি অকাট্য অভিজ্ঞানই বটে! কিন্তু যত অকাট্যই হোক, কোন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে এবাদত করাও সম্ভব নয়, রবীন্দ্রনাথকে পরম উপাস্য দেবতা বা আল্লাহর পরেই রবীন্দ্রনাথ, এই ধরনের উদ্ভট বালখিল্য চিন্তা ও কর্মের কোনরূপ প্রশ্রয় দেয়াও সম্ভব নয়। অথচ এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলাই আমাদের কতিপয় বুদ্ধিজীবীর প্রাণপণ সাধনা। কিন্তু যেহেতু দেশের শতকরা পঁচাশিভাগ মানুষ মুসলমান, যেহেতু মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী নিজে পবিত্র হজ্বব্রত পালনকারিণী ও সালাতে-সিয়ামে নিয়মনিষ্ঠ, যেহেতু দেশটা কেবল লালন ফকির, পাগলা কানাই, কি জগাই- মাধাইয়ের দেশ নয়, দেশটার সঙ্গে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে হজরত শাহ জালাল (রঃ) হজরত শাহ মখদুম (রঃ), হজরত খান জাহান আলি (রঃ) প্রমুখ অসংখ্য সংগ্রামী তওহিদী ব্যক্তিত্বের অনির্বাণ পুণ্যস্মৃতি, স্বধর্মভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবীরা অধিকদূর অগ্রসর হতে পারেন না। না পারুন, কিন্তু তাঁদের অন্তর্নিহিত অন্তরের কথা, দেশটিকে ইসলামশূন্য ঔপনিষদিক তপোবনে পরিণত করা, অথবা কমপক্ষে সবাইকে এমন মুসলমানে পরিণত করা, যাদের আরাধ্য দেবতা হবে রবীন্দ্রনাথ, যারা পরমাবেগে শ্রবণ করবে স্বর্গীয় উলু ও শঙ্খধ্বনি, এবং অবশ্যই যাদের কাছে আজান বা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতকে মনে হবে 'বারবনিতার খদ্দের আহ্বান'। কিন্তু তাঁদের এই 'মহান' উদ্দেশ্য কি কখনো সাফল্যমণ্ডিত হবে? দুগ্ধপোষ্য শিশুও এ-কথা জানে, নিশ্চয়ই হবে না। কিন্তু তাদের চেষ্টার তবু বিরাম নেই, বিরতি নেই। সত্যই ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বান্ত:করণে নিবেদিত এমন অন্ধচক্ষু অধ্যবসায়ী পুরুষ, আবু জেহেল, আবু লাহাবের পরে অতি অল্পই আবির্ভূত হয়েছে!

উল্লেখ করা উচিত, এই বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু এমনিতে ভালোই এবং খুবই সজ্জন। সত্য ও সৌজন্যের খাতিরে এটা স্বীকার করতে হয় যে, জ্ঞান গরিমা, উদারতা, শিল্পবুদ্ধি, নান্দনিকতা, শিষ্টাচার, এ-সবই এঁদের মধ্যে বেশ প্রশংসনীয়ভাবেই বিদ্যমান : এবং স্বাভাবিক অবস্থায় এঁদেরকে অসুস্থ বলে মনেই হয় না। কিন্তু কীই-যে হয়, রাসূল (সাঃ) কি কোরআন শরীফ হাদীস শরীফের কথা শুনলেই এঁরা দারুণভাবে অস্থির, অসুস্থ ও অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে। ইসলামই-যে আল্লাহর মনোনীত

www.pathagar.com

একমাত্র দ্বীন ও একমাত্র জীবন বিধান, আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই-যে মুসলমানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকর্ম, রাসূল (সাঃ)এর প্রতি প্রগাঢ় মহব্বত এবং তাঁর নিঃশর্ত অনুসরণই যে সকল মানুষের মুক্তি ও পূর্ণতা এবং সাফল্যলাভের একমাত্র অব্যর্থ উপায়, ইসলামের বিজয় মানে শুধু মুসলমানের নয় সমগ্র মানববংশেরই বিজয়—এই সকল কথা শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্র এই বিধুর-বুদ্ধিজীবীরা প্রায় মৃগীরোগীর মত ছটফট করতে থাকেন। আসলে আল্লাহপাকের কী-এক রহস্যময় অভিপ্রায়ে এঁদের দিল্ অর্গলবদ্ধ, এঁদের বিবেচনাবোধ অবলুপ্ত। এবং সম্পূর্ণরূপে মৃত-কলবের অধিকারী এসকল বিদ্যার্নব পণ্ডিতজনেরা শুধু মস্তিষ্ক ও পাকস্থলি দ্বারা চালিত। অন্য কিছু নয়, শুধু এজন্যই সমগ্র পৃথিবীর নূর ও রহমত এবং হেদায়েতস্বরূপ প্রেরিত যে-মহানবী (সাঃ), কাফের-মুশরিকরা সুপার-এটমিক মাইক্রোস্কোপ দিয়ে শত শত বৎসর অব্যাহত অনুসন্ধান করেও যাঁর জীবনে কলঙ্কের একটি বিন্দুও আবিষ্কার করতে পারে নি, সেই আল্লাহর হাবীবকে আক্রমণ করে এই বুদ্ধিজীবীরা খুবই সুখ ও আনন্দ অনুভব করে। এমন সুখ যা সাধারণের পক্ষে ধারণা করা কঠিন, যে-সুখের মহিমা শুধু সিদ্ধি-সেবনান্তে তুরীয়লোকে অবস্থানরত কোন বাউল কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এবং এই বাষ্পীয় তুরীয়লোক থেকে এঁদেরই কে-একজন রাসূল (সাঃ)কে 'সন্ত্রাসী' বলেই আখ্যায়িত করে বসলেন; এবং আর একজন বয়:প্রবীণ পণ্ডিত ইসলামকে অভিহিত করলেন ইতরজনের ধর্ম। শেষোক্ত পণ্ডিতের কথা অবশ্য আংশিকভাবে সত্য। ইসলাম ইতরজনের ধর্ম নয়, ইসলাম নি:সন্দেহে উত্তম ও উৎকৃষ্ট মানুষেরই ধর্ম; কিন্তু জন্মসূত্রে যে অনেক ইতরজনও এই ধর্মে প্রবেশ করার সুযোগ পায়, এটা সত্য। এবং এঁরাই তাঁরা, যাঁদের কাছে হজরত আবু বকর (রাঃ) কি হজরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর চেয়ে দুদ্দু শাহ বা সূর্যসেন বা চন্ডীদাস অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ; শেখ সাদী (রঃ) কি আল্লামা ইকবালের তুলনায় বহুগুণ মনোযোগের যোগ্য আরজ আলি মাতব্বর। এবং এঁরাই তাঁরা, যাঁদের সম্পর্কে ইকবাল বলেন, 'ইহ্ মুসলমাঁ হায় জিন-হে দেখকে শরমাএ ইয়হুদ'-এমন মুসলমান যাকে দেখে ইহুদিরা পর্যন্ত লজ্জা পায়। লজ্জা পাওয়ারই কথা, কারণ এত নীচে অবতরণ করতে তারাও সাহস পায় না।

কিন্তু একজন সুশিক্ষিত মুসলমান-সন্তানের পক্ষে এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে ও বিপুল উদ্যমে স্বজাতি-সংহারে নেমে পড়া সম্ভব হয় কী-করে? এ-এক বিরাট রোমাঞ্চকর প্রশ্ন। কৌতূহল অবদমন করা যথার্থই কঠিন। পশ্চাতে সত্যই কী-যে রহস্য লুক্কায়িত, সে-নিয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনার পরেও ক্ষুদ্রবুদ্ধি বর্তমান নিবন্ধকার কোনদিকেই কোন স্পষ্ট কুল-কিনারা পায় না। শুধু এটুকু মনে হয়, এঁরা বোধহয়

www.pathagar.com

কোথাও থেকে ধার-করা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে কথা বলেন। আর এতদসঙ্গে বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক প্রফেসর বদরুদ্দিন উমর-এর কথাটিও সত্য বলে বিশ্বাস হয়, সামান্য 'খুদ কুঁড়ো ও মালপানির' বিনিময়ে বিক্রয় হয়ে যাওয়া এই সকল স্বঘোষিত 'বিবেক' আজ একেবারেই বিবেকভ্রষ্ট। সত্যই 'খুদকুঁড়ো ও সামান্য মালপানির' কী গগনচুম্বী অপার মহিমা! রৌপ্যাঘাত এমনকি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা কিওপেট্রার বিলোল কটাক্ষের চেয়েও বহুগুণ মারাত্মক এবং মধুর ও উত্তেজক। এই আঘাতে কিছু মানুষ বড় সহজেই কাবু ও কাতর ও চন্দ্রগ্রস্ত (Lunatic) হয়ে পড়ে। আমাদের বিধুর বুদ্ধিজীবীরা যদি ধরাশায়ী হন, সেটা কিছুমাত্র আশ্চর্যের নয়।

দৈনিক ইনকিলাব- ৬.৬.১৯৯৮

তিন : আত্মবিস্মৃতি ও আত্মহনন

১৮ অক্টোবর '৯৬ সংখ্যা 'শিল্প-সংস্কৃতি' পৃষ্ঠায় 'আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি' শীর্ষক লেখাটির জন্য আরিফুল হককে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এজন্য যে, শুধু মূল্যবান ও সময়োচিত নয়, লেখাটি আমাদের মর্মমূলে বিদ্ধ হবার মত একটি তীক্ষ্ণ বেত্রাঘাতও বটে। কিন্তু সমূহ দুঃখের কথা, আমাদের আত্মবিস্মৃতি এত গভীর, আমাদের আত্মহননেচ্ছা এমন অপরাজেয় এবং শূন্যে প্রত্যাবর্তনের গতি এমন দুর্বার ও কুণ্ঠাহীন যে, এই ধরনের দরদি ও দুঃসাহসী লেখা থেকেও উপকৃত হবার সম্ভাবনা খুব কম। আমরা তো একেবারে খাঁটি এইড্‌স-আক্রান্ত রোগীর মত, কোন রোগ প্রতিরোধের কিঞ্চিত্তম শক্তিও আর আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। না-হলে সব মানুষের এই সম্মিলিত বিভ্রম, গভীর গহ্বরের দিকে ঐক্যবদ্ধ এই সহাস্য যাত্রার তো কোন হেতু নেই। আপনি আরিফুল হক বড় কষ্ট পান, কিন্তু আসলে এ-হ'লো এক দুর্নিবার নিয়তি, এ-থেকে নিষ্ক্রমণের সকল পথ বোধ হয় রুদ্ধ। কিন্তু মানতেই হবে, এই নিয়তি আজ যতই অনতিক্রম্য মনে হোক, এটা সত্য যে, এই দুর্ভাগ্য আদৌ আকস্মিক নয়, বহুদিনের পুঞ্জীভূত পাপেরই নির্ভুল জবাব।

একেবারে নিকট অতীত থেকেই পর্যালোচনা করতে পারি, অবলোকন করতে পারি নিজেকে। এদেশের মুসলমান ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে হিন্দুদের অত্যাচার, অপমান ও লাঞ্ছনাকে মেনে নিয়ে, এমনকি হরিজনদের চেয়েও নিকৃষ্ট জীবন যাপন করেছে। তারপর আল্লাহপাকের রহমত, সেই করুণ দুঃসময়ের একদিন অবসান ঘটলো। আমরা অবতরণ করলাম আমাদের বহু আত্মত্যাগী সংগ্রামী পূর্বপুরুষের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও সাধনায় অর্জিত এক সূর্যকরোজ্জ্বল আলোকতীর্থে। কিন্তু যে যাই বলুক, সেই সংগ্রাম ছিল

www.pathagar.com

মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, মুসলমানের বহুবর্ষব্যাপী জাগতিক বঞ্চনা নিরসনের সংগ্রাম। তার মধ্যে ইসলাম ছিল না। অতএব পরিশেষে জয়লাভ করলেও সেই জয় কোন আদর্শের জয় নয়, এই বিজয় ছিল অশ্বারোহী সিজর কি আলেকজাণ্ডারের মত যুদ্ধজয় ও ভূমিদখল। একমাত্র সৈয়দ আহমদ বেরিলভি ছাড়া খুব কমই ছিলেন, যাঁরা ইসলামকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন। অনেক মনীষী সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন সত্য, এবং এটাও সত্য যে, সেই উৎসর্গীত স্বজাতিপ্রেমী অকুতোভয় মনীষীদের কাছে অপরিমেয় আমাদের ঋণ। কিন্তু তাঁদের একমাত্র বিবেচ্য ছিল মুসলমান, মুসলমানদের দুর্দশা ও বঞ্চনা। এজন্যই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে যখন কোন কৌতূহলী সাংবাদিক প্রশ্ন করেন - 'পাকিস্তানের মধ্যে বাংলাদেশের আদ্যাক্ষরটি নেই কেন'? তিনি বলেন, 'A class of people in India wants to keep Muslims under their heels; But I say 'No' and that 'No' is pakistan.' অর্থাৎ এটা পরিষ্কার, তিনি বা তাঁরা এই উপমহাদেশে সংগ্রাম করেছেন দ্বিজাতিতত্ত্বের আঞ্চলিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে, দ্বিজাতিতত্ত্বের মৌলিক আদর্শ ও মর্মবাণী নিয়ে নয়। অতএব জয়লাভের পর অর্জিত যে-জাগতিক সুবিধা, তাকে অক্ষত রেখে অন্য সকল বিষয়ে অপরের মধ্যে দ্রবীভূত হতে বাধা কী? কোনই বাধা নেই; এবং এ জাতির প্রকৃত ব্যাধি ও বদনসীবটাই এখানে। কারণ ইসলামহীন মুসলমান এবং লাত-হোবল বা সারদাপূজারী পৌত্তলিক কি ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টানের মধ্যে আদৌ কোন প্রভেদ নেই। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে সংশ্রবহীন মুসলমানের যে নসীব হওয়া সংগত, আজ আমরা সেটাই প্রত্যক্ষ করছি। আরিফুল হক, আপনি কষ্ট পেলেও কিছু করার নেই।

হজরত ওমর (রাঃ) যখন অবরুদ্ধ খ্রীষ্টানদের অনুরোধে জেরুজালেমের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে চলেছেন, সেদিন ক্রীতদাসের সঙ্গে তাঁর নিজের পথকষ্ট ভাগাভাগি করে নেবার ঘটনাটি কারো অজানা নয়। কতিপয় মুসলমান তাঁকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এসে দেখেন হজরত ওমর (রাঃ) তখন উটের রশি হাতে আর ক্রীতদাসটি উষ্ট্রপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। তাঁরা বললেন, 'খ্রীষ্টানদের সম্মুখে এই অবস্থায় উপস্থিত হওয়া কি সম্মানজনক হবে'? ফারুকে আজম রাগতভাবে বললেন, 'আমাকে সম্মানিত করেছে ইসলাম; আল্লাহর আদেশ এবং রাসূল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের মধ্যেই আমার সম্মান, অন্য কোথাও এই সম্মান খুঁজতে যাওয়া মানে জিল্লতি'। আমরা যাঁদের পশ্চাতে অতীতে কি বর্তমানে সংঘবদ্ধ হয়েছি, সংগ্রাম করেছি, ভোটাভুটির নাটকে নেমেছি, তাঁরা কি কেউ কখনো এই সত্য কথাটি অনুভব করেছেন, না উচ্চারণ করেছেন? অতএব আজ আমরা যদি আত্মবিস্মৃত হয়ে আত্মবিধ্বংসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হই, সেটা স্বাভাবিক, যদি শোচনীয় জিল্লতির মধ্যে ডুবে যাই সেটাও স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

অবশ্য এই জাতিকে বিলীন ও হীনবল করবার জন্য ষড়যন্ত্র যে নেই তা নয়; আছে এবং ভালোভাবেই আছে। কিন্তু বাইরের স্রোত কি উত্তাল তরঙ্গ যতই ভয়াবহ হোক, নৌকার খুব একটা ভয় নেই, আসল ভয় নিজেরই কোন স্ববিনাশী রন্ধ্র। নৌকার নিজস্ব ছিদ্রপথে যখন অবাধে জল উঠতে শুরু করে ওই নৌকার নি:শব্দে জলমগ্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। আমরা বাইরের ঝড়ঝঞ্ঝা ও উত্তাল তরঙ্গরাশিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছি কিন্তু ভেতরের ছোটবড় ছিদ্রগুলোর প্রতি একেবারেই বেখেয়াল। আরিফুল হকের যন্ত্রণাদগ্ধ করুণ প্রশ্ন-'আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি'? এই প্রশ্ন আমাদের সবারই, কিন্তু বৃথা মনস্তাপ; ভুল পথ কি কখনো সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে? যত ক্ষুদ্রই হোক, যত সমস্যাই থাক, আল্লাহপাকের অশেষ রহমতে আমরা আজ স্বাধীন, এই সসাগরা পৃথিবীর একটি শ্যামল ভূখণ্ড আমাদের নিরঙ্কুশ অধিকারে। কিন্তু এই অধিকার, এই স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের নৈতিক ও রাজনৈতিক অবলম্বনটা কী? ভাষা একটি প্রবল শক্তি বটে, কিন্তু একটি পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত বালকও বোঝে, শুধু ভাষা দিয়ে এই বিরাট উপার্জন সম্ভব হতো না। হলে, আজ এই ক্ষুদ্র বিশ্বে কমপক্ষে তিন সহস্রাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটতো; হলে, সোহরাওয়ার্দী-শরৎবসুর অখণ্ড বাংলার পরিকল্পনা ভেঙ্গে যেত না; হলে, পারুক না-পারুক শিখ কি কাশ্মীরীদের মত পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীরাও দিল্লীকে 'শুভরাত্রি' জ্ঞাপনের চেষ্টা করতো। বলাই বাহুল্য, শুধু ইসলামের জন্যই আমাদের এই সম্মানজনক অবস্থান; চতুর্দিক ভারতবর্ষ দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে পরিবৃত, কিন্তু ইসলামের পরিচয়ে মুসলমান নামাঙ্কিত বলেই আমরা আজ এই বাংলাদেশ নামক এক নদীবিধৌত বিহঙ্গ-মুখরিত উর্বর ভূখণ্ডের একচ্ছত্র মালিক। অথচ কী করুণ পরিহাস, এই ইসলামই আজ আমাদের সর্বাধিক গাত্রদাহের কারণ, মুসলমানিত্ব আজ আমাদের 'লজ্জা' ও 'অপমান'। আমাদের রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে তবু কিছুটা সুস্থতা আছে, কিন্তু সাংস্কৃতিক বোধ একেবারেই অনিকেত ও সম্ভ্রমহীন, কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। আরিফুল হকের কথাই সত্য, 'আমরা সব ভুলে গেলাম'। সত্যই, ভুলে না-গেলে কি এমন হয়! বনের পশুপক্ষীও বোঝে, আদর করে ডাকলেই তারা কাছে আসে না। কিন্তু আমরা পশ্বাধম, আমরা কিছুই বুঝতে পারি না, কে বন্ধু আর কে ব্যাধ বা আততায়ী। আমরা কখনো পশ্চিমাদের আদর, কখনো পৌত্তলিকদের নকল-ভালোবাসায় এমন ধন্য হয়ে উঠি, এমন বশংবদে পরিণত হই, যা দেখে গৃহপালিত সারমেয় কি মার্জারের পক্ষেও হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়। এজন্যই হিলারি ক্লিনটন যখন সশরীরে উপস্থিত হয়ে 'মুড়িভাজা' নিয়ে সানন্দ বিস্ময় প্রকাশ করেন, আমাদের জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে; আর 'আনন্দবাজার'এর অতি-বিদগ্ধ বাঙ্গালীবাবুরা যদি একটু প্রশংসা করেন, তখন-তো এমন বেহাল-অবস্থা যে, আনন্দে-উত্তেজনায় আমাদের হৃৎস্পন্দনই থেমে

www.pathagar.com

যাবার উপক্রম। কিন্তু এটাও কোন আকস্মিক ব্যাধি নয়, আমাদেরই স্বরোপিত বিষবৃক্ষের ফসল। কখনো কি আমাদের মধ্যে হজরত আবু বকর, হজরত ওমর বা সাহাবীদের জীবনীপাঠের ব্যবস্থা ছিল? গাজী সালাহদীন কি ইমাম গাজ্জালী কি মুজাদ্দিদ আলফেসানী কারো কথাই কি আমাদের আপন ইতিহাসের অগ্নিপুরুষ হিসেবে কখনো উচ্চারিত হয়েছে? তওহিদই যে মুসলমানের প্রথম, প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞান, এই কথাও কি এদেশের মানুষ কখনো ভালো করে শুনেছে? আমরা কি কখনো ঠিকভাবে শুনেছি যে, রোমসম্রাট-খসরু পারভেজ-রডারিক-দাহির-পৃথ্বিরাজ সবাইকে পরাভূত-করা আমরা এক অজেয় অপরাজেয় হার না-মানা জাতি? আমরা কি জানি যে, সমগ্র ইয়োরোপ জুড়ে বিস্তৃত থিকথিকে অন্ধকার ও বন্যতার মধ্যে আমরাই জ্বালিয়েছিলাম সভ্যতা ও জ্ঞানের আলো? শুধু ইয়োরোপ নয়, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোনেশিয়া সর্বত্র আমরা পৌঁছে দিয়েছিলাম আল্লাহপাকের নূর ও নেয়ামত; ইনসাফ কী, পবিত্রতা কী, এসব আমরাই শিখিয়েছিলাম পৃথিবীকে। কিন্তু এসব কোন কথাই কি আমাদের কোন সর্বপাঠ্য আবশ্যিক পুস্তকে লেখা আছে? নেই, অতএব কোন কথা মনেও নেই। ফলত যা হবার তাই হলো। আজ আমরা সাড়ম্বরে লালন-পাগলা কানাইদের নিয়ে মেতে উঠি, কিন্তু এদেশে যাঁরা আমাদের অস্তিত্বের ভিত্ নির্মাণ করেছেন, সেই খান জাহান আলী (রঃ) কি হজরত শাহজালাল (রঃ) কি শাহ মখদুম (রঃ) কারো কথাই আর তেমন মনে পড়ে না। এসব অলীদের মাজারে আমরা যাই বটে কিন্তু তার মূল হেতু বোধ হয় কচ্ছপ ও কুমিরের আকর্ষণ, এবং বহুলাংশে শির্কের টানে 'বাবার মাজার' থেকে 'অলীক ফয়েজ' লাভের বাসনা। কিন্তু তাঁদের প্রকৃত অবদান সম্পর্কে আমরা নীরব ও নি:সাড়, তাঁদের প্রচারিত তওহিদ এবং পেশকৃত ইসলামের সৌন্দর্য থেকে বহু যোজন দূরবর্তী আমাদের অবস্থান।

এসব দেখে, প্রিয় আরিফুল হক আপনি বিস্ময়বোধ করেন, কিন্তু আমি করি না। কারণ এই সেদিনও যাঁরা ছিলেন হতদরিদ্র কৃষক, তন্তুবায় ও নৌকায় নিকারি, আজ তাঁদেরই সন্তানেরা মতিঝিলে রাজত্ব করছে, বীরদর্পে আনাগোনা করছে সচিবালয়ে; যাদের পিতা ও পিতামহেরা ধবলীর দুগ্ধদোহন করে কায়ক্লেশে সংসার নির্বাহ করতেন, তারা এখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মার্সিডিসের তন্দ্রাচ্ছন্ন আরোহী। এত দ্রুত ও এমন বৈপ্লবিক পটপরিবর্তনে মাথা ঠিক রাখা কঠিন। অতএব স্যুট কি সাফারি-পরিহিত নক্ষত্রখচিত হোটেলে ডিনারভোজী সাহেবদের যদি চিত্তবিভ্রম ঘটে, সেই বিভ্রম কি বিস্মৃতি একটি স্বাভাবিক উপসর্গ। এতদসঙ্গে হীনমন্যতাও একটি কারণ। আমরা আমাদের 'মূঢ়' নিরক্ষর পিতা-পিতামহদের ভুলে থাকতে চাই। আমরা দেখাতে চাই যে,

www.pathagar.com

আমরা খুবই বনেদি-সংস্কৃতিবান, এত বনেদি যে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের অনেক আগে থেকেই আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপাসক, দেখাতে চাই কলকাতার বাবুরা তো শ্রোতামাত্র, আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে 'এবাদত' করি। আরিফুল হক, আপনি সপরিতাপে ও সক্ষোভে যাই বলুন, এ-এক দুর্মর বদনসীব। দস্যুর গুহায় বিপুল ধনরাশি দেখে আরব্য উপন্যাসের আলীবাবা-ভ্রাতা কাশেমের যেমন ভারসাম্য লোপ পেয়েছিল এবং পরিশেষে হারিয়ে ফেলেছিল দরজা-খোলার সাংকেতিক শব্দটি, দেশের এই হঠাৎ সৌভাগ্যধন্য সন্তানদেরও একই অবস্থা। এই আত্মবিস্মৃত কাশেমদের স্মৃতি যদি জাগিয়ে তুলতে হয়, যদি ফিরিয়ে আনতে হয় সুস্থতা ও ভারসাম্য, মুক্তি দিতে হয় পরানুকরণ ও হীনমন্যতা থেকে, তাহলে তার অন্তরে ও কর্ণকুহরে তুলে ধরতে হবে আল্লাহর একত্ব ও অখণ্ড সার্বভৌমত্বের কথা, মহানবী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শের শাশ্বত সৌন্দর্য ও অপরিহার্যতার কথা। কাজটি কঠিন কিন্তু এ-ছাড়া দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই। এই একটিই মাত্র ঔষধ, একটিই প্রতিষেধক। এই আমরা, এই স্বাধীন অন্নপায়ী বঙ্গসন্তানেরা রোগ নিরাময়কল্পে এই অব্যর্থ ঔষধ যদি সেবন করি ভালো, নাহলে সমূহ ধ্বংস ও বিনাশই আমাদের আগামী দিনের ইতিহাস।

দৈনিক ইনকিলাব - ১.১১.'৯৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলাম ও আত্মঘাতী মুসলমান

আবু জাফর